কিতাবুত্ তাহ্রীদ্
(৫)
মুস'আব ইলদিরিম

কিতাবুত্ তাহ্‌রীদ্ ‘আলাল ক্বিতাল

পর্ব ০৫:
আর কতকাল আমরা নিজেদেরকে এমনিভাবে ধোঁকা দিব?

মুস‘আব ইলদিরিম

লেখকের কথা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده- أما بعد

উম্মাহ-দরদী প্রিয় ভাই!

আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

অনেক দীর্ঘ সময় পরে হলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা **"কিতাবুত্ তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল, পঞ্চম পর্ব: আর কতকাল আমরা নিজেদেরকে এমনিভাবে ধোঁকা দিব?"** কিতাবটি নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

দেরী করার কারণ ছিল- প্রথমতঃ আমার নিজের কমতি ও অযোগ্যতা, দ্বিতীয়তঃ এই পর্বটি রচনা করতে গিয়ে আমাকে অনেক বেশি বাধা-বিপত্তি ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে, আর সবশেষেঃ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, হিকমাহ্ ও ফয়সালা। তবে যাই হোক, কৃতজ্ঞতায় সিজদায় লুটাই সে রব্বে কারীমের দরবারে যিনি আমাদেরকে কিতাবটি শেষ করার তাওফীক দিয়েছেন।

কিতাবুত্ তাহরীদ্, পঞ্চম পর্ব নিয়ে কিছু কথা

মুহতারাম ভাই! আমরা যারা কমবেশি 'দাওয়াহ ইলাল জিহাদের' ময়দানে কাজ করেছি, এই কাজ করতে গিয়ে অবশ্যই আমরা কিছু না কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি; একজন আলেম কিংবা পাক্কা দ্বীনদার অথবা দ্বীনের কোনো মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত দ্বীনী সাথী ভাইয়ের দুয়ারে যখন আমরা জিহাদের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছি আর সেই ভাই যখন 'দাওয়াহ ইলাল জিহাদ'কে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিংবা চুপ রয়েছেন, অথবা পাশ কাটিয়ে গিয়ে জিহাদ না করার পিছনে অদ্ভূত কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন, তখন আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয়েছে, কখনো অন্তর ভেঙে খানখান হয়েছে, নিশ্চুপে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে আর স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন উদিত হয়েছে। যেমন:

ক. আমাদের দেশে আলহামদুলিল্লাহ, অগণিত মসজিদ-মাদরাসা-খানকাহ কিংবা দাওয়াতের মারকাজ রয়েছে, রয়েছেন অসংখ্য দ্বীনদার, ধর্মপ্রাণ মুসলমান। কিন্তু জিহাদের দাওয়াত দিলে কেন সবাই সেটিকে এড়িয়ে যেতে চান? বা গ্রহণ করতে চান না?

খ. অনেক বড় আলেম, পীর সাহেব, দা'ঈ কিংবা ইসলামী রাজনীতিবিদ, কিন্তু তিনিও কেন জিহাদ করতে চান না, বা জিহাদের প্রতি কেন এত অনীহা? জিহাদের দাওয়াত দিলে এটা-সেটা বুঝিয়ে কেন তিনি পাশ কাটিয়ে যান? দ্বীনের এত গূঢ় তত্ত্ব বুঝলেও কেন জিহাদ বুঝতে চান না?

গ. বর্তমান সময়ে জিহাদ একটি ফরযে আইন আমল হওয়া সত্ত্বেও এ থেকে উম্মাহর দ্বীনদার শ্রেণি কেন এত পিছিয়ে থাকতে পছন্দ করেন?

ঘ. আরেকদল ভাই আছেন তারা জিহাদকে কেন অপব্যাখ্যা করেন? উম্মাহকে জিহাদ থেকে দূরে রাখতে কেন তারা নানাভাবে উম্মাহকে বিভ্রান্ত করেন?

ঙ. আল্লাহর সাথে আমাদের সত্যবাদিতার এত অভাব কেন? যে আল্লাহ আমাদেরকে নামাযের হুকুম দিয়েছেন, সেই আল্লাহই তো আমাদেরকে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, জিহাদকে ফরযে আইন করেছেন, কিন্তু কেন আমরা তাঁর এই হুকুমটিকে এতটুকু গুরুত্ব দেই না যতটুকু আমরা নফল নামায, তিলাওয়াত, যিকির কিংবা অন্যান্য আমল ও মেহনতকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে থাকি?

চ. উম্মাহর উপর কুফ্ফারদের আগ্রাসন, নিযাতন, গণহত্যা দেখেও কেন আমরা চুপ করে থাকি, কিংবা কেবল মিটিং-মিছিল-র‍্যালী আর দুআ করেই আমাদের ঈমানী দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে ভেবে বসে থাকি?

ছ. আমাদের উপর কেন পরাজিত মানসিকতা চেপে বসেছে? ইসলাম কায়েম করার প্রশ্নে আমরা কেন ‘জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ’ বাদ দিয়ে গণতন্ত্রের মত কুফুরী ও শিরকী ব্যবস্থা কিংবা অন্যান্য মনগড়া পন্থা অবলম্বন করছি? আমরা দ্বীনদাররা ইসলামী(?) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি রাজপথে রক্ত দিতে প্রস্তুত থাকি, তাহলে প্রকৃত জিহাদ ও শাহাদাতের পথে যেতে কেন আমাদের এত ভয় ও অনীহা?

জ. এক কথায়, দ্বীনদার হওয়া সত্ত্বেও ‘জিহাদের আযান’ কেন আমাদের কাছে এত অপ্রিয়? জিহাদের ডাক কেন আমাদের কাছে এত অপছন্দনীয়? জিহাদের আওয়াজ কেন আমাদের কাছে এত অপরিচিত ও অবহেলিত? অথচ আল্লাহ পাকের হুকুম হল- আমরা যেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ ও তাঁর রাহে জিহাদ করাকে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি? (দেখুন: সূরা তাওবা: আয়াত নং-২৪)

মুহতারাম ভাই, তাহলে, আমাদের সমস্যাটা কোথায়? কেন এমন হচ্ছে?...................

হ্যাঁ ভাই, আমাদের মূল সমস্যাটা হল- ‘ওয়াহন’ তথা দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয়। আর এই ওয়াহনের ফলাফল হল- জিহাদ বিমুখতা ও জিহাদ পরিত্যাগ।

দুঃখজনক বিষয় হল- জিহাদ পরিত্যাগের জন্য আমরা নিজেরা মনগড়াভাবে নানান অজুহাত ও বাহানা বানিয়ে নিয়েছি; আর দাবী করছি এগুলো হলো আমাদের ‘হিকমাহ’। যে যত বেশি জিহাদ থেকে পালানোর পন্থা বের করতে পারছি, সে ততবেশি নিজেকে ‘হিকমাহওয়ালা’ ভাবছি। আর শরীয়তের ভুল কিংবা অপব্যাখ্যা করে আমরা উম্মাহর সামনে জিহাদ না করার নানান কারণ তুলে ধরছি, নিজেরাও বিভ্রান্ত হচ্ছি এবং উম্মাহকেও বিভ্রান্ত করছি। সচেতনভাবে কিংবা অবচেতনমনে আমরা আকীদা ও বিশ্বাসের নানান প্রাচীর দাঁড় করিয়েছি, যা আমাদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখছে।

প্রিয় ভাই! আজকের আমাদের এই পর্বটিতে (কিতাবুত্ তাহরীদ, পঞ্চম পর্ব: আর কতকাল আমরা নিজেদেরকে এমনিভাবে ধোঁকা দিব?) এই সমস্ত ধোঁকার প্রাচীরগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং যথাসম্ভব কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন দলীল ও যুক্তির মাধ্যমে সেগুলোকে খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, ইনশাআল্লাহ, কিতাবটি আমাদের সমাজের প্রতিটি দ্বীনদার ভাইয়ের অন্তরে নাড়া দিবে, সকল তবকার দ্বীনদারদেরকে জিহাদ নিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতে একরকম বাধ্য করবে এবং আমাদের প্রত্যেকের উপর আপতিত এই ফরযিয়াত আদায়ে উদ্বুদ্ধ করবে।

সবশেষে বলব, আমি (লেখক) একজন নগণ্য মানুষ, আমার ইলমও সীমাবদ্ধ। তথাপি যতটুকু সত্য ও সঠিক কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি সেটি আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা কিছু ভুল সেটি আমার নফস ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আর আমি ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নই। কারো নজরে কোনো ভুল ত্রুটি ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে, মেহেরবানী করে কমেন্টে তা জানিয়ে দিলে আমি আপনাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব, ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন যেন আমাকে এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে শয়তান ও তার দোসরদের ধোঁকা থেকে হেফাযত করেন এবং জিহাদ ও শাহাদাতের পথে অবিচল রাখেন। তিনি যেন সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে, বিশেষ করে গাজার মুসলিম ভাই-বোনদের উপর চলমান ইয়াহুদী ও অন্যান্য কুফ্ফারদের আগ্রাসন ও গণহত্যা থেকে হেফাযত করেন। সারা বিশ্বের মুজাহিদ ভাইদেরকে বিশেষ করে ফিলিস্তিনের ভাইদেরকে কবুল করেন, জিহাদের পথে অবিচল রাখেন, গাইবী মদদ ও নুসরত করেন, এবং আমাদের চক্ষু ও হৃদয়ে শীতলতা দানকারী 'ফাতহে মুবীন' দান করেন। আমীন ছুম্মা আমীন।

পরিশেষে, আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীন কায়েমের জন্য 'এলায়ে কালিমাতুল্লাহর' এই ক্ষুদ্র মেহনতকে কবুল করুন, ঘুমন্ত মুসলিম উম্মাহর জাগরণের কাজে কিতাবটিকে ব্যবহার করুন, আমাদের নাজাতের উসীলা বানান, যেসকল আলেম-মুজাহিদ ভাই শত ব্যস্ততার মাঝেও অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে কিতাবটি সম্পাদনা করে দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে জাযায়ে খায়ের দান করুন, তাদেরকে এবং তাদের আহালদেরকে জিহাদ ও শাহাদাতের জন্য কবুল করুন, ক্ষমা করুন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দিন। আমীন, ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

-মুস'আব ইলদিরিম

২৮ রবিউস্ সানি, ১৪৪৫ হিজরি

(১৩ নভেম্বর, ২০২৩ ঈসায়ী)

রোজ: সোমবার, ০৪:৪৮ a.m

কিতাবুত্ তাহরীদ ‘আলাল ক্বিতাল

পঞ্চম পর্ব

আর কতকাল আমরা নিজেদেরকে এমনিভাবে ধোঁকা দিব?

মুস‘আব ইলদিরিম

সূচিপত্র

বিভিন্ন মেহনতের সাথে জড়িত সাথিদেরকে শয়তানের ধোঁকা

সুপ্রিয় দ্বীনদার ভাইয়েরা আমার!

আজ আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা নিবেদন করতে চাই। আপনারা আমার এমন সব ভাই যাদের অন্তরে দ্বীনের মহব্বত রয়েছে এবং আপনারা সমাজে দ্বীনদার হিসাবে পরিচিত। আমার এই নিবেদন বিশেষ করে সেই সব দ্বীনী ভাইদের প্রতি, যারা কোন না কোন দ্বীনী মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত।

মুহতারাম ভাই!

আজ আমরা এমন কিছু বিষয় আপনাদের সাথে তুলে ধরব, যা অত্যন্ত স্পর্শকাতর; হতে পারে তা অনেকের চিন্তা চেতনার সাথে মিলে যাবে। কিন্তু বিষয়গুলো আমাদের সকলের সামনে স্পষ্ট হওয়া দরকার। কেননা, বুঝনেওয়ালারা চুপ থাকতে থাকতে সত্যের ব্যাপারে উম্মত আজ দিশেহারা। সত্যকে স্পষ্ট করা আমাদের উপর ফরয দায়িত্ব। আজ আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। আপনাদের সামনে হককে 'হক' হিসেবে আর ভ্রান্তিগুলোকে 'ভ্রান্তি' হিসেবে আমাদেরকে আজ তুলে ধরতেই হবে।

প্রিয় ভাই!

পরবর্তী আলোচনার দ্বারা আমরা কাউকে আঘাত করতে চাইনা। এগুলো কেবলই আত্মসমালোচনা! শুধুমাত্র বিষয়গুলোর উপর সুগভীর চিন্তা করার জন্য একজন 'দ্বীনী, কল্যাণকামী ভাই' হিসেবে আপনাদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

তাছাড়া, আমরা সকলে ভাই ভাই; একে অপরের জন্য দর্পনস্বরূপ। আমরা একে অন্যের কল্যাণকামী; একে অন্যকে শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই ভালোবাসি। এক ভাইয়ের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা অপর ভাইয়ের দায়িত্ব। যেন আমরা দ্বীনের নামে নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকায় না পড়ি; সহীহ দ্বীন ও বিশুদ্ধ ঈমান-আমল নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হতে পারি- তাঁরই সন্তোষভাজন হয়ে, নিজেরাও সন্তুষ্ট হয়ে, আর প্রবেশ করতে পারি চিরস্থায়ী জান্নাতুল ফিরদাউসে। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন।

• 'জিহাদ' বর্তমানে ফরযে আইন:

প্রিয় ভাই! পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে কুরআন-হাদীসের আলোকে আমাদেরকে সর্বপ্রথম বুঝে নিতে হবে- বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে সক্ষম সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে এবং 'সকল আমল/মেহনতের মধ্যে জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ'। এই বিষয়ে "কিতাবুত্ তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল" এর দ্বিতীয় পর্ব "তাওহীদ ও জিহাদ" কিতাবটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সেটি দেখে নিতে পারি, ইনশাআল্লাহ।

• শয়তান দ্বীনী মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত সাথী ভাইদেরকে 'মেহনতের' ধোঁকায় ফেলে কিভাবে?...........

** আমাদের সমাজে 'দ্বীনদার' হিসেবে পরিচিত প্রত্যেক মুসলমানই আমরা কম-বেশি কোনো না কোনো মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন: কেউ মাদরাসার খেদমত, কেউ মসজিদ আবাদ/পরিচালনার মেহনত, কেউ দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত, কেউ খানকাহ/এসলাহী মেহনত, কেউ ইসলামী রাজনীতির মেহনত, কেউ বা আবার জিহাদের ময়দানে মেহনত করে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ!

তবে ভাই, শয়তান মেহনতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেভাবে ধোঁকায় ফেলে তা হলো- জিহাদের মেহনত না করে আমরা যে ভাই যে মেহনতের সাথে লেগে আছি, তার কাছে আপন মেহনতের গুরুত্ব এমনভাবে পেশ করে যে, ধোঁকাগ্রস্ত ভাই দ্বীনের অন্যান্য মেহনত বিশেষতঃ (ফরযে আইন হওয়া সত্ত্বেও) জিহাদী মেহনতের সাথে জুড়ার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। এক পর্যায়ে আমরা প্রত্যেকেই জিহাদ না করেও যার যার আপন মেহনতকে 'পরিপূর্ণ' মেহনত মনে করতে থাকি। কুরআনের ভাষায়,

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

"প্রত্যেক দলই আপন আপন মতবাদ নিয়ে উল্লসিত।"

(৩০ সূরা রূম: ৩২)

** কয়েক ধাপ এগিয়ে আমরা কেউ কেউ তো এমন দাবী করতে থাকি..............

আমিই হক!..... আমিই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত!.... আমিই সেই জামাত যার সম্পর্কে নবীজী ﷺ ভবিষ্যদ্বানী করেছেন, "কেয়ামত পর্যন্ত একটি দল হকের উপর থাকবে!"...... আমিই সেই ছোট্ট জামাত, যার সাথে সর্বদা আল্লাহর নুসরত থাকবে!....... আমিই "সীরাতে মুস্তাকীমের উপর আছি!..... আমিই .... আমিই .... আমিই সব!......আমিই পরিপূর্ণ!..........

.... শেষ যামানায় ইমাম মাহদী আ. আমার দল থেকেই আসবেন!...... ইমাম মাহদী অমুক তরীকার খলীফা হবেন; অমুক মাদরাসার ছাত্র হবেন! .... ইত্যাদি....ইত্যাদি। আজ আমাদের বিভিন্ন ভাইদের মুখে এরকম আরো বহু দাবী শুনা যায়!!

আর এসব দাবী করার পিছনে কারণ হলো- জিহাদ না করেও প্রত্যেক দলই আমরা নিজেদেরকে 'পরিপূর্ণ হক' মনে করি এবং অন্যান্য মেহনতকরনেওয়ালা ভাইদেরকে এমনকি মুজাহিদ ভাইদেরকেও 'নিজের চেয়ে ছোট মেহনত করনেওয়ালা ভাই' মনে করতে থাকি। অথচ আমরা লক্ষ্য করিনা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ জিহাদকে 'দ্বীন' তথা 'পরিপূর্ণ' আমল বা মেহনত সাব্যস্ত করেছেন, ইসলামের চূঁড়া তথা সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ আমল বা মেহনত আখ্যায়িত করেছেন।

আমরা কি কখনো এভাবে চিন্তা করেছি- এমনটি কি হতে পারে না যে, আমার মন হয়ত আমাকে একটি বুঝ দিয়ে রেখেছে যে- 'আমিই পরিপূর্ণ হক', আর আমি তাতেই বিশ্বাস করে সন্তুষ্টচিত্তে বসে আছি? অথচ, হয়ত আমি পরিপূর্ণ হক নই কিংবা আমার কাছে আল্লাহ্ পাক এখন যা চাচ্ছেন তা আমি করছি না; (আর এ ব্যাপারে আমার ভিতরে কোনো চিন্তা-চেতনা বা খেয়াল-খবরও নেই, অন্যদিকে আমি পরিপূর্ণ হকের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছি কিনা, বর্তমানে আমার কর্তব্য ও করণীয় কী- তাও ভালোভাবে কোনোদিন যাচাই করিনি!) হায়! অথচ আমি নিজেকে 'পরিপূর্ণ' হকের তালাশকারী মনে করি।

** আবার আমরা কেউ কেউ তো আরো এক ধাপ এগিয়ে যাই; নিজের মেহনতকে ছাড়া দ্বীনের অন্যান্য মেহনতকে 'গোমরাহী' ভাবা শুরু করি। হয়ত কেউ কেউ অন্যান্য মেহনতকে গোমরাহী বলে মুখে স্বীকার করি না, কিন্তু যারা দ্বীনের অন্যান্য মেহনত করে থাকেন এবং আমার মেহনতের সাথে জুড়েন না, তাদের সাথে আমি এমন সব আচরণ করি যেন ঐ ব্যক্তিরা গোমরাহ হয়ে গিয়েছে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!

• 'পরিপূর্ণ হকের মানদণ্ড কী??

যার যিন্দেগী আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর সাথে সর্বাধিক মিলবে, যার যিন্দেগী আল্লাহর রাসূলের ﷺ সীরাতের সাথে সর্বাধিক মিলবে, যার যিন্দেগী সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের যিন্দেগীর সাথে সর্বাধিক মিলবে, সে-ই ততোধিক হক, সে-ই ততোধিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, তার যিন্দেগীই ততোধিক কুরআনী যিন্দেগী!..........

এক্ষেত্রে একটা দুইটা আমল কিংবা কিছু আমল করেই, অথবা বাহ্যিক কিছু দ্বীনদারী অবলম্বন করে আমি যদি সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকি যে, আমার যিন্দেগী সুন্নতী যিন্দেগী হয়ে গিয়েছে, তাহলে আমার মারাত্মক একটি ভুল হয়ে যাবে। বাহ্যিকতার পাশাপাশি আত্মিকতা, যিন্দেগীর মাকসাদ (তথা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য), পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করা, ঈমান-আকীদা, আল ওয়ালা ওয়াল বারা (আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করা), একমাত্র আল্লাহর আইনকে মেনে নেয়া এবং তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা, তা'লিম-তরবিয়ত, তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) এবং দাওয়াতের পাশাপাশি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরামকে অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁদের পবিত্র যিন্দেগীর সাথে আমাদের যিন্দেগী মিলাতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

• নিজের মেহনতকে বড় এবং অন্যের মেহনতকে ছোট করে দেখার কারণ-

জিহাদ সবচেয়ে দামী মেহনত হওয়া সত্ত্বেও আমরা তা করতে পারিনা বা নিজে যা করি তাকেই সবচেয়ে বেশি দামী মনে হয়, কিংবা দ্বীনের কোনো আংশিক মেহনত করেও তাকে 'পরিপূর্ণ' মনে করতে থাকি।

প্রিয় ভাই, আপনি কি জানেন, এর কারণ কী???
এর একটি কারণ হচ্ছে- আত্মতুষ্টি।

** আমরা মেহনত করি এবং আত্মতুষ্টিতে ভুগি 'আলহামদুলিল্লাহ! আমি তো সবচেয়ে দামী মেহনতের সাথেই জুড়ে আছি।' এই আত্মতুষ্টিই আমাকে নিজের মেহনতকে বড় এবং অন্যের মেহনতকে ছোট করে দেখার প্ররোচনা যোগায় এবং শয়তান আমাদের ঘাড়ে চেপে বসার সুযোগ পেয়ে যায়। আমি কখনো এটি চিন্তা করিনা যে, হয়ত শয়তান আমাকে একটি বুঝ দিয়ে রেখেছে, কিংবা আমার কর্মগুলোকে শয়তান সুশোভিত করে দেখাচ্ছে, ফলে আমি নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিচ্ছি, আমি তো একটা মেহনতের সাথে লেগেই আছি, আর অন্য কোনো মেহনতের সাথে আমার জুড়ার দরকার নেই।

সত্যি বলতে কি! এই ধরনের মানসিকতার কারণে আমার দ্বারা দ্বীনের জন্য বড় বড় কদম দেয়া হয়ে উঠে না। আমার দ্বারা বড় কোনো খেদমতও আল্লাহ তা'আলা নিচ্ছেন না। কিংবা আমি যা করছি তা-ই আমার চোখে অনেক বড় বলে মনে হচ্ছে। (আল্লাহ্ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।)

** এরকম হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, মেহনতের ক্ষেত্রে আমি সবসময় আমার রুচিবোধ, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে মেহনত করি। যে মেহনত আমার রুচি মাফিক হয়, যে মেহনত আমার হাতের নাগালে আছে, যেই মেহনতের দ্বারা আমি প্রথম দ্বীনের উপর চলা শুরু করেছি কিংবা আল্লাহ তা‘আলা যেই মেহনতের দাওয়াতের উসীলায় আমাকে দ্বীনের উপর উঠার তাওফীক দিয়েছেন, যেই মেহনতে বিপদাপদ ও ঝামেলা কম, তুলনামূলক নিরাপদ ও সহজসাধ্য- সেই মেহনত ছাড়া অন্য কোনো মেহনত আমি করতে চাই না। অথচ আমি যেই মেহনতই করি না কেন আমাকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে, দ্বীন এবং মুসলমানদের জন্য বর্তমানে কোন্ মেহনতটি এখন আমার উপর ফরয?! কোন্ ক্ষেত্রে কাজ করলে অল্প সময়ে উম্মতের বেশি ফায়দা হবে?! অল্প মেহনতের দ্বারা সওয়াবও অনেক বেশি হবে! আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টিও সর্বাধিক হাছিল হবে!

• প্রিয় ভাই, এমনভাবে আমরা কখনো ভেবেছি কি?

** যদি এমন হয়, বর্তমানে আল্লাহ তা‘আলা চাইছেন বা ফরযে আইন করেছেন যে, উম্মত এই মেহনত করুক আর আমি আমার মনোযোগকে অন্য দিকে নিবদ্ধ করে রেখেছি, অন্য কোনোভাবে সময় ব্যয় করছি, অন্যভাবে দ্বীনের ফিকির করছি, তাহলে একটু চিন্তা করি, আমি কি ফরয তরককারী হয়ে গেলাম না? ফরয নামায বাদ দিয়ে অন্যান্য নফল আমল কিংবা মেহনত করতে থাকা যেমনিভাবে মেনে নেয়া যায় না; তেমনিভাবে অন্য যে কোনো ‘ফরযে আইন’ বাদ দিয়ে অন্যান্য নফল, সুন্নত, ওয়াজিব কিংবা ফরযে কিফায়া আমল বা মেহনত করতে থাকলে সে কারণেও কি আমরা ফরয তরককারী হয়ে যেতে পারি না?

দ্বীনী কোনো মেহনত করার পরও, কোনটি আল্লাহর ফরয হুকুম সেটি খেয়াল না রাখার দরুন মেহনতের ক্ষেত্রে আমি আল্লাহ পাকের ইচ্ছার সামনে আমার নিজের নফসের চাহাদকেই কি বেশি প্রাধান্য দিলাম না? নেক আমল মনে করে আমি কি নিজেকে নিজে ধোঁকা দিচ্ছি না?

এমনটি হলে ভয় হয়, হায়! আমার সকল মেহনত আল্লাহ তা‘আলার কাছে বেকার সাব্যস্ত হয়ে যায় কিনা; অথচ আমি মনে করছি আমি তো অনেক নেক আমল করে যাচ্ছি! নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ، ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

“(হে নবী!) বলুন: আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দিব, যারা আমলের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে সব লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে তারা নেক কাজ করছে।” (১৮ সূরা কাহাফ্ : ১০৩-১০৪)

** বর্তমান সময়ে, মুসলিম উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে, যখন জিহাদ প্রতিটি সক্ষম মুসলমানের উপর ফরযে আইন হয়ে গেছে, তখন জিহাদ বাদ দিয়ে কেবল আমরা যদি মাদরাসা, খানকাহ, তাবলীগ, রাজনীতি, কিতাবাদি রচনা, চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি অন্যান্য দ্বীনী খেদমত কিংবা দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত থাকি, তাহলে জিহাদ করবে কে ভাই??? আমি যেই মেহনতই করি না কেন, আমার মেহনতের পাশাপাশি আমাকে যেভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে জিহাদও করতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমরা যদি বর্তমান যুগে জিহাদকে শুধু এর শাব্দিক অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাই, কিংবা কলমের জিহাদ, পিতা-মাতার খেদমত কিংবা মাদরাসায় দরস্ দেয়ার মাধ্যমে, নফসের ইসলাহ করা, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

ইত্যাদি কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে যদি মনে করি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ফরজিয়াত আদায় হয়ে যাবে, তাহলে আমাদের জন্য এটি হবে মারাত্মক ভুল ও ভয়ানক আত্মঘাতী একটি সিদ্ধান্ত!!!
আচ্ছা ভাই! আপনি কি খাইরুল কুরুন ও পরবর্তী সলফে সালেহীনদের যুগে এই সকল চিন্তা চেতনা খুঁজে পেয়েছেন?? হাদীসশাস্ত্র কিংবা ফিকহের কোনো কিতাবে 'কিতাবুল জিহাদে' কি ইলমী খেদমত, তাযকিয়া, সিয়াসাত (রাজনীতি) কিংবা দাওয়াতের ফাযায়েল বা মাসায়েল বর্ণনা করা হয়েছে, নাকি ক্বিতাল তথা সশস্ত্র যুদ্ধের ফাযায়েল বর্ণিত হয়েছে??

হাদীসশাস্ত্র কিংবা ফিকহের কোন্ কিতাবে 'কিতাবুল জিহাদে' সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া জিহাদের ভিন্ন অর্থ করা হয়েছে??? তাহলে ভাই, কেন আমরা জিহাদের 'ভিন্নার্থ' তালাশ করে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছি??? 'জিহাদের' নামে কেন আমরা নিজেদেরকে ধোঁকা দিচ্ছি???

** সাহাবায়ে কেরামের যামানায় দুই শ্রেণির মুসলমান ছিল। এক. খাঁটি মুসলমান, দুই. মুনাফিক। যারা আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন, তাঁরা ছিলেন খাঁটি মুসলমান আর যাঁরা জিহাদ ত্যাগ করতো, তারা ছিল মুনাফিক। মুনাফিকরা মুসলমানদের সাথে সকল আমলে জুড়ত, জিহাদ ছাড়া। তাই বর্তমান সময়েও দ্বীনের সকল কাজ করার পরেও জিহাদ ত্যাগ করার কারণে ভয় হয় আমাদের নাম 'মুনাফিক'দের তালিকায় চলে যায় কিনা, যেই অবস্থাটি আল্লাহর রাসূলের যামানায় ছিল। দ্বীনতো ভাই সেটিই আছে, কিন্তু আমাদের মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা নষ্ট হয়ে গেছে। শরীয়াহর গণ্ডিবহির্ভূত নানা তত্ত্ব ও মনগড়া যত মতবাদ উদ্ভাবন করে, শরীয়াহর বিধানসমূহের ক্ষেত্রে স্রেফ নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত ও বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন নানা অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে, সেগুলোকে আমরা 'হেকমত' নামে চালিয়ে দিচ্ছি। যে যত বেশি জিহাদ থেকে পালানোর পন্থা উদ্ভাবন করতে পারছি, আমি নিজেকে তত বেশি 'হেকমতওয়ালা' মনে করছি!!!

** দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদেরই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে আমরা যারা দুনিয়া নিয়েই সবসময় ব্যস্ত থাকি, দুনিয়া নিয়েই যাদের ভোর আর দুনিয়া নিয়েই যাদের সন্ধ্যা, যাদের চিন্তা-চেতনার পুরোটাই দুনিয়া, আমাদের অবস্থা কী হবে, একটু চিন্তা করি!! হায়! আমরা জিহাদ থেকে কতটুকু দূরে!!!............

প্রিয় ভাই! ইনশাআল্লাহ্, এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করবো কিভাবে শয়তান জিহাদের ব্যাপারে বিভিন্ন তবকার মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই তাওফীকদাতা।

আলেম ভাইদেরকে শয়তানের ধোঁকা:

• ইলম অর্জনের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করে দেয়া:

** কোন্ ইলম অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি সর্বাগ্রে অর্জন করা প্রয়োজন, ইলম অনুযায়ী আমলের গুরুত্ব- এসব বিষয়ে শয়তান একজন আলেমকে গাফেল রাখে। আমাদের সামনে শয়তান শুধু ইলম অর্জনের ফায়দা-ফাযায়েল সম্বলিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ তুলে ধরে, ফলে অভিশপ্ত শয়তান আমাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, 'যেহেতু আমি ইলম অর্জন করেছি, তাতেই আমি আল্লাহর রাসূলের ﷺ ওয়ারিশ হয়ে গেছি', যার ফলে আমাদের অর্জিত ইলমের উপর সন্তুষ্টি চলে আসে, তখন আমরা নিজেদের যিন্দেগী নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ পাইনা। যতটুকু ইলম হাছিল হলো তাতেই আমাদের 'আত্মতৃপ্তি' চলে আসে। কিন্তু ভাই! আমরা একথা চিন্তা করি না-"আল্লাহর রাসূলের ﷺ ওয়ারিশ হতে হলে কেবল তাঁর ﷺ ইলমের ওয়ারিশ হলেই চলবে না, তাঁর যিন্দেগীরও ওয়ারিশ হতে হবে; কেবল কিছু শব্দ আর বাক্যের ওয়ারিশ হলেই চলবে না, তাঁর ﷺ যিন্দেগীর আমল সমূহেরও ওয়ারিশ হতে হবে।"

** ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে, তা হলো-

এক. যে ইলম অর্জন করা অন্য সকল প্রকার ইলম হাছিলের উদ্দেশ্য (মাকসাদ), যেমন: আল্লাহ তা'আলার মা'রেফাত, তাঁর মহব্বত, আল্লাহর রাসূলের ﷺ মহব্বত, আখিরাতের স্মরণ অন্তরে সৃষ্টি করা এবং আল্লাহর রাসূলের যিন্দেগীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে নিজের যিন্দেগীকে গড়া- এগুলো হলো সকল ইলম হাসিলের মূল মাকসাদ।

দুই. মূল মাকসাদে পৌঁছার জন্য সহকারী ইলম হাসিল করা, যেমন: আরবী ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, নাহু-ছরফ, ফিকাহ, তাফসীর, হাদীসশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে ইলম অর্জন করা।

এক্ষেত্রে শয়তান যে কাজটি করে তা হলো, একজন তালিবুল ইলমকে (ছাত্রকে) কিংবা একজন আলেমকে মূল মাকসাদের কথা ভুলিয়ে মাকসাদ হাছিলের সহকারী/সহায়ক ইলমের পিছনেই আজীবন লাগিয়ে রাখে। যার ফলে অনেক সময় দেখা যায়- আমাদের কেউ কেউ 'ইলমের জাহাজ' কিংবা 'সাগর' হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূলের পবিত্র ﷺ যিন্দেগীর সাথে আমাদের যিন্দেগীর পরিপূর্ণ মিল পাওয়া যায় না।

আমাদের দৃষ্টি কেবল তাত্ত্বিকতার মধ্যেই আটকে যায়, ব্যবহারিকতার দিকে যায় না। অঢেল ইলমওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূলের ﷺ কিংবা সাহাবাদের মেজাজের সাথে আমাদের অনেকের মেজাজের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

কেউ কেউ আবার দু'চারটি টাকার সামনে মাথানত করে নিজের ঈমানকে সস্তায় বিক্রি করে দেই। তাছাড়া, মানুষের কাছে 'অনেক বড় আলেম' হিসেবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অন্তর থেকে 'দুনিয়ার মহব্বত' আর 'মৃত্যুর ভয়' দূর হয় না।

আর, যে ইলমের দ্বারা অন্তরে 'মাখলুকের ভয়ে'র চেয়ে 'আল্লাহর ভয়' বেশি শক্তিশালী না হয়, সে ইলমের কী মূল্য আছে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে? আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ-

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاء

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।"

[৩৫ সূরা ফাতির: ২৮]

এজন্য, যে ইলমের দ্বারা দিল থেকে দুনিয়া নামক নাপাক বস্তুটি দূর হয় না, মৃত্যুর মহব্বত পয়দা হয় না, আল্লাহর ভয় পয়দা হয়না, আল্লাহকে পাওয়া যায় না, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﷺ ভালোবাসা দুনিয়ার সকল কিছুর মহব্বতের তুলনায়, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি না হয়, সেই ইলম তো প্রকৃতপক্ষে ইলম নয়, তাকে আমরা 'ইলমের' আবরণে এক প্রকারের 'জাহেলিয়াত' বলতে পারি! আর রব্বে তা'আলার কাছে জাহেলিয়াতের কোনো মূল্য থাকতে পারে না।

আরেকটি বিষয় হলো, আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগী ও মেজাজের সাথে মিল সৃষ্টি না হলে, দীনের সর্বত্র বিচরণ করাও সম্ভব হয়ে ওঠে না; দ্বীনের কোনো একটি শাখায়ই আজীবন ঘোরপাক খেতে হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক পথ দেখান। আমীন।

• জিহাদের মেহনত করলে ইলমী খেদমতের ক্ষতি বা কমতি হবে-এরূপ চিন্তা করানো:

** ধরুন, আমি কুরআন কারীমের তিলাওয়াত শিখানোর মেহনত করছি; আমি একটি মক্তব বা হাফেযী মাদরাসার উস্তাদ। আমার মাদরাসায় পাঁচশত বা হাজার খানেক নিয়মিত ছাত্র আছে। আলহামদুলিল্লাহ! নিঃসন্দেহে, এটি অনেক বড় দ্বীনী খেদমত। কেননা, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে-ই, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়।"

(সহীহ বুখারী-৫০২৭; আবু দাউদ-১৪৫২; তিরমিজি-২৯০৭, ২৯০৮, ২৯০৯)

কিংবা মনে করুন, আমি একজন মাদরাসার উঁচু পর্যায়ের উস্তাদ, কিংবা শাইখুল হাদীস, প্রধান মুফতী অথবা কোনো মাদরাসার মুহতামিম আমি; আমার দ্বারা ইলমী অনেক খেদমত আল্লাহ তা'আলা নিচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ। এখন মনে করুন, সাধারণভাবে উম্মাহর সক্ষম সকলের উপর জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ' ফরয হয়ে গেল, তাহলে এখন আমার-আপনার করণীয় কী?

একটু চিন্তা করুন তো ভাই, দ্বীনী কোনো দায়িত্বে থাকা অবস্থায় কারো মাঝে আল্লাহর ভয় থাকলে ফরজ নামাজ পরিত্যাগ করা বা তাতে অলসতা করা কি কারো পক্ষে সম্ভব? তাহলে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে, আমরা কিভাবে তা পরিত্যাগ করতে পারি বা তাতে অলসতা প্রদর্শন করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম আমাদের স্থানে থাকলে কী করতেন? তাঁরা কি কেবল মসজিদ-মাদরাসার ফিকির নিয়েই বসে থাকতেন?? নাকি পাশাপাশি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মেহনতও করতেন, এলায়ে কালিমাতুল্লাহর ফিকিরও করতেন?? আসহাবে সুফ্ফারা কি কেবল ইলম চর্চাতেই ব্যস্ত থাকতেন, নাকি 'সামরিক জীবন' বলতেও তাঁদের একটি যিন্দেগী ছিল?? যুদ্ধের অবস্থার প্রেক্ষাপটে তো তাঁরা 'মাদরাসায়ে সুফ্ফা' বন্ধ রেখেই ময়দানে চলে যেতেন এবং লড়াই করতেন, তাইনা??

প্রিয় ভাই!

হযরত আবু হুরাইরা রাদি. কি ময়দানের লড়াকু বীর ছিলেন না??.............
হযরত আনাস বিন মালিক রাদি. কি যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন না??.............
হযরত বেলাল রাদি. কি কেবল মুয়াজ্জিন-ই ছিলেন, মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ্ ছিলেন না???..................
লক্ষ লক্ষ পুরুষ সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাঈন) ছিলেন, সক্ষম এমন একজন পুরুষের নাম কি আমরা দেখাতে পারবো যিনি মুজাহিদ ছিলেন না?? আল্লাহর রাহে জিহাদ করেননি???
বরং আল্লাহর রাসূলের যামানার কোনো কোনো নারী সাহাবাগণও যুদ্ধের ময়দানে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন। আল্লাহু আকবার! হযরত ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, হযরত উম্মে উমারা, হযরত আসমা বিনতে আবু বকর, হযরত আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না আযমাঈন)-গণের কথা কি আমরা ভুলে গিয়েছি? তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তো বীরত্ব ও সাহসিকতায় অনেক পুরুষ সাহাবীকেও হার মানিয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহ!

শুধু কি তাই, যেই অন্ধ সাহাবী হযরত উম্মে মাকতুম রাদি.-এর দোয়ার উসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার সকল অক্ষমদের উপর থেকে জিহাদের ফরযিয়াত রহিত করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে জিহাদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, প্রিয় ভাই, আপনি কি জানেন সেই অন্ধ সাহাবী কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন??

অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ আর শাহাদাতের তামান্না থেকে একচুল পরিমাণও পিছিয়ে ছিলেন না; জিহাদের ফজিলত থেকে মাহরূম থাকা তার জন্য খুব কষ্টকর ও বেদনাদায়ক ছিল।

অবশেষে, হযরত উমর রাদি. এর খিলাফতের যামানায় চতুদর্শ হিজরিতে সংঘটিত পারস্যদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ও সিদ্ধান্তমূলক ঐতিহাসিক 'কাদেসিয়ার যুদ্ধে' এই মহান অন্ধ সাহাবী অংশগ্রহণ করেন। যেহেতু লড়াই করতে পারবেন না, তাই মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহন এবং জীবন দিয়ে হলেও তা সমুন্নত রাখার দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেকে পেশ করেন।

যুদ্ধের ইতিহাসে নজির বিহীন ভয়াবহ এক যুদ্ধ ছিল এটি। তিনদিন ব্যাপী চলমান রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধের ফলাফল হয়েছিল মুসলিম বাহিনীর চূড়ান্ত বিজয়। আর এরই মাধ্যমে তৎকালীন পৃথিবীর প্রধান পরাশক্তি পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। আল্লাহু আকবার!
এই মহা বিজয় অর্জনের জন্য মূল্য হিসেবে পরিশোধ করতে হয়েছিল শত শত শহীদের অমূল্য জীবন। তাদের মাঝে ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাকতূম রাদি. এর জীবনও। সেদিন যুদ্ধের প্রান্তরে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তাঁর রক্তমাখা নিষ্প্রাণ দেহ- যা মুসলিম বাহিনীর পতাকাটিকে তখনো বুকের মাঝে আগলে রেখেছিল।
সুবহানাল্লাহ!! উনারাই ছিলেন আমাদের পূর্বসূরী, উনারাই ছিলেন আমাদের প্রকৃত সালাফ!! উনারাই ছিলেন আমাদের প্রকৃত আকাবীর!!! রাদিয়াল্লাহু আনহুম আযমাঈন।
এই রকম আরো অনেক ঘটনা রয়েছে সীরাতের কিতাবগুলোতে। শারীরিক অক্ষমতাও সাহাবায়ে কেরামদেরকে জিহাদ থেকে দূরে রাখতে পারেনি!! আল্লাহু আকবার।

** আমরা অনেকে মনে করি, আমি একটি মাদরাসার ইলমী খেদমতে আছি। আমি জিহাদ করলে বা জিহাদের জন্য আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়লে ইলমের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে, মানুষের মধ্যে ইলমের প্রচার প্রসার কিভাবে হবে?? বা তখন আমার মাদরাসার কি অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে না??..................................

প্রিয় ভাই! জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মেহনতের মাধ্যমে আমাদের কুরআনের খেদমত আরো বেশি হতে পারে। কিভাবে?.......

কুফ্ফার কর্তৃক আক্রান্ত মুসলিম ভূমিতে আমাদের মাধ্যমে মুসলমানদের দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে; হয়ত আল্লাহ তা'আলা আমাদের দ্বারা পৃথিবীর কোনো ভূমিতে তাঁর দ্বীন পরিপূর্ণরূপে কায়েম করাবেন, ফলে সেখানে কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন আমরা এরকম হাজারটা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে পারবো ইনশাআল্লাহ; তখন, লক্ষ লক্ষ মানুষ কুরআন শিখতে পাবে, দ্বীনের ইলম লাভ করে পরকালে নাজাত পাবে আর আমরাও কেয়ামত পর্যন্ত সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব পেতে থাকবো ইনশাআল্লাহ্।

আর না হয়, হয়ত আমরা শহীদ হয়ে কামিয়াবীর যিন্দেগী লাভ করবো। আর আমি যদি জিহাদ করতে করতে শহীদ হওয়ার কারণে মাদরাসার খেদমত না করে যেতে পারি, তাহলেও ক্ষতি নেই। কেননা, আমার ভাইয়েরা যখন দ্বীন কায়েম করবেন এবং এরকম বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করবেন, তারা যা সওয়াব লাভ করবেন, তাদের সাথী হওয়ার কারণে আমাদেরকেও আমাদের নিয়তের কারণে সেই সওয়াব দেয়া হবে, ইনশাআল্লাহ্। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অভাব মুক্ত, অমুখাপেক্ষী।

** জিহাদের কারণে কোনো মাদরাসা বন্ধ হয়েছে, ইলমের তলব কিংবা ইলমী খেদমতের ত্রুটি হয়েছে, এমন নজির ইসলামের ইতিহাসে কোথাও আছে কি? বরং ইসলামের ইতিহাসের একদম শুরু থেকেই জিহাদ আর ইলমের তলব একসাথে চলেছে।

আল্লাহর রাসূলের ﷺ যামানার কথাই ধরা যাক! জিহাদের কারণে সাময়িকভাবে মসজিদে নববীর 'ছুফ্ফা' কেন্দ্রিক ইলমী মারকায/মাদরাসা বন্ধ থাকলেও ইলমের তলব কিন্তু একদিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি। জিহাদের ময়দানে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূলের কাছে জিহাদ কিভাবে করতে হয় তা শিখেছেন, কিভাবে গনীমত, ফাঈ ইত্যাদি বণ্টন করতে হয় তা শিখেছেন, বন্দীদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম কী তা শিক্ষা করেছেন, বিজিত এলাকাসমূহে কিভাবে আল্লাহর আইন ও শরীয়াহ্ কায়েম করতে হয় তা শিখেছেন, শত্রুপক্ষের কোনো গাদ্দার বা গোয়েন্দা ধরা পড়লে তাদের ব্যাপারে কী হুকুম তা শিখেছেন, বন্দী হওয়া নারী-শিশু ও দাসী-বাদীদের ব্যাপারে আল্লাহর কী হুকুম তা শিখেছেন। তাছাড়া, জিহাদের ময়দানে তো আর আয়াত নাজিল হওয়া কখনো বন্ধ ছিল না। সেখানেও 'কাতেবে ওহী' (ওহী লেখক)-গণ থাকতেন। যখন যে আয়াত নাযিল হত, সাহাবায়ে কেরাম সঙ্গে সঙ্গে তা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন আর তা শিখে নিতেন। সে সকল আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছ থেকে বুঝে নিতেন। সুবহানাল্লাহ! এভাবেই সর্ব হালতে সাহাবায়ে কেরামের ইলমী মেহনত ও খেদমত জারী থাকত! সাহাবায়ে কেরাম ইলমী খেদমতের দোহাই দিয়ে কখনো জিহাদ হতে পিছিয়ে থাকতেন না।

** প্রিয় ভাই! জিহাদ করার কারণে ইলমী মেহনতের বা ইলমী খেদমতের কিংবা মাদরাসাসমূহের কখনো কোনো ক্ষতি হয়নি- এটা যেমনভাবে অকাট্য সত্য, তার চেয়েও বেশি সত্য ব্যাপার হচ্ছে- জিহাদ না করার কারণে ইসলামী

ইতিহাসের একটি-দুটি নয়, বিখ্যাত হাজার হাজার মাদরাসা আমরা হারিয়েছি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হায়! কোথায় আজ বুখারা আর সমরখন্দের সেই মাদরাসাগুলো? আজ কোথায় রাশিয়ার সেই হাজার হাজার মাদরাসাগুলো?

কোথায় কর্ডোভা আর গ্রানাডার হিফযখানা আর কিতাবখানাগুলো? কোথায় হারিয়ে গেল আরাকানের সেই ইলমী মারকাযগুলো??

তুর্কিস্তানের মাদরাসাগুলো আজ কোথায়?

কোথায় হারিয়ে গেল আমাদের 'জিহাদহীন' সেই ইলমের তলব আর ইলমী খেদমত?

আমাদের কী ছিল না?...............

আমাদের কি হাজার হাজার তালেবে ইলম ছিল না? আমাদের কি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক আর আলেমে দ্বীন ছিল না? আমাদের কি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় 'কুতুবখানা' ছিল না?? সেগুলো আজ কোথায়?? কোথায় 'তাতারীদের হাতে ধ্বংস হওয়া' বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাঠাগার, বাগদাদের সেই লাইব্রেরি???...............

রক্তাক্ত এই ইতিহাসগুলো কি আমরা ভুলে গিয়েছি? আজ আমাদেরকে অবশ্যই সত্য সত্য জবাব দিতে হবে-"সেই মাদরাসাগুলো কি আমরা জিহাদ করার কারণে হারিয়েছি, নাকি জিহাদ না করার কারণে?"...........

আজ আফগানিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখি! আল্লাহর রহমতে জিহাদের মাধ্যমে মাদরাসার মেহনত সেখানে কতটা জোরদার হচ্ছে!!! আমাদের বীর মুজাহিদ ভাইয়েরা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে ইলমের খেদমত কিভাবে করে যাচ্ছেন!! তারা হাজার হাজার মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছেন, সকল শ্রেণির মানুষের জন্য দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন! প্রতিটি মুসলমানের বাচ্চার জন্য দ্বীন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন! প্রিয় ভাই! জিহাদ না করে আমরা কি পারছি তাদের মতো ইলমী খেদমত করতে??............

• জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার পর আমাদের করণীয় কী???-এই বিষয়ে অসচেতন রাখা:

প্রিয় ভাই, এ সম্পর্কে "কিতাবুত্ তাহরীদ্ 'আলাল ক্বিতাল: দ্বিতীয় পর্ব: তাওহীদ ও জিহাদ" কিতাবটিতে বিস্তারিত দলীল ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই, জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় আমাদেরকে কুরআন কারীম শিখানোর মেহনত কিংবা মাদরাসার দরস্ দানের ইবাদত (যা একটি ফরযে কিফায়া কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে নফল আমল) এর পাশাপাশি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মেহনত অবশ্যই করতে হবে। মুজাহিদ ভাইদের হক জামাত তালাশ করে তাতে যোগ দিতে হবে। অতঃপর আমীরের ফয়সালা অনুযায়ী (জিহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী) আমাদেরকে যেভাবে দ্বীনী খেদমত করতে বলা হয় সেভাবেই করতে হবে। যদি আমাকে মসজিদ বা মাদরাসার খেদমতের ফয়সালা দেয়া হয় এবং পাশাপাশি জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোনো তাকাজা দেয়া হয় (যেমন- দাওয়াত ও ই'দাদ) তবে আমাকে তাই করতে হবে। সেক্ষেত্রে ময়দানে না গিয়েও আমি জিহাদের সওয়াব পাব ইনশাআল্লাহ। আর যদি জিহাদের প্রয়োজনে আমাকে ময়দানে যাওয়ার ফয়সালা দেয়া হয়, তাহলে আমাকে মসজিদ-মাদরাসা-খানকাহ-অন্যান্য দ্বীনী বা দুনিয়াবী কাজকর্ম ছেড়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ইনশাআল্লাহ, ঠিক যেমনভাবে সাহাবায়ে কেরামগণ করেছিলেন।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, যদি আমরা ফরযে আইনের তাকাজা পুরা করতে গিয়ে ফরযে কিফায়া কিংবা নফল ইবাদত করতে সক্ষম না হই, এজন্য আমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, কিন্তু ফরযে আইন ত্যাগ করলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার সামনে 'অপরাধী' সাব্যস্ত হতে হবে, আমাদেরকে 'ফরয তরককারী' সাব্যস্ত হতে হবে, যদিও আমরা দ্বীনী অনেক বড় মেহনত করছি। এককথায়- জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় আমাদের নিজেদের মনগড়া ভাবে দ্বীনী মেহনত করলে চলবে না, অবশ্যই জিহাদের তাকাজা/প্রয়োজনকে সামনে রেখে দ্বীনের অন্যান্য শাখায় মেহনত চালিয়ে যেতে হবে, যে কোনো সময় জিহাদের যে কোনো তাকাজা পুরা করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে, খুরুজের (জিহাদের জন্য বের হওয়ার) প্রয়োজন হলে খুরুজ, জীবন দেয়ার প্রয়োজন হলে জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

• আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করি না; তার কারণ....

প্রথম কারণ:

একজন প্রসিদ্ধ আলেম অনেক উলামায়ে কেরামের সক্রিয়ভাবে সশস্ত্র জিহাদ না করার ব্যাপারে অবাক হওয়ার মতো একটি কারণ বয়ান করলেন। প্রকৃতপক্ষে, আমরা অনেকেই এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে থাকি। তাই বিষয়টি উম্মতের সামনে পরিষ্কার করা দরকার। তিনি বললেন, "আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করিনা; কারণ, আমাদের চার মাযহাবের কোনো ইমাম এবং আমাদের অমুক অমুক আকাবীরদের যিন্দেগীতে সশস্ত্র জিহাদ ছিল না। তারা আজীবন এলেমের খেদমত করে গেছেন। তাই আমরাও আজীবন এলেমের খেদমত করে যাবো।"

যুক্তিখণ্ডন:

প্রিয় ভাই! এই ধরণের মন্তব্য করার আগে আমাদের আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। কেননা, এই ধরণের মন্তব্য যদি আমরা করি, তাহলে এটি মূলত ইসলামের বড় বড় ইমামদের উপর অনেক বড় ধরণের অপবাদ আরোপ করা হয়!

কিভাবে?...........

এবার, তাহলে ভালো করে খেয়াল করুন, উপরোক্ত উক্তিটির দ্বারা আইম্মায়ে কেরামের উপর মূলতঃ নিচের অপবাদগুলো আরোপ করা হয়-

১. একদল লোক আছে, তারা শুধু 'জিহাদ, জিহাদ' করে; যেন জিহাদ ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। আইম্মায়ে কেরাম কি দ্বীন বুঝেন নাই? তাঁরা যেমন বুঝে-শুনে, যথেষ্ট কারণ বের করে এবং আমলের গুরুত্ব অনুধাবন করে জিহাদ করেননি, তেমনিভাবে আমরাও বুঝে-শুনে, যথেষ্ট কারণ জেনে এবং আমলের গুরুত্ব অনুধাবন করেই জিহাদ করছি না। যেটা এখন সবচেয়ে বেশি করা দরকার, আমরা সেটাই করছি। আমরা ও তাঁরা এক পথেই হাঁটছি। একটু অন্যভাবে বললে, যদি কেউ মনে করে যে, আমরা দ্বীন বুঝি না, তাহলে তো তাঁরাও (আইম্মায়ে কেরামগণও) দ্বীন বুঝেন নাই! (নাউযুবিল্লাহ্)

২. যেহেতু আমরা এবং আইম্মায়ে কেরামগণ একই মানহায/পথ/তরীকার উপর আছি, সেহেতু যদি কেউ বলে যে, আমরা জিহাদ তরককারী, তাহলে কি তাঁদেরকেও (আইম্মায়ে কেরামগণকেও) ‘জিহাদ তরককারী’ বলা হবে না?? (নাউযুবিল্লাহ্)

৩. আইম্মায়ে কেরাম কি জিহাদের গুরুত্ব বুঝেন নাই? যেহেতু আমরা ও তাঁরা একই সিলসিলার পথিক, জিহাদ না করার কারণে যদি কেউ আমাদেরকে বলে যে, আমরা জিহাদের গুরুত্ব বুঝি না, তাহলে কি তাঁরাও (আইম্মায়ে কেরামগণও) জিহাদের গুরুত্ব বুঝেন নাই?? (নাউযুবিল্লাহ্)

৪. আমরা মনে করি, তাঁরা (আইম্মায়ে কেরামগণ) ইলমের খেদমতকে জিহাদের ময়দানের খেদমতের চেয়ে বড় মনে করতেন। তাই তাঁরা আজীবন ইলমের খেদমত করে গেছেন। তাই মাযহাবের ইমামদের মতো আমরাও মনে করি, ইলমের খেদমত জিহাদের খেদমতের চেয়ে বড় ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরাও আজীবন মাদরাসার তথা ইলমের খেদমত করে যাবো। মাদরাসার খেদমত ছেড়ে আমরা অন্য কোনো ফিকির করবো না। জিহাদ না করার কারণে যদি কেউ বলে যে, আমরা ভুল পথে আছি, তাহলে কি আইম্মায়ে কেরামগণও ভুল পথের পথিক ছিলেন না?? (নাউযুবিল্লাহ্)

এইখানে এসে কিছু কথা!!!

সাহাবায়ে কেরামগণ হচ্ছেন হিদায়াতের মানদণ্ড। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইরশাদ করেন-

............ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ ....

“.........লোকেরা (সাহাবায়ে কেরামগণ) যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও সেভাবে ঈমান আনয়ন কর......”

(সূরা বাকারা ০২:১৩)

فَإِنۡ ءَامَنُواْ بِمِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهۡتَدَواْ

“আর যদি তারা ঈমান আনে, যেরূপ তোমরা (সাহাবায়ে কেরামগণ) তাঁর (আল্লাহর) প্রতি ঈমান এনেছ, তাহলে তারা অবশ্যই হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।” (সূরা বাকারা ০২: ১৩৭)

সুতরাং, আল্লাহর রাসূলের ﷺ পর কাউকে যদি অনুসরণ করতেই হয়, তাহলে সাহাবায়ে কেরামগণকে অনুসরণ করতে হবে।

আবার হাদীসে এও এসেছে,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

“সর্বশ্রেষ্ঠ জামাত হচ্ছে আমার সাহাবীদের জামাত, এরপর শ্রেষ্ঠ যারা তাদের পরবর্তী (তাবেয়ীগণ), এরপর শ্রেষ্ঠ যারা তাদের পরবর্তী (তাবে-তাবেয়ীগণ)।.........”

(সহীহ বুখারী-২৬৫১, ২৬৫২, ৩৬৫১, ৬৪২৯, ৬৬৫৮; সহীহ মুসলিম-৬৩৬৪; আল লু’লু ওয়াল মারজান-১৬৪৬; বুলুগুল মারাম-১৪০০; সুনানে আন-নাসায়ী-৩৮০৯; আত্ তিরমিজি-২২২১, ২৩০২; সুনানে ইবনে মাজাহ-২৩৬২)

এখন, আমরা যদি সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগী দেখি, তাহলে তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের সীরাতেই সশস্ত্র জিহাদ বা কিতালের (যুদ্ধের) আলোচনা পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেকের যিন্দেগীতেই কোনো না কোনো যুদ্ধের কাহিনী রয়েছে। এমনও সাহাবী আছেন, ঈমান আনার পর নামাযের ওয়াক্ত না হওয়ায় নামায পড়তে পারেননি, জিহাদ চলছিল,

জিহাদে শরীক হয়ে শহীদ হয়ে যান। এমনকি জিহাদের ফাযায়েল লাভ করার জন্য জিহাদের বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও অন্ধ, খোঁড়া সাহাবীগণও জিহাদ করেছেন। তাই, নবীজী ﷺ-এর সাহাবাগণের পবিত্র জামাতকে যদি অনুসরণ করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই জিহাদ করতে হবে।

এবার আসুন, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের কথায়। একথা সত্য যে, তাঁদের সকলের যিন্দেগীতে সশস্ত্র জিহাদ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ চার মাযহাবের (ফিকাহ শাস্ত্রের) ইমামগণ, হাদীসের ইমামগণ, মুজতাহিদীন, এক কথায় ইলমের জগতের সাথে সম্পর্কিত ইমামদের মধ্যে কারো কারো যিন্দেগীতে সশস্ত্র জিহাদের ইতিহাস পাওয়া যায়, আবার কারো কারো যিন্দেগীতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কেন?

এখানে এসে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে- তাঁরা কি তাহলে সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী ছিলেন না? যদি অনুসারী হয়েই থাকেন, তাহলে সাহাবাদের প্রায় সকলের যিন্দেগীতেই তো সশস্ত্র জিহাদ ছিল, কিন্তু তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের সকলের যিন্দেগীতে সশস্ত্র জিহাদ নেই কেন? আর যদি তাঁরা সাহাবীদের অনুসারী না হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁরা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত' হলেন কিভাবে? নবীজী ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী হলেন কিভাবে?............

(বি.দ্র: সাহাবায়ে কেরামের জামাতের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণও সশস্ত্র জিহাদ (যুদ্ধ) করেছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পরবর্তী বিশ বছরে প্রায় ত্রিশ হাজার সাহাবী ও তাবেয়ী কেবল শহীদই হয়েছেন। আহতের সংখ্যা অগণিত। বরকতময় এই জামাতের হাতেই পারস্য ও রোম বিজয় হয়েছে। এ সম্পর্কে "কিতাবুত্ তাহরীদ্ 'আলাল ক্বিতাল"-এর দ্বিতীয় পর্বে "জিহাদের অপর নাম জীবন: একটি ইতিহাস ভিত্তিক পর্যালোচনা" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ!

উপরের প্রশ্নগুলো দ্বারা ইলমের সাথে সম্পর্কিত বড় বড় আইম্মায়ে কেরামগণ উদ্দেশ্য। অবশ্য তারাও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ করেছেন। কেউ কেউ সরাসরি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহয় অংশগ্রহণও করেছেন। যেমন: হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক রাহি. ছয় মাস ইলমী খেদমত করতেন, আর বাকী ছয় মাস ময়দানে জিহাদ করতেন। তাঁর মত এরকম আরো অনেকেই ছিলেন। কেউ কেউ শাসকবৃন্দকে সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করেছেন। যালিম শাসকের সামনে অকপটে সত্যকে প্রকাশ করে দিতেন। আর হাদিসে যালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলাকেও জিহাদ বলা হয়েছে।

তাছাড়া তারা শরীয়তকে খুলে খুলে মানুষের সামনে বয়ান করতেন। কোনো কিছু গোপন করতেন না। সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলাতেন না। অর্থের লোভ, সম্মানের হাতছানি তাদেরকে টলাতে পারতো না। মাদরাসার ছাত্রদের সামনে, মসজিদে মুসল্লীদের সামনে, ওয়াজের ময়দানে জনতার সামনে, লেখনীর মধ্যে পাঠকের সামনে সুস্পষ্টরূপে সত্যকে বলে দিতেন। সত্য প্রকাশের ব্যাপারে কারো চোখ রাঙ্গানিকে তারা পরোয়া করতেন না, জালিমের জুলুমকে ভয় করতেন না। কোনো ধরণের জুলুম, নির্যাতন, বন্দিত্ব, নির্বাসন তাদেরকে হক বলা থেকে কিংবা হক প্রচার করা থেকে টলাতে পারতো না। অর্থ কিংবা সম্মানহানির ভয়ে কখনো তারা ভীত হতেন না। চাকুরি কিংবা খেদমত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায় শঙ্কিত হতেন না। মাদরাসা রক্ষা, হেকমত, মাসলাহাত ইত্যাদি অজুহাতে ফরযে আইন অবস্থায় কখনো জিহাদ পরিত্যাগ করতেন না। নিজের সাধ্য অনুযায়ী জিহাদের পথে অগ্রসর হতেন। নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহর জন্য দুআ করতেন। মুজাহিদ ভাইদের সফলতার জন্য কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করতেন। জিহাদ ও

মুজাহিদীনদের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা ও মুহাব্বতে তাদের অন্তর পূর্ণ ছিল। সর্বোপরি, তাদের হৃদয়ে দুনিয়ার মহব্বত আর মৃত্যুর ভয় (তথা ওয়াহন) ছিল না।
জিহাদ করার অপরাধে তারা কখনো কোনো ছাত্রকে তাদের মাদরাসা থেকে বের করে দেননি। তারা কখনো মাদরাসাগুলোকে জঙ্গীবাদ তথা জিহাদমুক্ত ঘোষণা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন না। তারা কখনো তাগুতকে খুশি করতে তাগুতের মনমত ফতোয়া দিতেন না।..............)

প্রিয় ভাই!

আইম্মায়ে কেরামগণ অবশ্যই "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত", তাঁরা অবশ্যই হকের উপর ছিলেন, তাঁরা অবশ্যই সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী ছিলেন, সন্দেহ নেই। তাহলে, সাহাবাদের যিন্দেগীর সাথে কোনো কোনো আইম্মায়ে কেরামের যিন্দেগীর পার্থক্য দেখা যায় কেন? কেন তাদের কারো কারো যিন্দেগীতে সরাসরি অস্ত্রের জিহাদ পাওয়া যায় না? যদি তাঁরা সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী হয়েই থাকেন, তাহলে (বর্তমান যামানায়) তাঁদেরকে কি অনুসরণ করা যাবে না? (যেহেতু তাঁরা 'পরিপূর্ণ' হক ছিলেন), তাঁদেরকে অনুসরণ করতে গিয়ে যদি (বর্তমান যামানায়) সশস্ত্র জিহাদ না করা হয়, তাহলে কেন 'পরিপূর্ণ' হকের উপর থাকা হবে না?.........

দুঃখজনক হলেও সত্য, এইখানে এসেই আমরা অভিশপ্ত শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যাই। বিষয়টি যতটুকু জটিল মনে হচ্ছে, আসলে এতটা জটিল নয়। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

এক্ষেত্রে এসে আমরা অনেকে ভুলে যাই, শরীয়তের কিছু কিছু হুকুম পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে পরিবর্তনশীল। যেমন: কখনো কখনো কোনো একটি হুকুম ফরযে কিফায়া, আবার একই হুকুম বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে কখনো কখনো ফরযে আইন হয়ে যায়। সাহাবাদের যামানা আর তাবেয়ী/তাবে-তাবেয়ীদের যামানার পরিস্থিতি এক রকম ছিল না, আবার তাবেয়ী/তাবে-তাবেয়ীদের যামানার সাথে বর্তমান যামানার পরিস্থিতির মিল নেই। বরং সাহাবায়ে কেরামের সময়ের সাথে বর্তমান যামানার যথেষ্ট মিল রয়েছে। নবুয়ওতের যামানায় যেমন পরিবেশ ইসলামের প্রতিকূল ছিল, বর্তমান যামানায়ও তেমনি প্রতিকূল পরিবেশ বিদ্যমান। অন্যদিকে তাবেয়ী/তাবে-তাবেয়ীদের যামানা ছিল ইসলামের জন্য পুরোপুরি অনুকূল, মুসলমানদের নিরাপত্তার দিক থেকে 'স্বর্ণযুগ' বলা যেতে পারে। অধিকাংশ আইম্মায়ে কেরাম কেন জিহাদ করেননি, আর বর্তমান যামানায় কেন তাদের যিন্দেগীর বিশেষ দিকটি (জিহাদ করা বা না করা) অনুসরণ করা যাবে না, তা বুঝতে হলে নিচের কথাগুলো ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ্-

১. আইম্মায়ে কেরামের যামানায় জিহাদ 'ফরযে আইন' ছিল না, 'ফরযে কিফায়া' ছিল। তখন ইসলামী খিলাফত ছিল। দেশরক্ষা এবং অমুসলিমদের অঞ্চলগুলো জয় করার জন্য উম্মতের যথেষ্ট পরিমাণ বাহিনী ও শক্তি ছিল। শাসকগোষ্ঠীও জিহাদ ছাড়া অন্য কিছু বুঝতো না। সাধারণ মুসলমানদের মাঝে জিহাদী জযবা ছিল একশতে একশ। এক ডাকে পুরো উম্মাহ্ জিহাদের এক পতাকাতলে সমবেত হয়ে যেত। পৃথিবীর বাতিল শক্তিগুলো মুসলমানদের উপর তরবারি উত্তোলন করবে তো দূরে থাক্, নিজেরাই মুসলমানদের ভয়ে দৌঁড়ের উপর ছিল। দিগ্বিজয়ী মুসলিম সেনাপতিরা তাদের ঘুম হারাম করে রেখেছিলেন। এই সকল কারণে তখন সাধারণভাবে সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন ছিল না, ফরযে কিফায়া ছিল। আর তাই জিহাদ না করার কারণে আইম্মায়ে কেরামগণ দোষী সাব্যস্ত হবেন না।

কিন্তু বর্তমানে উম্মতের পরিস্থিতি কী, তা লক্ষ্য করুন! আগেই এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যে, বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে, ফরযে কিফায়া নয়। তাই বর্তমান সময়ে উম্মতের মাঝে জিহাদ করতে সক্ষম যে কেউ জিহাদ না করলে দোষী সাব্যস্ত হবে, ফরয তরককারী হয়ে যাবে।

২. আইম্মায়ে কেরামের যামানায় ইলমের খেদমত করা জিহাদ করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কিভাবে?..........................

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর নানামুখী ফেতনা দেখা দেয়। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান ফেতনা হলো, ইহুদী-নাসারা ও মুনাফিক কর্তৃক জাল হাদীস ও মাসআলা-মাসাইল উদ্ভাবন এবং সাধারণ মানুষের ঈমান-আকীদা নষ্ট করার ফেতনা। এরা বিভিন্ন রকমের মনগড়া জাল হাদীস বানিয়ে উম্মতকে গোমরাহ করছিল। তাই তখন সময়ের দাবী ছিল ইলমুল আকাঈদ, ইলমুল হাদীস এবং মাসআলা মাসাইল (ফিকহ) সমূহ কিতাবাকারে লিপিবদ্ধ করা। উম্মতকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচানোর জন্য বিশুদ্ধ আকীদা, সহীহ হাদীস ও বিশুদ্ধ ফিকহের ইলমকে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা। আর যারা এ কাজের উপযুক্ত ছিলেন, সে সকল ব্যক্তিদের উপর কাজটি করা অবশ্যই ফরয (ফরযে কিফায়া) ছিল। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, জরুরত পরিমাণ ইলম শিক্ষা করা ফরযে আইন; কিন্তু ইলমের উপর পান্ডিত্য অর্জন করা, কিতাবাদি রচনা করে ইলমের সংরক্ষণ করা ইত্যাদি ফরযে কিফায়া। যারা এই কাজ আঞ্জাম দেয়ার মত যোগ্যতা রাখেন তাদের উপর তা ফরযে কিফায়া। আইম্মায়ে কেরাম যদি তখন ইলমের খেদমত (যা তখন তাদের উপর ফরযে কিফায়া ছিল, তা) বাদ দিয়ে জিহাদের (এটিও তখন তাদের উপর ফরযে কিফায়া ছিল, তার) মেহনত করতেন তাহলে উম্মত লাভবান হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হতো বেশি। এবং তাঁরা (যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ইলমের সংরক্ষণ না করার দায়ে) একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয তরকের গুনাহে দোষী হতেন। তাঁদের আজীবন সাধনার প্রেক্ষিতে কুরআন হাদীসের বিশুদ্ধ ইলম সংরক্ষিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্, যা বর্তমান পর্যন্ত বিদ্যমান আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে ইনশাআল্লাহ। যেহেতু বর্তমানেও ইলমের খেদমত করা ফরযে কিফায়া, অপরদিকে জিহাদ ফরযে আইন, তাই বর্তমানে আমরা যদি কেবল মসজিদ, মাদরাসা, মারকাজ আর খানকার খেদমত কিংবা অন্যান্য মেহনত নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকি, তাহলে আমাদের অবশ্যই ফরয তরক করার গুনাহ হবে। তাই, যে ভাই যেই মেহনতই করি না কেন, আমাদেরকে অবশ্যই পাশাপাশি জিহাদের ব্যাপারে চিন্তা ফিকির ও সক্রিয়ভাবে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মেহনতে অংশগ্রহণ করতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

৩. দ্বীনের মধ্যে যত প্রকারের মেহনত ও রক্ষাপ্রাচীর আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চারটি, যথা: ইলম, তাযকিয়া, দাওয়াত ও জিহাদ। এর কোনো একদিকে দূর্বলতা থাকলে বাতিল সেদিক দিয়েই উম্মতকে আক্রমণ করবে। অর্থাৎ একথা থেকে বুঝা যায়, বাতিল যদি কোনো একদিকে আক্রমণ করে, বুঝতে হবে ঐ দিকটি উম্মতের দূর্বল হয়ে গেছে। তখন সেদিকটিকে শক্তিশালী করা উম্মতের উপর ফরয। আইম্মায়ে কেরামের সময় যেহেতু বাতিলের আক্রমণ ইলমী ময়দানে বেশি ছিল (অন্যদিকে জিহাদের ক্ষেত্রে উম্মত তখন যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল), তাই তখন সেটিকে সুরক্ষিত করা জিহাদ করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আলহামদুলিল্লাহ তাঁরা সেটি যথাযথভাবে পালন করেছেন। কিন্তু বর্তমানে উম্মত জিহাদের ক্ষেত্রে অধিকতর দুর্বল হয়ে যাওয়ায় সবদিক থেকে বাতিলের আক্রমণ ও আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে, তাই বর্তমানে জিহাদ করা সক্ষম সকলের উপর ফরযে আইন। তাই বর্তমান সময়ে ইলমী খেদমত বা অন্যান্য মেহনতের পাশাপাশি (জিহাদের প্রয়োজনে সেগুলো বাদ দিয়ে হলেও) অবশ্যই জিহাদ করতে হবে, ইনশাআল্লাহ।

৪. যদিও আইম্মায়ে কেরামের সকলেই সরাসরি সশস্ত্র জিহাদ করেননি, কিন্তু তাঁরা কেউই কখনো বাতিলের সাথে আপোস করেননি। কোনো কুফরকে 'হেকমত' রূপে গ্রহণ করেননি। শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য করেননি। হীন স্বার্থসিদ্ধি কিংবা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের দরবারে গমন করেননি। নগন্য দুনিয়াবী স্বার্থের কারণে তাঁদের ঈমান বিক্রি করেননি। বরং শাসকদেরকে সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করেছেন (হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী যা সবচেয়ে বড় জিহাদ)। আর এ কাজ করতে গিয়ে, বাতিল/তাগুত/গোমরাহ/পথভ্রষ্ট শাসকবর্গের সামনে হক ও সত্য কথা বলার অপরাধে তাদের অনেককেই কারাবরণ করতে হয়েছে; নিষ্ঠুর-নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বর্তমান যামানায় আমাদের অনেকেই তাগুতের গোলামী করে ও আইম্মায়ে কেরামের উল্টোপথে চলেও দাবী করছি যে, আমরা আইম্মায়ে কেরামের অনুসারী।

৫. সেই যামানার আইম্মায়ে কেরাম যদি বর্তমান সময়ে জন্মগ্রহণ করতেন, অবশ্যই তাঁরা কেবল "ইমামুল ফিকহ" হতেন না, "ইমামুল জিহাদ"ও হতেন, হতেন "মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ"ও। কেননা তাঁরা আমলের গুরুত্ব বুঝতেন, আমলের প্রয়োজনীয়তা বুঝতেন, ফরযে আইন অবস্থায় জিহাদ পরিত্যাগের ক্ষতি ও শাস্তির কথা তাঁরা উপলব্ধি করতেন। উম্মতের মাঝে জিহাদকে পুনর্জীবিত করতে, উম্মাহর উপর উত্তোলিত বাতিলের তরবারিগুলো ভেঙে ফেলতে মেহনত করতেন, সেজন্য কলম ধরতেন, সেজন্য লড়াই করে নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতেন।

৬. আইম্মায়ে কেরাম সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী ছিলেন। কেননা সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগীতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জিহাদের দুইটি অবস্থাই ছিল। কখনো জিহাদ ফরযে আইন হতো তখন সকলকেই তাতে জুড়তে হতো, কেবল মুনাফিক ও অক্ষম ছাড়া আর কেউ তা থেকে পিছনে পড়তো না। আবার কখনো জিহাদ ফরযে কিফায়া হতো, তখন সবাই তাতে অংশগ্রহণ করতেন না।

আচ্ছা ভাই বলুনতো, ইসলামের প্রথম যুদ্ধ কী?.......... বদরের যুদ্ধ।

এটি আক্রমণাত্মক নাকি আত্মরক্ষামূলক?..........আক্রমণাত্মক বা ইকদামী (Offensive)। কেননা, আল্লাহর রাসূল ﷺ তৎকালীন মক্কার অন্যতম কাফের সরদার আবু সুফিয়ানের (তখনও তিনি মুসলমান হননি) বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করতে বের হলেন। এই বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য মক্কা থেকে বাহিনী আসলে বদর প্রান্তরে তারা মুসলমানদের মুখোমুখি হয়। যেহেতু এতে মুসলমানরা আক্রান্ত হয়নি, বরং মুসলমানরাই আগে বেড়ে আক্রমণ করতে গিয়েছে, তাই এটি ছিল আক্রমণাত্মক/ইকদামী (Offensive) জিহাদ।

এটি কি ফরযে আইন ছিলো, নাকি ফরযে কিফায়া?..........ফরযে কিফায়া। যেহেতু আক্রমণাত্মক তাই এটি ফরযে কিফায়া। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনার সকল সাহাবীদের সাথে করে নিয়ে বের হননি। মদীনায় তখন হাজারের উপর পুরুষ সাহাবী ছিলেন, এর মধ্য থেকে মাত্র ৩১৩ জন বা কিছু কম বা বেশি সংখ্যক সাহাবীকে নিয়ে 'আক্রমণাত্মক' এই অভিযানে বের হন। অর্থাৎ যুদ্ধটি ছিল ফরযে কিফায়া। এছাড়াও মূতা, মক্কা বিজয়, খাইবার অভিযান ইত্যাদি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ছিল। এবার আসুন বাকি যুদ্ধগুলো, যেমন: ওহুদ, খন্দক, তাবুক ইত্যাদি এগুলো ছিল প্রতিরক্ষামূলক/দেফায়ী (Defensive) যুদ্ধ। এই যুদ্ধগুলোতে মুসলমানদের উপর কুফ্ফাররা আগে বেড়ে আক্রমণ চালায়, যার ফলে 'নফীরে আম' এর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ফলে সকলের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক (ফরযে আইন) ছিল। অন্যদিকে, আমাদের আইম্মায়ে কেরামের যামানায় যেহেতু জিহাদ ফরযে কিফায়া ছিল, আর তাঁদের সকলের জিহাদ করার প্রয়োজনও ছিল না, বরং তাঁরা ইলমের হিফাযতের জন্য ফরয (ফরযে কিফায়া) খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছিলেন,

তাই তাঁরাও মূলত সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপরই ছিলেন, কেননা, ফরযে কিফায়া যুদ্ধগুলোতে সকল সাহাবী যোগ দিতেন না।

প্রিয় ভাই! ভালো করে বুঝে নেই, মুসলিম উম্মাহর জন্য বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপট হলো ওহুদ, খন্দক কিংবা ত্ববুকের যুদ্ধের ন্যায়, আর এই যুদ্ধগুলোতে সকল মুসলমানদের অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। খন্দকের জিহাদের কাজ করতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহর রাসূলের ﷺ চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়, এ থেকেই প্রতিরক্ষামূলক/দেফায়ী জিহাদের গুরুত্ব বুঝে আসে। কেবল মুনাফিক ও অক্ষম ছাড়া এই যুদ্ধগুলোতে সকল সাহাবায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর মুনাফেক সবর্প্রথম চিহ্নিতই হয় ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধ- ওহুদের যুদ্ধের সময়। তাই আমরা যারা ফরযে আইন জিহাদ ত্যাগ করে ঘরে বসে আছি, জিহাদের ব্যাপারে কোনো চিন্তা ফিকির করছি না, সক্রিয়ভাবে জিহাদী মেহনতে জুড়ছি না, আমাদের "মুনাফেকী"র ব্যাপারে খুব ভয় করা দরকার। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নেফাক থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

তাই আমরা যারা বলছি, "আইম্মায়ে কেরাম জিহাদ করেননি, তাই আমরাও জিহাদ করবো না।" তাদেরকে বলি-

* তাদের মাঝে কেউ কেউ যারা জিহাদ করেননি, তাঁরা দ্বীন বুঝেই জিহাদ করেননি, আর আমরা দ্বীন না বুঝার কারণে জিহাদ ত্যাগ করেছি।
* তাঁরা আল্লাহ তা'আলার কাছে জিহাদ তরককারীদের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন না, কিন্তু আমাদের ব্যাপারে ভয় আছে।
* তাঁরা 'ফরযে আইন তরককারী' ছিলেন না, কিন্তু জিহাদ না করার কারণে আমরা তা হয়ে যাচ্ছি।
* তাঁরা জিহাদের গুরুত্ব বুঝেছিলেন, 'জিহাদ ফরযে আইন' না হওয়াতে তাঁরা অনেকে হয়তো তখন সশস্ত্র জিহাদ করেননি। অন্যদিকে, আমরা হয়তো জিহাদের গুরুত্ব বুঝছি না, এজন্য 'জিহাদ ফরযে আইন' হওয়া সত্ত্বেও জিহাদ করছি না; নতুবা, আমরা হয়তো জিহাদের গুরুত্ব বুঝেছি, কিন্তু 'ওয়াহানে' আক্রান্ত হওয়াতে জিহাদ করছি না।
* আইম্মায়ে কেরামের যামানায় মুসলিম জাহানে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল, কিন্তু ইলমী জগতে ছিল নানামুখী ফিতনা- এই কারণে জিহাদের উপর ইলমী খেদমতকে বেশি গুরুত্ব দেয়া ছিল তখন সময়ের দাবী। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমানে জিহাদ করা ফরযে আইন আর ইলমী খিদমত করা ফরযে কিফায়া। তাই আমরা একই কাজ করে অর্থাৎ জিহাদের উপর ইলমের মেহনতকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে 'সময়ের ও অবস্থার নাজুকতার বিচারে' আইম্মায়ে কেরামের উল্টো পথে হাঁটছি। কেননা বর্তমানে আইম্মায়ে কেরাম উপস্থিত থাকলে অবশ্যই তারা জিহাদী মেহনত করতেন।
* তাঁরা জিহাদ না করার কারণে তাঁদের ব্যাপারে মুনাফেকীর ভয় ছিল না, তাঁদের যামানায় সেই পরীক্ষা আসেনি (অর্থাৎ তাঁদের উপর জিহাদ ফরযে আইন ছিল না); কিন্তু বর্তমানে সমস্ত উম্মতের উপর সেই পরীক্ষা চলছে, যা এসেছিল সাহাবাদের জামাতের উপর।

সুতরাং ভাই, সাবধান!..............

• আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করি না; তার কারণ...

দ্বিতীয় কারণ:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন,

وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

“নিশ্চয় ইবাদতকারীর উপর আলিমের মর্যাদা তারকারাজির উপর চাঁদের মর্যাদার সমতুল্য। আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিস্। আর নবীগণ দীনার ও দিরহাম (টাকা-পয়সা) ওয়ারিসী স্বত্ব হিসেবে রেখে যাননি, বরং তারা ওয়ারিসী স্বত্বরূপে রেখে গেছেন ইলম (জ্ঞান)। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করলো সে যেন একটি পূর্ণ অংশ লাভ করলো।” (সুনানে ইবনে মাজাহ-২২৩)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো ইরশাদ করেন:

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنٰى رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِيْ

“একজন আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব এবাদতকারীর উপর এমনি, যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব সাহাবীদের উপর।”

(সহীহ, জামে’ আত্ তিরমিজি-২৬৮৫, মিশকাতুল মাসাবিহ-২১৩)

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এলেমকে কিভাবে নবুয়তের স্তরে রেখেছেন এবং এলেমহীন স্তরের মর্তবা কেমন করে ছোট করে দিয়েছেন। এই ইলম ছাড়া এবাদত হবে না। (এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, খণ্ড ১, পৃ. ১৮)

আল্লামা ইমাম ইবনুল বার (رحمة الله) তার প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ جامع بيان العلوم و فضله- গ্রন্থের ১/৩১ পৃষ্ঠায় হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে শহীদের উপরে আলেমের মর্যাদা প্রসঙ্গে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। যেমন-

للانبياء على العلماء فضل درجتين و للعلماء على الشهداء فضل درجة

“নবীদের আলেমদের উপর দুই স্তর বেশি মর্যাদা রয়েছে । আর আলেমদের শহীদদের উপর একস্তর মর্যাদা রয়েছে ।”

হযরত ইমাম গায্যালী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “এ হাদীস দ্বারা ইলমের এমন মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় যে, ইলমের স্থান নবুওয়তের পরে এবং শাহাদাতের পূর্বে। অথচ শাহাদাতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত আছে।” (এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, খণ্ড ১, পৃ. ১৮)

যে ফজিলত গুলো বিভিন্ন আয়াত/(নির্ভরযোগ্য) হাদীসে বলা হয়েছে, সে অনুযায়ী বুঝে আসে, “কিয়ামতের দিন নবীদের পর আলেমদের মর্যাদা হবে আর আলেমদের পর হবে শহীদ বা মুজাহিদদের মর্যাদা।” এককথায়, উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান উলামায়ে কেরাম, এমনকি মুজাহিদ এবং শহীদদের থেকেও।

হাদীসগুলোর ভাবার্থ:

যাইহোক, ইলম ও আলেমের মর্যাদা সম্পর্কিত হাদীসগুলো থেকে আমরা অনেকেই এই ভাবার্থ গ্রহণ করে থাকি- “আমরা আলেমগণ তো উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সকল আবেদের উপর আমাদের মর্যাদা। যেহেতু জিহাদ করা একটা আমল। তাই ইলম চর্চা সর্বাবস্থায় জিহাদ অপেক্ষা মর্যাদাবান। একজন মুজাহিদ (কেবল জিহাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন

তিনি) হচ্ছেন আবেদ। আর একজন আলেম (যিনি এলেম চর্চা ও এলেমের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন তিনি এরকম) হাজারটা আবেদ অপেক্ষা উত্তম। তাই, আমরা সর্বাবস্থায় মুজাহিদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর যেহেতু আমরা অধিক উত্তম কাজে নিয়োজিত আছি, আমাদের (আলেমদের) জিহাদ করার দরকার কী? আমাদের স্থানতো মুজাহিদদের উপরেই আছে? আমরা কেন নিচে নামব? আমরা তো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতই করছি? দ্বীনের অধিক গুরুত্বপূর্ণ খিদমতই করছি? তাই না?"

যুক্তিখণ্ডণ:

মুহতারাম ভাই!

এখন আমি আপনাদেরকে কিছু প্রশ্ন করছি, কোন্ আলেমের স্থান নবীদের পরে, কিন্তু শহীদের আগে?

নবীদের পরেই কি সেই আলেমের স্থান হবে, যিনি সমাজে আলেম হিসেবে স্বীকৃত, অথচ নামায পড়েন না?

নবীদের পরেই কি সেই আলেমের স্থান হবে, যে আলেম রোযা রাখেন না?

নবীদের পরেই কি সেই আলেমের স্থান হবে, যে আলেম যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় করেন না?

নবীদের পরেই কি সেই আলেমের স্থান হবে, যে আলেমের উপর হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করেন না?

প্রশ্ন হচ্ছে, যেসব আলেম 'ফরযে আইন' উক্ত কাজগুলো করেন না, তাদের স্থান কি নবীদের পরে, আর শহীদের আগে হবে?...........

হবে না! কারণ, তিনি যত বড় আলেমই হোন না কেন, শরীয়ত তাকে 'একজন ফরয তরককারী' হিসেবে আখ্যায়িত করবে।

আর কোনো ফরয তরককারীর স্থান নবীদের পরে হবে, আর শহীদের আগে হবে, এটি কিভাবে সম্ভব?

তাই যদি হয়, তাহলে নবীদের পরেই কি সেই আলেমের স্থান হবে, যে আলেম তার উপর আপতিত অন্য কোনো 'ফরযে আইন' হুকুমকে আদায় করেন না?

তাহলে ভাই, একটু চিন্তা করুন, বর্তমান যামানায় জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে গেছে, তখন আমরা যে সব আলেম জিহাদ করছি না, জিহাদের বিষয়ে কথা বলছি না, জিহাদের জন্য কলম ধরছি না, জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি না, জিহাদের জন্য উম্মতকে জাগ্রত করছি না, জিহাদের জন্য ময়দানে আসছি না, তাদেরকে কেন 'ফরয তরককারী' বলা হবে না? আর জিহাদ না করার কারণে আমরা যদি 'ফরয তরককারী' হই, তাহলে এমন একজন 'ফরযে আইন তরককারীর' স্থান কেন নবীদের পরে আর শহীদের আগে হবে?

প্রিয় ভাই!

আমরা কত বড় আলেম যে, আমাদের জিহাদ করা লাগে না?

আমরা কি হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

আমরা কি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

আমরা কি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

আমরা কি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

আমরা কি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

আমরা কি হযরত আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?

আমরা কি হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?
আমরা কি হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?
আমরা কি হযরত আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?
আমরা কি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?
আমরা কি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?
আমরা কি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?
আমরা কি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়েও বড় আলেম?
....
আমরা এমনি ভাবে কোন্ সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে বড় আলেম? (নাউযুবিল্লাহ)
প্রিয় ভাই! উনারা কি উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন না?
উনাদের সীরাত কি আপনি পড়ে দেখেননি?
উনাদের যিন্দেগীতে কি জিহাদ নেই?
উনারা কেন জিহাদ করেছেন? আর আমরা কেন জিহাদ করছি না?

"ফরযে আইন" অবস্থায় আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাহাবাদের জামাতে থাকা সত্ত্বেও জিহাদ না করলে যদি 'আলেম' না হওয়া যায়, বরং মুনাফেকদের তালিকায় নাম চলে যায়, তাহলে বর্তমান যামানায় আমরা জিহাদ না করে, জিহাদের পক্ষে না থেকে, উল্টো পৃথিবীতে যেন জিহাদ না থাকে সেজন্যে জিহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কেউ কেউ ফতোয়াবাজি করে কেন আমরা "মুনাফিক" হব না? জিহাদ না করেও কিভাবে আমরা আল্লাহ পাকের কাছে 'আলেম' সাব্যস্ত হব?

হায়! শুধু কুরআন-হাদীসের জ্ঞান থাকলেই যদি আলেম হয়ে যায়, তাহলে তো ইবলিস সবচেয়ে বড় আলেম!
হযরত ইমাম গায্যালী রাহি. তাঁর 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' কিতাবে লিখেন, এক হাদীস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে,

خصلتانِ لا تجتمعانِ في منافقٍ حُسنُ سمتٍ ولا فقْهٌ في الدِّينِ

"মুনাফিকদের মধ্যে দুটি অভ্যাস পাওয়া যায় না। (১) চমৎকার পথ প্রদর্শন (হিদায়াত), (২) দ্বীনের ইলম (ফিকহ)।" (সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং-২৬৮৪; এহইয়াউ উলূমিদ্দীন: খণ্ড ১, পৃ. ১৬)

তিনি আরো লিখেন, "মনে রাখতে হবে, সমসাময়িক ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী (কিছু শব্দ ও বাক্যের অধিকারী) আলেমদের কপটতা (মুনাফেকী) দেখে এ হাদীস সম্পর্কে সন্দেহ করা ঠিক হবে না। কেননা 'ফেকাহ' শব্দ বলে আল্লাহর রাসূল ﷺ সে জ্ঞান বুঝাননি, যা আপনারা ধারণা পোষণ করে থাকেন। প্রকৃত ফেকাহবিদ তিনিই যিনি আখিরাতকে দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম বলে মানে (এবং তাঁর যিন্দেগীতে তা প্রকাশ পায়)।" (এহইয়াউ উলূমিদ্দীন: খণ্ড ১, পৃ. ১৭)

সুতরাং ভাই, কেবল বাহ্যিক লেবাস-পোশাক আর ডিগ্রি দেখে যেন আমরা ধোঁকা না খাই!
আমাদের মাঝে যদি আখিরাতের ভয় থাকে, তাহলে কী করে আমরা 'ফরয তরককারী হওয়া'র ভয় করি না?
আমাদের মাঝে যদি আখিরাতের ভয় থাকে, তাহলে কী করে আমরা নিফাক্-এর ভয় করি না?
আমাদের মাঝে যদি আখিরাতের ভয় থাকে, তাহলে কী করে আমরা (উম্মাহর বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে নামায-রোযার মত একটি ফরয হুকুম) জিহাদ না করে ঘরে বসে থাকতে পারি?

জিহাদ ফরযে আইন হওয়া সত্ত্বেও আমরা কী করে কেবল মসজিদ মাদরাসা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে পারি?
প্রিয় ভাই! একটু ভেবে দেখি- একটি দেশে ইলমী খিদমতের জন্য কি লক্ষ লক্ষ মুফতী, মুহাক্কীক আলেমের দরকার আছে?
সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কি সকলেই ফতোয়া দিতেন? একটি দেশের ফতোয়ার খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য কয়জন মুফতী দরকার? নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ মুফতী সাহেবের দরকার নেই!

'জিহাদ ফরযে আইন' অবস্থায় সকলকেই প্রথমে 'এলায়ে কালিমাতুল্লাহর মেহনত' জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহয় আত্মনিয়োগ করতে হবে। অতঃপর 'আমীরে জিহাদ' প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু সংখ্যক মুহাক্কীক আলেম ও মুফতী সাহেবকে ইলমী খেদমতে নিয়োজিত করতে পারেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হাফেয, মুহাক্কীক আলেম ও মুফতী সাহাবীর সংখ্যা ছিল সীমিত, অথচ তারা সকলেই সাধারণভাবে মুজাহিদ ছিলেন। সুবহানাল্লাহ!

আসলে, সাহাবায়ে কেরামের যামানায় জিহাদকে একজন মুসলমানের যিন্দেগী থেকে আলাদা করার কথা কেউ কখনো ভাবতেও পারতেন না, যেমনভাবে নামায-রোযাকে আলাদা করার কথা ভাবা যায় না। একজন মুসলমান জিহাদ করবে না, এটা তাঁরা ভাবতেও পারতেন না। নিচের হাদীসটি লক্ষ্য করুন-

عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم عن أبيه :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :لا يزال الجهاد حلوا أخضر ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم :ليس هذا زمن جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان، فنعم زمان الجهاد، قالوا يا رسول الله أو أحد يقول ذلك؟ قال نعم ...من عليه لعنة الله والملاءكته والناس أجمعين

নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন, "যতদিন পর্যন্ত আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, ততদিন পর্যন্ত জিহাদ সতেজ ও সুমিষ্ট থাকবে। আর অদূর ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসবে, যে যুগের কিছু আলেম বলবে, এটি জিহাদের যুগ নয়। অতএব, যে ব্যক্তি সে যুগটি পাবে, তার জন্য সেটি হবে জিহাদের শ্রেষ্ঠ যুগ।" সাহাবায়ে কেরাম অবাক হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একজন মুসলমান কি এমন কথা বলতে পারে? নবীজী ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, এমন মুসলমানরা বলবে, যারা আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপে অভিশপ্ত।" (আস্সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খ. ৩, পৃ. ৭৫১)

প্রিয় ভাই! তাহলে কেন আমরা জিহাদকে আমাদের যিন্দেগী থেকে আলাদা করে দিয়েছি?? এখনো কেন আমরা 'মুজাহিদ' হওয়ার স্বপ্ন দেখি না? এখনো আমরা কেন বসে আছি? জিহাদের ব্যাপারে কেন আমরা এত উদাসীন? আমরা উম্মতকে কেন সতর্ক করছি না? উম্মতকে কেন জিহাদের জন্য প্রস্তুত করছি না? তাদেরকে কেন জিহাদের জন্য 'তাহরীদ' (উদ্বুদ্ধ) করছি না? অথচ জিহাদ করা বর্তমানে ফরযে আইন।

আল্লাহ্ তা'আলা কি তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ-কে এই নির্দেশ দেননি?-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ

"হে নবী! আপনি মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।"

(সূরা আনফাল ০৮:৬৫)

প্রিয় ভাই! এখন তো আর নবী নেই, নবুওয়তও নেই। উম্মতকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব এখন কার?? এই দায়িত্ব কি আল্লাহর রাসূলের ﷺ ওয়ারিশদের উপর একটুও বর্তায়নি?? আমরা কি কেবল কতিপয় শব্দ আর বাক্যের ওয়ারিশ-ই গ্রহণ করবো, নবুওয়তের ফেলে রাখা আর কোনো দায়িত্ব কি আমরা গ্রহণ করবো না???

হায়! ‘তাহরীদ্ ‘আলাল ক্বিতাল’-এর কাজ উলামায়ে কেরাম ছাড়া আর কে ভালোভাবে করতে পারবে? কেন আমরা এগিয়ে আসছি না? আল্লাহ তা‘আলার কাছে আমরা কী হিসাব দিবো, কী জবাব দিবো, একটু চিন্তা করেছি কী?

প্রিয় ভাই! একটি বিষয় আমাদেরকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে, ইনশাআল্লাহ। সেটি হল- ‘যে সকল হাদীসে একজন সাধারণ উম্মতের উপর একজন আলেমের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য অবশ্যই সে সকল উলামায়ে কেরাম হবেন, যারা এলেমের দাবী অনুযায়ী আল্লাহ্ পাকের অন্যান্য হুকুমের সাথে সাথে ফরযে আইন ‘জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্’র হুকুমও আদায় করেন। নচেৎ, ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর রাস্তার একজন মুজাহিদের মর্যাদা (তিনি আলেম হোন কিংবা গাইরে আলেম) সর্বাবস্থায়ই ‘ঘরে বসে থাকা’ (ক্বয়ীদুন) একজন আলেমের উপর হবে, যেমনটি নিম্নের আয়াতে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে-

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا- دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“৯৫. গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান (যারা লড়াই করার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং জিহাদ ত্যাগ করার)- যাদের কোনো সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ সব মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ্ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। ৯৬. এগুলো আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।”

(৪ সূরা নিসা :৯৫-৯৬)

আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

• আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করি না; তার কারণ...

তৃতীয় কারণ:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

يُوزَنُ يومَ القيامةِ مدادُ العلماءِ بدمِ الشهداءِ

“কিয়ামতের দিন আলেমদের লেখার কালি শহীদের রক্তের সাথে ওজন করা হবে।”

(এহইয়াউ উলূমিদ্দীন: খণ্ড ১, পৃ. ১৭)

ইবনে আব্দিল বার (رحمة الله) হযরত আবু দারদা (رضي الله عنه) থেকে যঈফ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।”

(তাখরিজু আহাদিসুল ইহ্ইয়াউল উলূম, হাদিস নং ৪)

আরেকটি হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وُزِنَ حِبْرُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ فَرَجَحَ عَلَيْهِمْ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ ফরমান, “কিয়ামতের দিন আলিমের কলমের কালি ও শহিদের রক্ত ওজন করা হবে, তখন আলিমের কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়ে ভারী হয়ে যাবে।”

(ইমাম ইবনে জাওযী, আল-ইললুল মুতনাহিয়্যাহ, ১/৭১ পৃ. হাদিস, ৮৩, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১০/১৭৩ পৃ. হাদিস, ২৮৯০৩, তিনি ইবনে নাজ্জারের সূত্রে। সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস: ১৮/১৬৯ পৃ. হা/১৯১৩৬; হাদীসের মান- দুর্বল, কেউ কেউ মাউযু বলেছেন।)

হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে এই জাতীয় আরো বেশ কয়েকটি হাদীস পাওয়া যায়।

প্রিয় ভাই! একজন আলেমের কলমের কালি আর একজন শহীদের রক্তের তুলনামূলক হাদীসগুলো থেকে আমরা কেউ কেউ এমন কিছু ভাবার্থ গ্রহণ করি, যা আমাদেরকে জিহাদ বিমুখ করে কেবল ইলমী খেদমতেই লাগিয়ে রাখে; আমরা তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকি। আপনি কি জানেন, হাদীসগুলো থেকে আমরা কী ভাবার্থ গ্রহণ করি?? ভাবার্থ: “হাশরের ময়দানে একজন আলেমের কলমের কালি আর শহীদের রক্ত ওজন করা হলে যেহেতু একজন আলেমের কলমের কালির ওজনই ভারী হবে, তাই আমরা (আলেমরা) বুকের রক্ত ঝরানোর চেয়ে কেবল কলমের কালি দিয়ে জিহাদ করাকেই বেশি ভালোবাসি। আমাদের আমল মীযানের পাল্লায় এমনিতেই বেশি ভারী হবে; তাই বেশি লাভজনক কাজ ছেড়ে আমরা কম লাভজনক কাজে নিয়োজিত কেন হব?”

যুক্তি খণ্ডন:

প্রিয় ভাই! এ সম্পর্কে কিছু কথা!

* মুহাক্কীক মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে, এই জাতীয় যতগুলো হাদীস পাওয়া যায়, সেগুলো যইফ (দুর্বল) কিংবা জাল (তথা বানোয়াট)। যেমন:

وبالجملة فالحديث ضعيف من جميع طرقه

“সমষ্ঠিগতভাবে এই হাদিসের সকল সূত্রই যঈফ।”

(সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বঈফাহ, হাদিস নং ৪৮৩২ এর ব্যাখ্যায়)

প্রিয় ভাই! 'আলেমের কালির ফযিলত' সম্পর্কে আলাদা কোন সহীহ হাদিসই পাওয়া যায় না, যার ভিত্তিতে আমরা আলেমের কালিকে শহীদের রক্তের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে পারি, দামি হবে তো দূরের কথা! অপরদিকে শহীদের রক্ত সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদিস আছে, যার ভিত্তিতে আমরা প্রমাণ করতে পারি- শহীদের রক্তের মূল্য আল্লাহ্ পাকের কাছে অবশ্যই আলেমের কলমের কালি অপেক্ষা বেশি। যেমন: কিয়ামতের দিন শহীদের রক্ত হতে মেশকের ঘ্রাণ বের হওয়া, শহীদের প্রথম ফোঁটা রক্ত পড়ার সাথে সাথে ক্ষমা করে দেওয়া ইত্যাদি। (উক্ত হাদীসগুলো আমরা পূর্ববর্তী পর্বে আলোচনা করেছি।) আলেমের কলমের কালির ব্যাপারে সহীহ হাদীস সমূহে এই ধরণের কোনো ওয়াদা নেই। সুতরাং যেই বিষয়ে (আলেমের কলমের কালি সম্পর্কে) সহীহ হাদীসসমূহে কোনো আলোচনাই নেই, কিছু দুর্বল আর জাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়টিকে কুরআনের বহু আয়াত আর অসংখ্য সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাশীল আরেকটি বিষয় (শহীদের রক্তের মর্যাদা)-কে আমরা কিভাবে ছোট ও খাটো করে দেখতে পারি? তাহলে, কিভাবে আমরা শহীদের রক্তের চেয়ে আলেমের কালিকে সর্বাবস্থায় ভারী বলতে পারি??? প্রকৃতপক্ষে, যইফ আর জাল হাদীসের ভিত্তিতে আলেমের কলমের কালিকে 'সর্বাবস্থায়' শহীদের রক্তের চেয়ে বেশি দামী বা ওজনদার মনে করা- এক প্রকারের 'চিন্তাগত বিভ্রান্তি'।

* প্রিয় ভাই! কার মর্যাদা বেশি হবে, এই বিষয়টি আপেক্ষিক। ইবাদতের মান অনুযায়ী পার্থক্য হয়। ইমাম মানাবি, ইবনুল কায়্যিম রহঃ এর এমন আলোচনা আছে । কখনো শহীদের মর্যাদা বেশি হবে, আবার কখনো আলেমের ফজিলতও বেশি হতে পারে তার আমলের মান অনুযায়ী। শহীদ হওয়া ছাড়া সিদ্দিকও শহীদ থেকে উপরের স্তরের হন। যেমনঃ আবু বকর রা.। তবে বর্তমানে ফরজে আইন জিহাদ থেকে দূরে থেকে একজন আলেমের পক্ষে একজন শহীদ কিংবা একজন মুজাহিদের চেয়ে বেশি ফজিলত লাভ করা, অথবা একজন সিদ্দিকের মর্তবা লাভ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

* প্রিয় ভাই আমার! উপর্যুক্ত হাদীসগুলো যদি অকাট্যভাবে সহীহও হতো, তবুও এই কারণে জিহাদ ত্যাগ করা আল্লাহর রাসূল ﷺ কিংবা সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ ফরমান,

والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل

"সে সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জান! অবশ্যই আমি আশা করি: আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাব এবং এতে শহীদ হয়ে যাব, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হবো, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হয়ে যাবো।" (বুখারী-৩১২৩ এবং মুসলিম-১৮৭৬)

যদি মীযানের পাল্লায় শহীদের রক্ত কলমের কালি অপেক্ষা হালকা হওয়ার কারণে জিহাদকে ইলমী খিদমত অপেক্ষা ছোট মনে করা হতো বা জিহাদে যাওয়াকে অপছন্দ করা হতো, তাহলে আল্লাহর রাসূল ﷺ এভাবে বারবার শহীদ হওয়ার তামান্না লালন করতেন না, জিহাদের তুলি দিয়ে আপন সীরাতকে রাঙাতেন না; বরং কলমের জিহাদ করে কেবল ঘরেই বসে থাকতেন। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, কলমের কালি অপেক্ষা শহীদের রক্তের দাম অনেক বেশি। আর এই কথার বাস্তব প্রমাণ হল, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর পবিত্র যিন্দেগীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্বমোট ৬৩ টি যুদ্ধাভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, যেগুলোর মধ্যে তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে ২৭ টিতে উপস্থিত হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কোনো কোনো যুদ্ধে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন, দন্ত মোবারক শহীদও করেছেন।

* প্রিয় ভাই! শরীয়ত যেই আমলকে যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে, মীযানের পাল্লায় সেই আমলের ওজন ততটুকু হবে। যে আমলের গুরুত্ব বেশি তার ওজনও বেশি, যার গুরুত্ব তুলনামূলক কম, তার ওজনও তুলনামূলক কম হবে। যেমন: ফযরের দুই রাকাত ফরয নামাযের ওজন সর্বাবস্থায়ই (ফরযে কিফায়া) জানাযার নামাযের তুলনায় বেশি হবে।

এমনিভাবে, আলেম হওয়া বা ইলমের খিদমত করা ফরযে কিফায়া। কিন্তু জিহাদ যদিও সাধারণভাবে ফরযে কিফায়া, কিন্তু বর্তমানে সক্ষম প্রতিটি মুসলমানের উপর অবশ্যই জিহাদ করা ফরযে আইন। অর্থাৎ বর্তমানে শরীয়তের চাহিদা অনুযায়ী ইলমী ময়দানে খেদমতের তুলনায় জিহাদ করাটা বেশি জরূরী। তাই অবশ্যই, নিঃসন্দেহে বর্তমানে একজন আলেমের কলমের কালি অপেক্ষা একজন সাধারণ শহীদের রক্তের ওজন মীযানের পাল্লায় ভারী হবে, ইনশাআল্লাহ্। আবার, বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন মুজাহিদ আলেমের মর্যাদা একজন সাধারণ আলেম কিংবা একজন সাধারণ মুজাহিদ অপেক্ষা অবশ্যই বেশি হবে, ইনশাআল্লাহ।

* প্রিয় ভাই! আরো লক্ষ্য করি, জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় জিহাদ না করলে আমরা 'ফরয তরককারী' সাব্যস্ত হব। সুতরাং একজন ফরয তরককারীর কলমের কালির কী মূল্য হতে পারে আল্লাহ্ পাকের কাছে? শহীদের রক্তের সাথে এমন একজন ব্যক্তির কলমের কালির তুলনা চলে কি, যে তার উপর আপতিত একটি ফরযে আইন হুকুম তরক করে চলেছে, যার কোনো তোয়াক্কাই সে করে না; এ নিয়ে যার কোনো মাথা ব্যাথাই নেই??? উপরন্তু কখনো কখনো সে এই ফরযে আইন হুকুমের বিরোধিতাও করে থাকে?? অন্যদিকে, একজন শহীদ?........যে নিজের স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্যারিয়ার, সুরম্য অট্টালিকা, এককথায়, তার দুনিয়ার সকল কিছু এবং সবশেষে তার নিকট অবশিষ্ট, দুনিয়ার সর্বাধিক প্রিয় বস্তু- তার আপন জীবনটুকুও আল্লাহর ফরয বিধান পালনার্থে কুরবানী হিসেবে পেশ করল! এই দুই জনের মধ্যে কী করে তুলনা করা চলে ভাই???.............

* বিশেষ দ্রষ্টব্য: কখনো এমন হতে পারে যে, শহীদের মর্তবার চেয়ে স্বাভাবিক আমল কারীর মর্যাদাও বেশি হতে পারে। যেমন: এক হাদিসে আছে, এক বছর পর মৃত্যুবরণ করে এক সাহাবী শহীদের উপরের মর্তবা লাভ করেন। এর কারণ হয়ত এই যে, তখন জিহাদ ফরজে কিফায়া ছিল। তাছাড়া, উভয় সাহাবীই জিহাদের ময়দানে ছিলেন, আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করেছেন, শাহাদাতের আশা উভয়েরই ছিল, বাকি! স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী সাহাবী এক বছর বাড়তি আমলের সুযোগ পেয়েছেন, যা উনার মর্তবা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটি এমন ছিল না যে, এক বছর পর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণকারী সাহাবী জিহাদ না করে কেবল ঘরে বসে ইবাদত-বন্দেগী করেই শহীদের উপর মর্তবা অর্জন করেছিলেন। তাহলে ভাই! বর্তমানে ফরজে আইন জিহাদ পরিত্যাগকারী কারও ব্যাপারে এটা কী করে ধারণা করা যায় যে, তিনি ফরযে আইন জিহাদ না করে কেবল কিছু নফলের পাবন্দী করেই একজন শহীদের উপর মর্তবা লাভ করবেন, তা তিনি যে-ই হোন না কেন?? এটি কি ভাই যৌক্তিক কোনো কথা হলো?...........

* আল্লাহর রাসূলের ﷺ যামানায়, যখন নাযিলকৃত শরীয়তের হুকুম আহকাম পালন এবং সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য ইলমী মেহনত এবং জিহাদ উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ফলে সাহাবায়ে কেরাম দুটোকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তথাপি যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যেত (যেমন- ওহুদের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ ইত্যাদি), তাঁরা সুফ্ফার (ইলমী) স্বাভাবিক মেহনত ও খেদমত বাদ দিয়ে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সাথে জিহাদে শরীক হয়ে যেতেন। অবশ্য জিহাদের ময়দানেও ইলমী মেহনত জারি থাকত, যে বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি। সুতরাং আমাদেরকেও জিহাদী মেহনত

এবং ইলমী মেহনত/খেদমত উভয়টিই সমানতালে চালিয়ে যেতে হবে, ইনশাআল্লাহ। আর বর্তমানে যেহেতু জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে, তাই জিহাদকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে ইনশাআল্লাহ।

* প্রিয় ভাই! বর্তমানে যদি জিহাদের মেহনত না করা হয়, তাহলে আমরা ফরয তরককারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব এবং মর্তবার দিক থেকে মুজাহিদ ভাইদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ব। (জিহাদ ফরযে আইন হওয়া সত্ত্বেও) জিহাদ না করে যদি আমরা ঘরে বসে থাকি, তাহলে কুরআনের ভাষায় আমরা 'ক্বয়ীদূন' (গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান)! আর এ ধরণের ব্যক্তিরা কখনোই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের সমকক্ষ হবে না। যে আয়াতটি আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি, আবারো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি-

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا– دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"৯৫. গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান (যারা লড়াই করার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং জিহাদ ত্যাগ করার)- যাদের কোনো সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ সব মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ্ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। ৯৬. এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

(৪ সূরা নিসা :৯৫-৯৬)

* সুতরাং প্রিয় ভাই, আল্লাহ্ পাকের কাছে সেই সকল ভাইদের মর্তবার কথা চিন্তা করি, যারা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একই সাথে আলেম এবং মুজাহিদ হিসেবে বিবেচিত। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ্ পাক ভাইদের মর্যাদা আরো অনেক বাড়িয়ে দিন এবং তিনি তাঁর আপন শান ও খুশি অনুযায়ী ভাইদেরকে প্রতিদান দান করুন। আমীন।

• আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করি না; তার কারণ....

চতুর্থ কারণ:

অন্য আরেকজন জিহাদ না করার আরেকটি সুন্দর(?) কারণ বয়ান করলেন, যা আপাতদৃষ্টিতে ‘অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত’ বলেই মনে হয়। তার কথাগুলোর ভাবার্থ ছিল মোটামুটি এরকম-

“সবাই তো আর সকল খেদমত একসাথে করতে পারবে না। একেকজনকে একেকটা খেদমত করতে হবে। দ্বীনের মাঝে অনেক কাজ বা আমল আর মেহনত বিদ্যমান। সকল খেদমত মিলে একটা পরিপূর্ণ দ্বীন। যেমনভাবে একটা বাড়ি তৈরি করতে হলে বিভিন্ন রকম লোকের প্রয়োজন পড়ে। রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রি, ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি, স্যানিটারি মিস্ত্রি ইত্যাদি। সকলের কাজ মিলে একটা বিল্ডিং তৈরি হয়। একইভাবে, দ্বীনের কাজগুলোও এমন। সবাই তো আর সব করবে না। কেউ ইলমী খেদমত করবে, কেউ খানকার, কেউবা দাওয়াত আর কেউবা জিহাদ করবে। সবার খেদমত মিলেই ইসলাম পরিপূর্ণ হবে।”

প্রিয় ভাই! উপর্যুক্ত এই উক্তিটির দ্বারা এই ভাবার্থ বুঝে আসে যে- অন্য ভাইয়েরা জিহাদ করতে থাকুন আর আমাকে আপাততঃ জিহাদ না করলেও চলবে। আল্লাহ্ পাক যেহেতু আমাকে ইলমী যোগ্যতা দিয়েছেন, তাই ইলমী ময়দানে বিচরণ করেই যিন্দেগী পার করে দিব। এটাই সর্বোত্তম। ইত্যাদি..........।

যুক্তিখণ্ডন:

* প্রিয় ভাই! প্রথম কথা হলো- এটি হল “খণ্ডিত ইসলামের দর্শন”। নফীরে আম বা জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় এই ধরণের শ্রেণি-বিভাজন করা কিংবা অন্য কোনো মেহনতের অজুহাতে জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকা বৈধ নয়; সকলকেই যার যার অবস্থান থেকে ‘জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ’র কাজে শরীক হতে হবে। যে যেখানেই থাকুক, দ্বীনী যে কোন খেদমতই করুক না কেন, যে পেশাতেই থাকুক না কেন, সকলকেই জিহাদ করতে হবে, জিহাদে অংশগ্রহণ করার পর আমীর যাকে যে কাজে কিংবা দ্বীনী খেদমতে নিয়োজিত করবেন তখন তিনি সে কাজ করবেন; যেমনটি আমরা তাবুক, খন্দক, উহুদ ইত্যাদি জিহাদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই।

* দ্বিতীয়তঃ ঐ ভাইয়ের উদাহরণটি আরেকটু বিশ্লেষণ করা যাক! তাহলেই বিষয়টি পরিষ্কার বুঝে আসবে, ইনশাআল্লাহ্। একটি প্রাসাদ তৈরি করতে অনেক ধরণের মিস্ত্রির প্রয়োজন- কথা ঠিক আছে। কিন্তু মনে করুন, সকল মিস্ত্রিরা দালানে কর্মরত অবস্থায় শর্টসার্কিট হয়ে দালানের কোনো এক অংশে হঠাৎ আগুন লেগে গেল, তখন অবস্থা কী দাঁড়াবে? তখন কি প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, নাকি যার যা কাজ তা ফেলে আগে সকলে মিলে আগুন নিভানোর চেষ্টায় লিপ্ত হবে? যদি সবাই মিলে আগুন না নিভানোর চেষ্টা করে কিংবা মনে করে- এটা তো কেবল ফায়ার সার্ভিসের কাজ আর এমতাবস্থায় প্রত্যেকে যার যার কাজ করতেই থাকে (যেমন রাজ মিস্ত্রি রাজের কাজ, রঙ মিস্ত্রি রঙের কাজ, স্যানিটারী মিস্ত্রি স্যানিটারীর কাজ, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ইলেকট্রিকের কাজ.......ইত্যাদি) তাহলে সকলের পরিণতি কী হবে তা কি ভাবা যায়? সকলেই জ্বলে-পুড়ে কি ভস্ম হয়ে যাবে না?? ঠিক এমনিভাবে ইসলাম বা উম্মাহ্ একটি দালানের মত-এই কথাটিও ঠিক আছে। আমরা যার যার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকব। আর যখন মুসলমানদের উপর কুফ্ফারদের আগ্রাসন চলে আসে তখন সেটা দালানে আগুন লেগে যাওয়ার মত। তখন সকলকে সেই আগুন নিভানোর চেষ্টায় লিপ্ত হতে হবে। নতুবা এর করুণ পরিণতি সকলকেই উপভোগ করতে হবে। আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।

• আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করি না; তার কারণ....

পঞ্চম কারণ:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন-

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

"আলেমগণ হলেন নবীদের উত্তরসূরি। নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম (টাকা-পয়সা) মীরাসরূপে রেখে যান না; তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যান শুধু ইলম। সুতরাং যে ইলম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।"

(সহীহ, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৬৪১; ইবনু মাজাহ- ২২৩; দারেমী-৩৪২; রিয়াদুস্ সালেহীন-১৩৯৬)

ভাবার্থ: এই হাদীস থেকে আমরা অনেকেই এই রকম চিন্তা করি-"আলহামদুলিল্লাহ্, আমিতো একটি মাদরাসা থেকে পাস করে আলেম হয়েছি। যেহেতু আমি ইলম অর্জন করেছি, তাই আমি আল্লাহর রাসূলের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকার হয়ে গিয়েছি।" এভাবে ভাবার দ্বারা আমাদের মাঝে এক ধরণের আত্মতৃপ্তি এসে যায়। হাশরের ময়দানে নবীদের পরেই আমরা নিজেদের অবস্থানকে কল্পনা করতে থাকি। আর অন্যদিকে আমরা ইলম চর্চা/ইলমী খিদমতের পাশাপাশি দ্বীনের অন্যান্য আমল ও মেহনতকে উপেক্ষা করে চলতে থাকি। আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর বাকী আমল/মেহনতগুলো করার ব্যাপারে কোনো ফিকির করিনা।

আমরা কোন্ নবীর ওয়ারিশ?

প্রিয় ভাই!

আমরা অনেকেই কোনো একটি মাদরাসা হতে কেবল একটি ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারলেই নিজেকে 'আলেমে দ্বীন' মনে করি। দাবী করি, আমার সিলসিলা (আমি-আমার উস্তাদ- তাঁর উস্তাদ- উস্তাদের উস্তাদ..... এভাবে) প্রিয় নবীজী ﷺ -পর্যন্ত পৌঁছে। এতটুকু অর্জন করতে পারলেই আমরা ভাবতে থাকি, আমরা আল্লাহর রাসূলের ﷺ ওয়ারিশ হয়ে গিয়েছি।

কিন্তু ভাই! প্রশ্ন হল,

আমি কি শুধু কিছু শব্দ আর বাক্যের ওয়ারিশ?

আমি কি শুধু ইলমের ওয়ারিশ?

তাহলে, আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর ওয়ারিশ কারা?

আল্লাহর রাসূলের ﷺ সীরাতের ওয়ারিশ কারা?

আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর আমলসমূহের ওয়ারিশ কারা?

প্রিয় ভাই!

আমরা তো রাসূল ﷺ-এর যিন্দেগীকেই আদর্শ মনে করি। তাই না!

'জিহাদ' কি আল্লাহর রাসূলের ﷺ আদর্শের অন্তর্ভূক্ত নয়?

'জিহাদ' কি আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর অংশ নয়?

'জিহাদ' কি আল্লাহর রাসূলের ﷺ সুন্নাহ নয়?

'জিহাদ' কি আল্লাহর রাসূলের ﷺ রেখে যাওয়া অন্যতম সম্পত্তি নয়?

রাসূল ﷺ কি জিহাদের ময়দানে দান্দান মুবারক শহীদ করেননি?

রাসূল ﷺ কি জিহাদের ময়দানে রক্তাক্ত হননি?

আল্লাহর রাসূল ﷺ কি বলেননি,

بُعِثتُ بالسيفِ بينَ يدَي الساعةِ حتى يُعبدَ اللهُ وحدَه لا شريكَ له

"কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে আমাকে তরবারি সহকারে পাঠানো হয়েছে, যাতে করে এই যমীনে এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়, যার কোনো শরীক নেই।" (মুসনাদে আহমাদ-৫১১৪)

তাহলে, আল্লাহর রাসূলের ﷺ তরবারির ওয়ারিশ কারা?

আল্লাহর রাসূল ﷺ কি বলেননি,

جعل رزقي تحت ظل رمحي

"আমার রিযিক বর্শার ছায়াতলে রাখা হয়েছে।" (বুখারী শরীফ-১/৪০৮)

তাহলে, তরবারির নিচে তাঁর ﷺ কোন ওয়ারিশরা রিযিক অন্বেষণ করবে?

আল্লাহর রাসূল ﷺ কি কুফফার নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেননি,

أتسمعون يا معشر القريش، أما والذى نفس محمد بيدة لقد جئتكم بذبح

"হে কুরাইশের দল, তোরা কি আমার কথা শুনতে পারছিস? ঐ সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমি মুহাম্মাদের জীবন! নিশ্চয় আমি তোদেরকে জবাই করতে এসেছি।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৩২০)

তাহলে ভাই, উম্মাহর উপর তরবারি উত্তোলনকারী কাফেরদেরকে আল্লাহর রাসূলের ﷺ কোন ওয়ারিশগণ জবাই করবে?

বীরত্ব ও বাহাদুরির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্থান কি সকলের উপরে ছিল না? তিনি কি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন না? কঠিন পরিস্থিতিতে বিশিষ্ট বীর পুরুষদের যখন পদস্খলন হয়ে যেত, তখনও কি রাসূলুল্লাহ ﷺ দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতেন না? সে সুকঠিন সময়েও কি তিনি পশ্চাদপসরণ না করে সামনে অগ্রসর হতেন না? তাঁর দৃঢ়চিত্ততায় এতটুকু বিচলিত ভাবও আসত না। এটাই কি আল্লাহর রাসূলের আদর্শ ছিল না?

হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লহ আনহু কি বলেননি,

مَا رَأَيْتُ أَشْجَعَ وَلَا أَنْجَدَ وَلَا أَجْوَدَ ولا أرضى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা না কোনো বীর, সরল ও উদারপ্রাণ ব্যক্তি দেখেছি এবং না অন্যান্য চরিত্র গুণেও তাঁর চাইতে পছন্দনীয় কাউকে দেখেছি।" (নশরুত্তীব) [https://shamela.ws/book/23645/225#p3]

হযরত আলী রাদিয়াল্লহু আনহু কি বলেন নি,

إِنَّا كُنَّا إِذَا حَمِيَ الْبَأْسُ- وَيُرْوَى اشْتَدَّ الْبَأْسُ- وَاحْمَرَّتِ الحدق، اتقينا برسول الله صلّى الله عليه وسلم فَمَا يَكُونُ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ .وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا

"যে সময় যুদ্ধের বিভীষিকা দেখা যেত এবং সুকঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো, সে সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ছত্র ছায়ায় আশ্রয় নিতাম। কারণ, তখন তিনিই থাকতেন কাফেরদের সবচেয়ে নিকটবর্তী। বদর যুদ্ধে আমরা তাঁর আড়ালে আশ্রয় নিতাম। তাঁর চেয়ে বেশি দৃঢ়তার সাথে অন্য কেউ শত্রুর মোকাবিলা করতে পারতো না।" (শাফী, কাজী আয়ায, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৯) [https://shamela.ws/book/23645/225#p4]

হুনাইনের যুদ্ধের দিনও রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিক দুঃসাহসী, বীর ও নির্ভীক কাউকে দেখা যায়নি। (মাদারেজুন্নবুওয়ত)

এভাবে প্রতিটি যুদ্ধে তিনি ﷺ-ই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।

তাহলে, তাঁর ওয়ারিশ হয়েও আমাদের যিন্দেগীতে এত কাপুরুষতা কেন?

আল্লাহর রাসূল ﷺ কি কাফের ও মুনাফেকদের প্রতি কঠোর ছিলেন না?

আল্লাহ তা'আলা কি ইরশাদ করেননি,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

"হে নবী! আপনি কাফের ও মুনাফেকদের সাথে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল সেটি!" (সূরা তাহরীম ৬৬: ৯)

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তাঁর সাথে যারা আছে তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত রহম দিল।" (৪৮ সূরা ফাৎহ: ২৯)

আল্লাহ্ তা'আলা কি প্রতিটি মুমিনকে এই হুকুম করেননি-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও; আর তারা যেন তোমাদের মাঝে কঠোরতা অনুভব করে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (০৯ সূরা তাওবা: ১২৩)

এরপরও কি আমরা কাফেরদের প্রতি কঠোর হব না?

আমরা কি শুধু 'দাওয়াতের খাতিরে কাফেরদের সাথে উত্তম আচরণ' করার সুন্নত'ই আঁকড়ে ধরে রাখব? যখন আল্লাহর হুকুম আসল তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার, তখনও কি আমরা তাদের প্রতি কঠোর হব না? কী হল ভাই আমাদের?

কাফেররা যখন দুনিয়া থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের নাম নিশানা মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখন কেন আমরা তাদের প্রতি কঠোর হবো না?

আমরা কি শুধু মিষ্টি খাওয়ার সুন্নত-ই আদায় করব? আল্লাহর রাসূলের দাঁত ভাঙ্গা'র সুন্নত আদায় করব না?

আল্লাহর রাসূল ﷺ কি বলেননি,

وَأَنَا الْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ الْمَلاحِمِ

"আমি একত্রকারী, আমি যুদ্ধের নবী (নাবিয়্যুল মালাহিম)"

(শামায়েলে তিরমিযি, হাদিস নং-২৮৩; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৪৯২; শারহুস্ সুন্নাহ, হা/৩৬৩১; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৪১৮৫; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হা/৩২৩৫১; মুস্নাদুত তায়ালুসী, হা/৪৯৪)

তাহলে বলুন ভাই, আল্লাহর রাসূলের ওয়ারিশগণ যুদ্ধ করবে না কেন?

আল্লাহর রাসূল ﷺ কি প্রত্যক্ষ ভাবে ২৭ টি যুদ্ধের নেতৃত্ব দেননি?

আল্লাহর রাসূল ﷺ কি পরোক্ষভাবে ৪৬ টি যুদ্ধের নেতৃত্ব দেননি?

তাহলে, আমরা যে রাসূলের ওয়ারিশ দাবী করি, আমাদের জীবনে যুদ্ধ কোথায়? আমাদের জীবনে জিহাদ কোথায়? আমাদের সিলসিলায় কোথায় এসে যুদ্ধ 'নাই' হয়ে গেল? কোথায় এসে 'জিহাদ' হারিয়ে গেল?

এরপরেও কি রাসূলে কারীম ﷺ-এর ওয়ারিশ দাবী করতে আমাদের লজ্জা বোধ হবে না?
এভাবে আমরা আর কতদিন আত্মতৃপ্তিতে ভুগব?
এভাবে আমরা আর কতদিন নিজের মনকে বুঝ দিয়ে যাব?
আর কতদিন আমরা এভাবে নিজেদেরকে ধোঁকা দিতে থাকব?
আর কতকাল আমরা ‘অলীক’ তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে থাকব?
কবে আমরা ‘তাত্ত্বিক ইসলামের দর্শন’ পরিত্যাগ করে ‘নববী মানহাজের’ উপর উঠব?
কবে আমরা ‘খণ্ডিত ইসলামের’ দর্শন ত্যাগ করে ‘পরিপূর্ণ ইসলাম’কে আঁকড়ে ধরব?
কবে আমরা জিহাদের কথা বলব?
কবে আমরা জিহাদের পক্ষে লিখব?
কবে আমরা জিহাদের প্রস্তুতি নিব?
কবে আমরা হকের পথে লড়ব?
কবে ভাই, আর কবে?

মাদরাসাগুলো কোন আদর্শে পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল:

ইসলামের শুরু লগ্ন থেকেই তা’লীম ও জিহাদের একসাথে পথ চলা। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পবিত্র যিন্দেগী থেকে তা’লীম ও জিহাদকে আলাদা করার কোনো সুযোগ কারো নেই?

প্রিয় ভাই!

এমন একটা নজির কি কেউ কখনো দেখাতে পারবেন, কুফ্ফাররা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছে, আর নবীজী ﷺ কিছু সাহাবাদেরকে নিয়ে প্রতিরোধ জিহাদ করেছেন, অন্যদিকে অন্যান্য সাহাবাগণ মাদারাসা নিয়ে পড়ে আছেন?................

এ থেকেই কি (জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায়) ‘মাদরাসার মেহনত’ থেকে জিহাদের মেহনতের অধিক গুরুত্ব প্রমাণিত হয়না?

আসহাবে সুফ্ফা মাদরাসা কি নবীজীর ﷺ যামানায় ছিল না? মাদরাসার ইতিহাস কি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শুরু হয়েছে? মাদরাসার ইতিহাস কি মদীনা ভার্সিটি কিংবা কায়রোর আল আযহার ভার্সিটি থেকে শুরু হয়েছে? না! মাদরাসার ইতিহাস তো শুরু হয়েছে সেদিন, যেদিন আমার নবী ﷺ মক্কায় সাহাবী হযরত আরকাম বিন আবিল আরকাম রা. এর ঘরে কুরআনের তা’লীম শুরু করেছিলেন। এরপর মদীনায় হিজরতের পর ‘সুফ্ফা’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

যেই মাদরাসার আদর্শ আল্লাহর রাসূলের সাথে মিলবে সেটাকেই প্রকৃত মাদরাসা বলা যাবে। কেবল কুরআন হাদীস শিক্ষা আর গবেষণা করলেই যদি তার নাম ‘মাদরাসা’ হয়ে যায় তাহলে এমন বহু মাদরাসা ইহুদীদেরও আছে, এমন অনেক মাদরাসা খ্রিস্টানদেরও আছে, যেগুলোতে বাইবেল/তালমুদ নয়, কুরআনই পড়ানো হয়; ঔল্ড বা নিউ টেস্টামেন্ট নয়, সেগুলোতে হাদীসেরই দরস দেয়া হয়, যেগুলোতে ইসলাম নিয়েই গবেষণা করা হয়। বরং তাদের মেহনত, তাদের গবেষণা, তাদের কুরআন-হাদীস শিক্ষার পিছনে খরচের পরিমাণ আমাদের বড় বড় অনেক মাদরাসার চেয়েও ঢের বেশি।

প্রিয় ভাই!

আল্লাহর রাসূলের ﷺ মাদরাসার একশত ভাগ তালিবুল ইলম মুজাহিদ ছিলেন। তাঁর ﷺ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা-ই হয়েছিল আল্লাহর দ্বীনকে উঁচা করার জন্য, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ তৈরির জন্য। তাই আমাদের যামানার মাদরাসাগুলোতে আমাদের বাচ্চাগুলোকে আজ কেন শেখানো হচ্ছে না, আমার মাথা শুধু একজনের জন্যই খাছ, শুধু একজনের সামনেই নুয়াবে, যার সামনে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সিজদা করি; কোনো তাগুত বা বাতিলের সামনে মাথানত করা যাবেনা, দুনিয়াবী সামান্য স্বার্থে নিজের পরকাল, নিজের ইলম আর ঈমানকে বিক্রি করা যাবে না! আজ ইলমী দরসগাহগুলোতো কেন শেখানো হয় না- 'জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ আমল'?? এর জন্য আজ কেন তাহরীদ করা হয় না? কেন?

সকল আমল/মেহনতের মধ্যে জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ:

প্রিয় ভাই! এই নামে "কিতাবুত্ তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল" এর দ্বিতীয় পর্ব "তাওহীদ ও জিহাদ" কিতাবটিতে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সেটি দেখে নিতে পারি, ইনশাআল্লাহ।

• আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করি না; তার কারণ....

ষষ্ঠ কারণ:

একজন বয়ান করলেন, "আমাদের দেশের মুসলমানদের উপর তো জুলুম করা হচ্ছে না, তাই আমরা কেন, কার বিরুদ্ধে জিহাদ করব?"

যুক্তিখণ্ডন:

• প্রিয় ভাই! আমাদের দেশে মুসলমানদের উপর জুলুম হচ্ছে কি হচ্ছে না, এটি বুঝতে হলে আমাদেরকে প্রথমে জুলমের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বুঝতে হবে।

জুলম কাকে বলে?

ফিকহের কিতাবসমূহে যুলমের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তাহলো-

الظلم: هو مجاو زة الحد، ووضع الشيء في غير موضعه

জুলম অর্থ : সীমাতিক্রম করা।

জুলমের প্রকারভেদ:

শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে জুলম দুই প্রকার: ظلم أكبر (১. জুলমে আকবর/ বড় জুলুম) ও ظلم أصغر (২. জুলমে আছগর/ ছোট জুলুম)

الظلم الأكبر: هو رديف الكفر والشرك، يطلق ويراد به نفي مطلق الإيمان عن صاحبه؛ لأن أظلم الظلم الذي لا يعدله ظلم هو الإشراك بالله ﷺ .. وأن تجعل لله تعالى نداً في أي خاصية من خصائصه ﷺ وهو الذي خلقك .. كما أن أعدل العدل الذي لا يعدله عدل، هو توحيد الله ﷺ .وإفراده بالعبودية

১। জুলমে আকবর: এটিকে কুফরে আকবর এবং শিরকে আকবরের সমার্থক শব্দ বলা যায়। কারণ জুলমে আকবরও মানুষকে দ্বীনে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আর সবচেয়ে বড় জুলুম হল আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কাউকে শরিক করা এবং অন্য কাউকে তার সমকক্ষ মনে করা। কারণ এক আল্লাহ তায়ালাই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যেমনি ভাবে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদকে স্বীকার করা এবং একমাত্র তারই ইবাদত করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইনসাফ ও ন্যায় বিচার।

কুরআনে কারীমে জুলমে আকবরের উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বললঃ হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা সবচেয়ে বড় জুলুম। (সূরা লুকমান ৩১:১৩)

الظلم الأصغر: وهو ظلم دون ظلم؛ لا ينفي مطلق الإيمان عن صاحبه، كما لا ينفي عنه صفة الإسلام واسمه.

২। জুলমে আছগর : এটি মানুষকে দ্বীনে ইসলাম থেকে বের করে না। কিন্তু সে আল্লাহ তায়ালার নিকট অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

কুরআনে কারীমে জুলমে আছগরের উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না।" (সূরা আলে ইমরান ৩:১৩৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।" (সূরা আরফ ৭:২৩)

আয়াতে কারীমে উল্লেখিত জুলুম দ্বারা জুলমে আছগর উদ্দেশ্য।

হাদীস শরীফ থেকে উভয় প্রকার জুলুমের উদাহরণ রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال:" الظلم الذي لا يغفره الله الشرك، قال الله :﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ وأما ، الظلم الذي يغفره فظلم العباد فيما بينهم وبين ربهم ، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضاً حتى يُدبر لبعضهم من بعض"

"আল্লাহ তায়ালা যেই জুলুম ক্ষমা করবেন না তা হল শিরক। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয় শিরকই হল সবচেয়ে বড় জুলুম"। আর আল্লাহ তায়ালা যেই জুলুম ক্ষমা করবেন তা হল হক্কুল্লাহ আদায়ের ক্ষেত্রে জুলুম করা। আর এক বান্দার প্রতি অন্য বান্দার জুলুম আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না। যতক্ষণ না উক্ত বান্দা থেকে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।"

- প্রিয় ভাই! এবার আসুন আমরা চিন্তা করি-
  - ✓ আমাদের দেশে কি গনতন্ত্র নেই? গনতন্ত্র কি শিরকী শাসনব্যবস্থা নয়?....... তাহলে গনতন্ত্র কি সবচেয়ে বড় জুলুম/জুলমে আকবর নয়?
  - ✓ ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করা, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার স্লোগান তোলা এবং ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া কি মুসলমানদের উপর সবচেয়ে বড় জুলুম/জুলমে আকবর নয়?
  - ✓ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করা এবং তা মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া ও মানতে বাধ্য করা কি সবচেয়ে বড় জুলুম/জুলমে আকবর নয়?
  - ✓ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানের মূল ভিত্তি বানিয়ে এহেন কুফুরী সংবিধানে মুসলমানদের শাসন করা কি মুসলমানদের উপর সবচেয়ে বড় জুলুম/জুলমে আকবর নয়?
  - ✓ কুরআন-সুন্নাহর আইন ছেড়ে পাশ্চাত্য বিধর্মীদের তৈরিকৃত নীতিমালা দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করা কি মুসলমানদের উপর সবচেয়ে বড় জুলুম/জুলমে আকবর নয়?
  - ✓ আল্লাহ তা'আলা যে সব বস্তুকে হারাম করেছেন (যেমন- সুদ, যিনা, মদপান, অশ্লীলতা ইত্যাদি) রাষ্ট্রীয়ভাবে তার অনুমোদন দেওয়া, রাষ্ট্রীয়ভাবে সেসবের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং প্রচার-প্রসার করা কি মুসলমানদের উপর সবচেয়ে বড় জুলুম/জুলমে আকবর নয়?

- ✓ আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তুকে হালাল করেছেন, (যেমন- বাল্যবিবাহ, জিহাদ ইত্যাদি) সেসব বস্তুকে নিষিদ্ধ করা কি মুসলমানদের উপর সবচেয়ে বড় জুলুম/জুলমে আকবর নয়?
- ✓ যে সকল ভাইয়েরা আল্লাহর আইন রাষ্ট্রে কায়েম করার জন্য নিজের সকল কিছু কুরবানী করে মেহনত করে যাচ্ছেন তাদেরকে বন্দী করা, তাদেরকে 'সন্ত্রাসী' ট্যাগ দেয়া, অত্যাচার নির্যাতন চালানো, তাদেরকে ধরে ধরে ভারত, আমেরিকা, ইসরাঈলসহ অন্যান্য কাফেরদের হাতে হস্তান্তর করা, তাদেরকে হত্যা করা- এগুলো কি মুসলমানদের উপর জুলুম নয়?
- ✓ বোরকা ও হিজাব পরিহিতা পর্দানশীন নারীদেরকে 'চলন্ত তাঁবু' আখ্যায়িত করা, পর্দা বিরোধী আইন চালু করা- এগুলো কি মুসলমানদের উপর জুলুম নয়?
- ✓ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে দিল্লী কিংবা ওয়াশিংটনের কাছে বিক্রি করা কি মুসলমানদের উপর জুলুম নয়?
- ✓ মুসলমানদের উপর নারী নেতৃত্বের অভিশাপ চাপিয়ে দেয়া কি মুসলমানদের উপর জুলুম নয়?
- ✓ মুসলমানদের উপর সুদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া কি মুসলমানদের উপর জুলুম নয়?
- ✓ দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতি ও তা সাধারণ মুসলমানদের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে যাওয়া কি মুসলমানদের উপর জুলুম নয়?

....

প্রিয় ভাই! এর পরও কি আমরা বলতে পারবো, আমাদের দেশে মুসলমানদের উপর জুলম হচ্ছে না???
হায়! আমাদের অবস্থা যেন সেই ডাহুকের ন্যায় না হয়, যে শিকারী দেখে চোখ বুজে থেকে মনে করে, যেহেতু আমি শিকারীকে দেখতে পাচ্ছি না, তাই শিকারীও আমাকে দেখতে পাচ্ছে না! জুলুমের সাম্রাজ্যে হাবুডুবু খেয়েও যদি আমরা বলি আমাদের উপর জুলুম করা হচ্ছে না, তাহলে বিষয়টি সত্যিই দুঃখজনক। বিশেষতঃ এই ধরণের কথা একজন আলেমের মুখে কখনোই শোভা পায়না ভাই!
আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

জিহাদ কি কেবলই দেফায়ী?

প্রিয় ভাই! "আমাদের দেশের মুসলমানদের উপর তো এখন জুলুম হচ্ছে না"- এই কথা দ্বারা যদি এটি বুঝানো উদ্দেশ্য হয় যে, "আমাদের দেশে তো বহিঃবিশ্বের কেউ আক্রমন করে অত্যাচার-নির্যাতন কিংবা হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে না", তাহলে এই কথার অর্থ দাঁড়ায়-

- ✓ কুফফার দ্বারা আক্রান্ত না হলে আমরা কেন জিহাদ করব?
- ✓ আগে বেড়ে কাফেরদের সাথে জিহাদ করার সুযোগ ইসলামে নেই, যতক্ষণ না কাফেররা মুসলমানদের উপর আক্রমন করছে।
- ✓ এককথায়, ইসলামে কেবলই প্রতিরোধমূলক (দেফায়ী) যুদ্ধের অনুমোদন আছে, আক্রমণাত্মক (ইক্বদামী) যুদ্ধের অনুমতি নেই।

প্রিয় ভাই! এ ধরণের চিন্তা মূলতঃ আল্লাহ পাকের একটি ফরয হুকুম (আক্রমনাত্মক জিহাদ)-কে অস্বীকার করার নামান্তর। কেননা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।" [সুরা তাওবা - ৯:২৯]

উপর্যুক্ত আয়াতে ততদিন পর্যন্ত ক্বিতাল জারী রাখার আদেশ করা হয়েছে যতদিন না কাফেররা অবনত হয়ে জিযিয়া প্রদান করে। আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায়; এবং যে সময় দ্বীন (বিজয়) সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। [সুরা আনফাল - ৮:৩৯]

যদি ক্বিতালের উদ্দেশ্য শুধু আক্রান্ত হওয়ার পর প্রতিরোধ করাই হত তবে বলা হত, 'তোমরা ততদিন যুদ্ধ করতে থাক, যাবত না কাফেররা তোমাদের উপর আক্রমন বন্ধ করে'। কিন্তু জিযিয়া ওয়াজিব করা এবং এর পাশাপাশি তাদের অবনত হওয়া আর সারা পৃথিবীতে ইসলাম বিজয়ী ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উল্লেখ এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কুফ্ফারদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করা এবং কুফর ও শিরকের সকল ফেতনার মূল উৎপাটনই আসল উদ্দেশ্য, যাতে কুফরের রাজনৈতিক প্রভুত্বের কারণে ভীতির যে পর্দায় মনমানস আচ্ছন্ন হয়ে আছে তা উন্মোচিত হয়, অতঃপর মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি স্বাধীন ও মুক্ত মনে চিন্তা করার সুযোগ ঘটে। ইমাম রাযী রহ. সুরা তাওবা - ৯:২৯ আয়াতের আলোচনায় তাফসীরে কাবীরে বলেন,

لَيْسَ الْمَقْصُوْدُ مِنْ أَخْذِالْجِزْيَةِ تَقْرِيْرُهُ عَلىٰ الْكُفْرِ- بَلِ الْمَقْصُوْدُ مِنْهَا حَقْنُ دَمِهِ, وَإِمْهَالُهُ مُدَّةً, رَجَاءَ أَنَّهُ رُبمَّاَ وَقَفَ فِي هٰذِهِ الْمُدَّةِ عَلىٰ مَحَاسِنِ الْإِسْلاَمِ, وَقُوَّةِ دَلَائِلِهِ, فَيَنْتَقِلُ مِنَ الْكُفْرِ إِلىٰ الْإِيمَانِ ..... فَإِذَا أُمْهِلَ الْكَافِرُ مُدَّةً وَهُوَ يَشْهَدُ عِزَّالْإِسْلاَمِ, وَيَسْمَعُ دَلَائِلَ صِحَّتِهِ, وَيُشَاهِدُ الذِّلَّ وَالصِّغَارَ فِي الْكُفْرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْمِلُهُ ذٰلِكَ عَلٰى الْاِنْتِقَالِ إِلَى الْإِ سْلَامِ, فَهَذَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ مِنْ شَرْعِ الْجِزْيَةِ-

'জিযিয়ার উদ্দেশ্য কাফেরকে কুফরীর হালতে বাকী রাখা নয়, বরং উদ্দেশ্য হল তাকে বাঁচিয়ে রেখে কিছু দিন সময় দেওয়া, যে সময়ের মধ্যে তার ব্যাপারে এই আশা হবে যে, সে ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করে কুফর থেকে ইসলামের দিকে আসবে.......। অতএব যখন কাফেরকে কিছু দিন সময় দেওয়া হবে এবং সে ইসলামের প্রভাব দেখবে, তার সত্যতার দলীলসমূহ শুনবে এবং কুফরের লাঞ্ছনা দেখবে তখন এইসব বিষয় তাকে ইসলামের প্রতি অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে। বস্তুতঃ জিযিয়া বিধিবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য এটিই।'

আক্রমনাত্মক জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে মুফতী আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা. লিখেন-

"এই শেষ যামানার কোন কোন লেখকের রচনা থেকে, যা তারা জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং জিহাদের তাৎপর্য, উপকারিতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করার জন্য লিখেছেন, এই ধারণা জন্মায় যে, ইসলামে শুধু দিফায়ী জিহাদ (প্রতিরোধমূলক জিহাদ) অনুমোদিত, ইক্বদামী জিহাদের (আক্রমণমূলক জিহাদ) অনুমোদন ইসলামে নেই। তাদের এ জাতীয় কথাবার্তার কারণ হয়ত জিহাদ সম্পর্কীয় কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও

খোলাফায়ে রাশেদীনের বরকতময় জীবনচরিত সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা পাশ্চাত্যের অন্যায় আপত্তিসমূহের কারণে ভীত কম্পিত মানসিকতা।

বাস্তবতা হল, জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ বা ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তি চুরমার করা। এতদুদ্দেশ্যে ইক্বদামী বা আক্রমনমূলক যুদ্ধ শুধু অনুমোদিতই নয় বরং কখনো কখনো তা ফরয ও প্রভূত সওয়াবের কারণও বটে। কুরআন সুন্নাহর দলীলসমূহের পাশাপাশি পুরো ইসলামী ইতিহাস (রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে) এ ধরণের জিহাদের ঘটনায় পরিপূর্ণ।”

(‘কিতাবুল জিহাদ’ কিতাবের ভূমিকা, পৃ. ৩৯; লিংক: https://archive.org/details/kitabuljihad_202210)

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তক্বী উসমানী দা.বা. এর ভাষায়-

“অমুসলিমদের আপত্তিতে ভীত হয়ে এসব বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করা বা এতে ওযরখাহীমূলক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা একটি অর্থহীন কাজ। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একজন ব্যক্তিকেও জবরদস্তি করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয় নাই এবং এর অনুমোদনও শরীয়তে নেই, অন্যথায় জিযিয়ার পুরো ব্যবস্থাপনাই অর্থহীন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই তরবারী উঠানো হয়েছে, কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতে চায় থাকুক কিন্তু আল্লাহর বানানো এই পৃথিবীতে বিধান আল্লাহরই চলা উচিত এবং মুসলমান আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য এবং আল্লাহদ্রোহীদের প্রভাব প্রতিপত্তিককে চুরমার করার জন্যই জিহাদ করে। আমরা এই বাস্তব সত্য প্রকাশ করতে ঐসব লোকের সামনে কেন লজ্জাবনত হব যাদের পুরো ইতিহাস সাম্রাজ্য বিস্তারের উন্মত্ত নেশায় হত্যাযজ্ঞ সংঘটনের ইতিহাস এবং যারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির জাহান্নাম পূর্ণ করার জন্য কোটি কোটি মানুষের প্রাণ সংহার করেছে! যাদের নিক্ষিপ্ত গোলামীর জিঞ্জিরে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির দেহ আজও রক্তাক্ত!” (জিহাদ ইক্বদামী ইয়া দিফায়ী? ফিকহী মাকালাত খণ্ড ৩, পৃ. ২৮৮-২৮৯, ৩০৩)

সুতরাং প্রিয় ভাই! উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটিই প্রতীয়মান হয়না কি-

- মুসলমানদের উপর কুফ্ফারদের আক্রমন না থাকলেও জিহাদের ফরজিয়ত থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো না?
- জিহাদ আমাদেরকে করতেই হবে, যতক্ষণ না দুনিয়ার বুকে কুফর ও শিরকের ফিতনা বাকী থাকে?

সুতরাং “মুসলমানদের উপর জুলুম হচ্ছে না” একথা বলে জিহাদ থেকে পলায়ন করার কোনো সুযোগ ইসলামী শরীয়ত আমাদেরকে দিয়েছে কি?

• আমরা (আলেমরা) সশস্ত্র জিহাদ করি না; তার কারণ....

সপ্তম কারণ:

আমরা অনেক ভাই আছি, যারা মনে করি, ইসলাম তো শান্তির ধর্ম, ইসলাম মারামারি-কাটাকাটি পছন্দ করে না, তাই আমরাও মারামারি-কাটাকাটি আর বিশৃঙ্খলা (এককথায় জিহাদ) পছন্দ করিনা।

যুক্তিখণ্ডন:

'ইসলাম শান্তিপ্রিয়' একথাটির প্রকৃত অর্থ কী?

• প্রিয় ভাই! আমাদের মহান ধর্ম 'ইসলাম' সব সময়ই চায় যে, দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ সদা সর্বদা সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক, নিরাপদে থাকুক; সমাজে কোনো অশান্তি, অরাজকতা, খুন, হত্যা, ধর্ষণ, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি না থাকুক; রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় কোনো অন্যায়, অবিচার, যুলুম না থাকুক, প্রকারান্তরে, সকল কল্যাণের আধার 'আসমানী আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, ন্যায়-ইনসাফ আর আদলের রাজ কায়েম হোক, মানুষ মন্দ মানুষের যন্ত্রনা থেকে রেহাই পাক, বান্দার গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর দাস হয়ে যাক; সমাজের প্রতিটি পরিবার সুখে-শান্তিতে থাকুক, তাই পরিবারের কোনো সদস্যই যেন মাদকাসক্ত না হয়ে যায়, যিনা, ব্যভিচার আর পরকিয়ায় লিপ্ত না হয়; প্রতিটি মানুষ অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি লাভ করুক, সমাজ দারিদ্র্যমুক্ত হোক, সকলেই সচ্ছল হোক, সকলে যাকাত দেয়ার উপযুক্ত হোক, কেউ যাকাতগ্রহণকারী না থাকুক, সমাজে কোনো মধ্যস্বত্যভোগী বা সিন্ডিকেট না থাকুক, সম্পদের সুষম বন্টন হোক, সমাজে অন্যায় ভোগ-দখল না থাকুক, শোষনের হাতিয়ারগুলো (সুদ, ঘোষ ইত্যাদি) সমাজ থেকে বিদায় নিক; রাষ্ট্রযন্ত্রে কোনো দুর্নীতি ও ঠকবাজ না থাকুক; সমাজের প্রতিটি মানুষ অপরাপর মানুষের জন্য কল্যাণকর হোক, একে অন্যের কল্যাণকামী হোক, কেউ কারো দ্বারা কষ্ট না পাক, একে অন্যের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করুক; নারীরা সমাজে পূর্ণ নিরাপত্তা, সম্মান, ইজ্জত লাভ করুক, সকলের সম্মানের পাত্র হোক, নষ্টদের ভোগ্যসামগ্রী কিংবা পণ্যে পরিণত না হোক, অন্যদিকে তারা যেন সমাজের পুরুষদের কামোদ্দীপনা, কুমন্ত্রনা আর কুচিন্তার কারণ না হয়, সুস্থ চিন্তা আর মস্তিষ্কের, সভ্য ও শালীন মানবসমাজ গড়ে উঠুক। ইত্যাদি। আর এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই আমাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা দ্বীন ইসলামের সমস্ত হুকুম আহকাম নাযিল করেছেন, প্রিয় নবী ﷺ, খোলাফায়ে রাশেদা এবং পরবর্তীতে নেককার খলিফা ও শাসকবৃন্দ মানব ইতিহাসে এর বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, পৃথিবীর বুকে এমন সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির সমাজ প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য যিনি আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা ধন্য করেছেন।)

.... প্রিয় ভাই! এই অর্থে 'ইসলাম শান্তিপ্রিয়', একথাটি শতভাগ সঠিক।

কিন্তু সমাজের একদল ব্যক্তি রয়েছে, যাদের অন্তর বক্রতাসম্পন্ন, যারা মানবসমাজের কল্যাণকামী নয়, যারা কখনো চায়না মানবজাতি সুখে শান্তিতে থাকুক, মানুষের মন-মগজ সুস্থ চিন্তা করুক, যারা চায় মানুষের মাঝে অন্যায়, অবিচার, যুলুম আর অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, যারা চায় কেবল নিজেরাই সম্পদের পাহাড় গড়ুক, অন্যদিকে সাধারণ জনগণ না খেয়ে মরুক, মানুষ খাহেশাত আর ফাহেশাতের দাস হোক, আমজনতা তাদের দাসত্ব করুক, নারী কেবল প্রদর্শন ও ভোগ্য পণ্য হোক, সমাজে মাদক ব্যাপক আকারে সয়লাব হোক, ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র

সকলেই সর্বদা অশান্তির অন্ধকারে ডুবে থাকুক; এককথায়, ইসলাম যা চায় তারা সর্বদাই তার বিপরীত কামনা করে থাকে, এই লোকগুলো চায় মানবজাতি এক আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে তাদের পূঁজা করুক, তাদের নফসের উপাসনা করুক, শয়তানী ও দাজ্জালী শাসনব্যবস্থা সারা দুনিয়ায় কায়েম হোক, তারা তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মানবজাতিকে যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধানাবলি চাপিয়ে দিবে তাই মানুষ গ্রহণ করুক। মোটকথা, তারা কখনো চায় না সমাজে ইসলাম থাকুক, মানুষ ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করুক, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে সমাজে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ফিরে আসুক।

এই লোকগুলো ক্যান্সারের মত, এরা সাধারণ এন্টিবায়োটিক দ্বারা সমাজ থেকে নির্মূল হবে না, এদের একমাত্র প্রতিকার হল অস্ত্রোপচার (সার্জারী)। ক্যান্সারের কোষযুক্ত টিউমারকে যদি দেহ থেকে কেটে ফেলা না হয়, তাহলে এই ক্যান্সার যেমন সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে, তেমনিভাবে এই লোকদেরকে যদি সমাজ থেকে নির্মূল না করা হয়, তাহলে মানবসমাজ অশান্তির ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে, আর এই অশান্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে, মানব সমাজ অসুস্থ হয়ে অশান্তির আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, জাহান্নামের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে।

এই লোকগুলোর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান হলো- এদের জন্য কেবল দাওয়াতী মেহনত করাই যথেষ্ট নয়, এদের জন্য কেবল ওয়াজ-নসীহত করাই যথেষ্ট নয়, সমাজে কেবল মসজিদ-মাদরাসা আর খানকাহর সংখ্যা বৃদ্ধি করাই এদের হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট নয়, কেবল কিছু কিতাবাদি রচনা করে রেখে যাওয়াই যথেষ্ট নয়,........................; এদের জন্য চাই 'রক্ত ঝরানো', হ্যাঁ, এদের রক্ত ঝরাতে হবে, এদেরকে সমাজ থেকে বিদায় দিয়ে জাহান্নামে পাঠাতে হবে, এদেরকে হত্যা করতে হবে, এদেরকে হত্যা করতে প্রতিটি ঘাটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকতে হবে, এটিই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর বিধান। ইসলাম তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে (সমাজ থেকে সকল অশান্তি দূর করতে) এজন্যই জিহাদের বিধান দিয়েছে। আর সমাজে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে যে বা যারাই বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, ইসলামের অগ্রযাত্রার বিরুদ্ধে যারাই তরবারি ধারণ করবে, তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদের হুকুম দেয়া হয়েছে, এদেরকে হত্যা করার বিধান দেয়া হয়েছে, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধান দেয়া হয়েছে।

সুতরাং 'ইসলাম শান্তিপ্রিয়' এই কথার অর্থ কখনোই এই নয় যে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম কাউকে হত্যা করার অনুমতি দেয়না, ইসলাম কখনোই মারামারি কাটাকাটি পছন্দ করেনা; বরং সারাবিশ্বে পরিপূর্ণ রূপে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি ফিরিয়ে আনতে যতদিন প্রয়োজন জিহাদ করতে হবে, যতটুকু মারামারি-কাটাকাটি করতে হয় ততটুকুই করতে হবে, যারাই আল্লাহর সাথে দুশমনি করবে, দ্বীন ইসলামের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে, ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে তাদের সকলকে হত্যা করতে হবে, যতজনকে দরকার ততজনকেই বন্দী কিংবা হত্যা করতে হবে; কত হাজার কিংবা কত লক্ষ লোককে হত্যা করা হল, কী পরিমাণ কিংবা কতটুকু রক্তপাত করা হল তা দেখা হবে না; তবে হ্যাঁ, অন্যায়ভাবে ও অপ্রয়োজনে কিংবা বিনা কারণে একজন মানুষ তো দূরে থাক একটি প্রাণিকেও হত্যা করা ইসলাম পছন্দ করেনা; হত্যা করা তো পরের কথা স্বাভাবিক কষ্ট দেয়াও ইসলাম অপছন্দ করে। আলহামদুলিল্লাহ, এভাবেই ইসলাম একটি পরিপূর্ণরূপে ভারসাম্যপূর্ণ ও শান্তির ধর্ম।

- প্রিয় ভাই! নিচের আয়াতগুলো দ্বারা একথা কি বুঝে আসে না, ইসলাম রক্তপাত (জিহাদ ও ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ, দ্বীন কায়েমের জন্য প্রয়োজনে কুফফারদের রক্ত ঝরানো) পছন্দ করে কি করে না?

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না। [সুরা বাকারা - ২:২১৬]

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। [সুরা তাওবা - ৯:২৪]

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ-لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কন্টক নেই (অর্থাৎ যাতে কোনো রক্তপাত নেই), তাই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং (জিহাদ/ক্বিতাল/রক্তপাতের মাধ্যমে) কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে। যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়। [সুরা আনফাল - ৮:৭, ৮:৮]

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

"অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! একথা শুনলে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:০৪)

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সুরা তাওবা - ৯:৫]

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

"সুতরাং যদি কখনো তুমি তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও, তবে তাদের এমন শাস্তি দাও, যেন তাদের উত্তরসূরিরা তাই দেখে পালিয়ে যায়; তাদেরও যেন শিক্ষা হয়"। (সূরা আল-আনফাল ০৮:৫৭)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। [সুরা তাওবা - ৯:১৬]

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيرًا

(ওহে বনি ইসরাঈল!) তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। [সুরা বনী-ইসরাঈল - ১৭:৭]

الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম। [সুরা তাওবা - ৯:২০]

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ

তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। [সুরা তাওবা - ৯:২১]

....................ইত্যাদি।

এরকম শত শত আয়াত রয়েছে কুরআন কারীমে যেগুলো পাঠ করলে সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা জিহাদ করাকে (দ্বীনের প্রয়োজনে যুদ্ধ করা ও রক্তপাত ঘটানোকে) কতটুকু ভালোবাসেন, যারা জিহাদ করে তাদেরকে তিনি কতটুকু ভালোবাসেন, পরকালে তাদেরকে তিনি কত বেশি পুরস্কৃত করবেন! সুবহানাল্লাহ।

- প্রিয় ভাই! ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখি! দ্বীন ইসলামকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে কী পরিমাণ রক্তপাত ঘটানো হয়েছে! ইসলামের প্রাথমিক যুগের (নবুওয়তের যামানা ও খোলাফায়ে রাশেদার যামানার) কিছু যুদ্ধের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। নিচের পরিসংখ্যানটি লক্ষ্য করি-

নবুয়তের যামানায় সংগঠিত হওয়া যুদ্ধ সমূহের পরিসংখ্যান			
সাল	যুদ্ধের নাম	কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা	নিহত কাফেরের সংখ্যা
রমজান, ২য় হিজরি	বদর যুদ্ধ	৯৫০	৭০
শাওয়াল, ৩য় হিজরি	উহুদ যুদ্ধ	৩০০০	২২
	বনু কুরায়যার যুদ্ধ	-	৬০০-৭০০
মুহাররাম, ৭ম হিজরি	খায়বার যুদ্ধ		৯৩
জমাদিউল আউয়াল, ৮ম হিজরি	মূতার যুদ্ধ	২,০০,০০০	অগণিত
	হুনাইনের যুদ্ধ		৭০

হযরত আবু বকর রাদি. এর খিলাফতের সময় সংগঠিত যুদ্ধসমূহ			
সাল	যুদ্ধের নাম	কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা	নিহত কাফেরের সংখ্যা
মুহাররাম, দ্বাদশ হিজরি	শিকলের যুদ্ধ	-	অসংখ্য
সফর, দ্বাদশ হিজরি	মাযারের যুদ্ধ		৩০,০০০
সফর, দ্বাদশ হিজরি	ওয়ালাজার যুদ্ধ		অসংখ্য
সফর, দ্বাদশ হিজরি	উল্লায়শ বা আমগিশিয়ার যুদ্ধ		৭০,০০০
জিলহজ্জ, দ্বাদশ হিজরী	ফিরাযের যুদ্ধ		অসংখ্য
	আযনাদাইন	১,০০,০০০	অসংখ্য

প্রিয় ভাই! ইসলামী ইতিহাসের পরবর্তী যুদ্ধগুলো ছিল আরো ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী, যা কুফ্ফারদের জন্য ছিল অভিশাপস্বরূপ! “হযরত উমর ফারুক রাদি. অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছিলেন”- এই কথাটি আমরা প্রবাদবাক্যের মত এক নিঃশ্বাসে বলে থাকি। কিন্তু আমরা কি জানি, এই অর্ধ জাহান জয় করতে কী পরিমাণ রক্তপাত ঘটানো হয়েছিল? কী পরিমাণ কাফেরকে হত্যা করা হয়েছিল?? প্রিয় নবীজীর ﷺ ওফাতের পরবর্তী বিশ বছরে অর্ধজাহান জয় করা

হয়েছে; আর এই অর্ধজাহান জয় করতে যুদ্ধের ময়দানে কত লক্ষ কাফেরকে হত্যা করা হয়েছে তার সঠিক হিসাব ঐতিহাসিকগণও সঠিকভাবে নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাদি. এর সময়ের কিছু যুদ্ধের পরিসংখ্যান লক্ষ্য করুন-

হযরত উমর ফারুক রাদি. এর খিলাফতের সময় সংগঠিত যুদ্ধসমূহ			
সাল	যুদ্ধের নাম	কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা	নিহত কাফেরের সংখ্যা
শাবান, ত্রয়োদশ হিজরি	ফিহল	৮০,০০০	প্রায় সকল কাফেরকেই হত্যা করা হয়
রজব, পঞ্চদশ হিজরি	ইয়ারমুকের যুদ্ধ	২,৪০,০০০ মতান্তরে ৪,০০,০০০	৭০,০০০ মতান্তরে ১,২০,০০০
শাবান, ত্রয়োদশ হিজরি	সেঁতুর যুদ্ধ	-	৬,০০০
রমজান, ত্রয়োদশ হিজরি	বুআইবের যুদ্ধ	১,৫০,০০০	এই যুদ্ধেও প্রায় সকল কাফেরকেই হত্যা করা হয়
১৩-১৫ শাবান, পঞ্চদশ হিজরী	কাদেসিয়ার যুদ্ধ	৩০,০০০	গণনাতীত

- প্রিয় ভাই! 'রক্তের নদী' কথাটি সাহিত্যে বা প্রবাদে পাওয়া গেলেও বাস্তবে পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটি পাওয়া যায় না, একমাত্র ইসলামের ইতিহাস এর ব্যতিক্রম। **উল্লায়শ (বা আমগিশায়া)-এর যুদ্ধে (সফর, দ্বাদশ হিজরি)** 'সাইফুল্লাহ' তথা আল্লাহর তরবারি হিসেবে খ্যাত মুসলিম সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. আল্লাহর কাছে দোয়া করেন- "হে আল্লাহ্! আমাদের সাহায্য করা আপনার ইখতিয়ার। আপনি যদি শত্রুবাহিনীকে আমাদের কর্তৃত্বে এনে দেন, তাহলে তাদের সকলকে নিশ্চিহ্ন করব; এমনকি তাদের রক্তে নদী প্রবাহিত করব।" (তাবারী ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬০; আরো বিস্তারিত পড়ুন- হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. এর জীবনী "আল্লাহর তলোয়ার"- মেজর জেনারেল এ আই আকরাম, লিংক- https://archive.org/details/KhalidbinwalidRa)

এমন দুআ করার কারণ ছিল, এই কুফ্ফার বাহিনী ইসলামের অগ্রসরের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এরা এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পরবর্তী যুদ্ধে আরো শক্তি সঞ্চার করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছিল। তাই হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তমূলক আচরণের (সকলকে হত্যার) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে মুসলমানরা পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করে। হযরত খালিদ রাদি. ঘোষণা দেন- শত্রুদেরকে হত্যা করো না, জীবিত আটক করো। কেবল তাকেই হত্যা করো যে বাধা প্রদান করে।

সেনাপতির নির্দেশে মুসলমানরা পারসিক সৈন্যদেরকে আটক করে। এরপর হযরত খালিদ রাদি. এদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন।

প্রিয় ভাই! দৃশ্যটি একটু কল্পনা করুন। দ্বীনের স্বার্থে সাহাবায়ে কেরাম কুফ্ফারদের প্রতি কেমন কঠোর ও নির্দয় ছিলেন!!! দুনিয়ার জীবনে এটিই তাদের আসল প্রাপ্তি, আর পরকালের আযাব তো আরো কঠিন! পারসিক বাহিনীর সত্তর হাজার বন্দীকে নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে এমনভাবে হত্যা করা হয় যে, তরবারির আঘাতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরো শরীর নদীতে গিয়ে পড়ত। এভাবে তিনদিন ব্যাপী কুফ্ফার নিধন চলতে থাকে।

এভাবে কুফ্ফার নিধন পর্ব শেষ হলে কয়েকজন মুসলিম সামরিক অফিসার হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. এর চারপাশে জমায়েত হন। হযরত কাকা রহ. খালিদ রাদি. এর দিকে তাকিয়ে বলেন, "আপনি পৃথিবীর সমস্ত লোককে হত্যা করলেও এই নদীর বুকে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হবে না যতক্ষণ না এর উজানের বাঁধ খুলে দেয়া হয়। নদীর বুকে পানি আসতে দিন, তাহলেই আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হবে।" (প্রাগুক্ত)

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদি. বাধ কেটে দিতে নির্দেশ দেন, ফলে 'রক্তের নদী' প্রবাহিত হয়। এভাবে তিনি আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করেন।

সুবহানাল্লাহ! আর এভাবেই রক্তের নদী সাঁতরিয়ে ইসলাম তার মঞ্জিলে পৌঁছেছিল, বিজয়ী ধর্মরূপে অর্ধপৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আল্লাহু আকবার! আর এই বাস্তবতাকে কোন বধির ও অন্ধ ব্যতীত অন্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তাঁর সাথে যারা আছে তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত রহম দিল।" (৪৮ সূরা ফাৎহ: ২৯)

সুতরাং প্রিয় ভাই! "ইসলাম শান্তি চায়" এই কথার অর্থ কখনোই এই নয় যে, ইসলাম কাপুরুষ ও ভীরুদের ধর্ম, ইসলাম একদল খোঁজা-নপুংসকের ধর্ম; বরং ইসলাম চিরদিনই অসীম সাহসী বীরদের ধর্ম, যারা চোখের পলকে, দ্বীনের স্বার্থে, আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন দিতে সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকে। ইসলাম এমন ধর্ম, যে অন্য কোনো বাতিল ধর্ম ও মতবাদকে সহ্য করতে পারে না। এই মহান ধর্ম চায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মাধ্যমে আপন শাসন প্রতিষ্ঠা করে সারা পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করতে, খোদায়ী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। আর এই প্রক্রিয়ায় যে বা যারাই কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে, তাদের জবাব হবে একমাত্র এবং কেবলমাত্র তরবারি।

দাওয়াতী মেহনতের সাথীদেরকে শয়তানের ধোঁকা

• আমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ:

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" (০৩ সূরা আলে ইমরান: ১১০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"আর তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে (মানুষদেরকে) দাওয়াত দেয়, নিজে সৎকর্ম করে আর বলে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত?" (৪১ সূরা হা মিম সিজদাহ: ৩৩)

প্রিয় ভাই! আমরা যারা দাওয়াতের ময়দানে মেহনত করি, তারা অনেকে উপরের আয়াত দুটির এই তাৎপর্য এমনটি গ্রহণ করি- "দাওয়াতের মেহনত-ই সর্বশ্রেষ্ঠ মেহনত। কেননা, নবী রাসূলগণের মূল কাজই ছিল মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকা। আর এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে। আর আমরা দাঈ'রাই উম্মতের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বা সকলের উপরে। আর যেহেতু আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ মেহনত করছি, তাই আজীবন এই মেহনতের সাথেই লেগে থাকব। অন্য কোনো মেহনতের সাথে জুড়ব না।"

প্রিয় ভাই! নিচের কথাগুলো একটু গভীরভাবে চিন্তা করি-

আমরা যদি সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের অন্তর্ভূক্ত হতে চাই, তাহলে কি আমাদেরকে শুধু দাওয়াতের মেহনত করলেই চলবে? দাওয়াতের পাশাপাশি-

.... আমাদেরকে কি নামায কায়েম করতে হবে না?

.... আমাদেরকে কি রমাযান মাসে সিয়াম পালন করতে হবে না?

.... আমাদেরকে কি হজ্জ ফরয হওয়ার পরও হজ্জ করতে হবে না?

.... আমাদেরকে কি যাকাত ফরয হওয়ার পরও যাকাত আদায় করতে হবে না?

ঠিক এমনিভাবে- জিহাদ ফরযে আইন হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে কি জিহাদ করা লাগবে না? ....

নামায কায়েম না করে, সিয়াম পালন না করে, ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করে, বাইতুল্লায় হজ্জ না করে কেবল দাওয়াতী মেহনত করে যদি 'সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত' না হওয়া যায়, তাহলে প্রিয় ভাই আমার, জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে জিহাদ না করে কী করে আমরা নিজেদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত দাবী করতে পারি??? ....

আর ভাই!

"নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত?"-একথার অর্থ কী??

একথার অর্থ হল-

নিশ্চয়ই আমি 'আত্মসমর্পণকারীদের' অন্তর্ভূক্ত।.............

কার প্রতি আত্মসমর্পণ??..........

আল্লাহ্ পাকের প্রতি..........আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের প্রতি.......

আর তাই "নিশ্চয়ই আমি 'আত্মসমর্পণকারীদের' অন্তর্ভূক্ত।" একথার অর্থ হল-

"হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে আমার রব হিসেবে মেনে নিয়েছি। আমি তোমাকে আমার হুকুমদাতা হিসেবে মেনে নিয়েছি। আমি তোমাকে একমাত্র বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছি। তুমি আমাকে যখন যে হুকুম করবে, যখন যে বিধান দান করবে, আমি তা মাথা পেতে নিব। আমি তোমাকে আমার গর্দান দিয়ে দিয়েছি। তুমি যখন ইচ্ছা, যেখানে খুশি তাকে ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার হায়াত, আমার মওত- সবকিছুই তোমার জন্য নিবেদিত। তুমি যখন আমাকে নামায-রোযার হুকুম দিয়েছ, তা মেনে নিয়েছি; তুমি যখন হজ্জ-যাকাতের বিধান দিয়েছ, তাও মেনে নিয়েছি; তুমি যখন দাওয়াতের মেহনতের আদেশ দিয়েছ, তখন তাও করে যাচ্ছি; আর এখন তুমি জিহাদের হুকুম দিয়েছ, তাও আমি মাথা পেতে নিচ্ছি; আমার জান, আমার মাল, আমার পরিবার-পরিজন, আমার ক্যারিয়ার- সবকিছু তোমার জন্য কুরবানী করে দিলাম। কবুল কর হে প্রভু দয়াময়- এই গরীবের পক্ষ থেকে ক্ষুদ্র এই নজরানা! ক্ষমা কর আমায় তুমি! আর পরকালে আমাকে দাও তোমার দীদার, তোমার হাবীবের প্রতিবেশ, শহীদের সুউচ্চ জান্নাত, জান্নাতুল ফিরদাউস্! নিশ্চয়ই তুমি পরম দাতা ও দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল।"

• আমরা একটি ফরযে আইন বিধান তরক করছি নাতো!

আমরা যে সকল ভাইয়েরা কেবল দাওয়াতের ময়দানে মেহনত করে থাকি, আমরা একটু ভেবে দেখি! আমরা ফরযে আইন ইবাদত বাদ দিয়ে অন্য কোনো নফল বা ওয়াজিব বা ফরযে কিফায়াকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি নাতো? প্রিয় ভাই! বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন (সক্ষম সকলের উপর ফরয)। তাই অন্য কোনো ব্যাখ্যা না দিলেও এটাই তো ইসলামী শরীয়ত ও সময়ের নাজুকতার দাবী ছিল যে, যে যার অবস্থান হতে আমরা জিহাদের পতাকা উত্তোলন করবো, কিংবা জিহাদের প্রস্তুতি নিব, জিহাদের জন্য উম্মাহকে দাওয়াত দিব, যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করবো, যুদ্ধের মাঠ প্রস্তুত করব, ফরজে আইন মেহনত (জিহাদ)-কে ঠিক রেখে সম্ভব হলে দ্বীনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করে যাব, সম্ভব না হলে কেবল জিহাদের মেহনতই আজীবন করে যাব; তাইনা ভাই?

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা (দা-ঈ ভাইয়েরা) সবসময় একটি আত্মতুষ্টিতে ভুগি, সেটি হলো আমরা তো 'নবীওয়ালা কাজ' নিয়েই আছি। অনেক ভাইকে একথা বলতে শুনা যায়, একাজের সাথে আজীবন লেগে থাকতে হবে। অন্য কোনো মেহনত করা যাবে না।

'আজীবন কেবল দাওয়াতী মেহনতই করে যাওয়া'র পাক্কা নিয়ত করা- এটা তো প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদর্শ হতে পারে না!

যখন যে পরিস্থিতি, তখন শরীয়ত আরোপিত সে দায়িত্ব পালন করা, শরীয়তের চাহিদা পুরা করা- এটাই নববী আদর্শ।

তাছাড়া, আজীবন একটি মেহনতের সাথে জুড়ে থাকার নিয়ত সাহাবায়ে কেরামও করেছিলেন, তবে সেটি অন্য কোনো মেহনত ছিল না, সেটি ছিল 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্'র মেহনত! যেমন-

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ كَانَتْ الأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّـدَا *عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِيْنَا أَبَـدَا

: فَأَجَابَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ *فَأَكْرِمْ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দকে যুদ্ধের দিন আবৃত্তি করছিলেনঃ

"মুহাম্মদের ﷺ হাতে করেছি শপথ জিহাদের,
পিছু হটবনা কভু পূর্বে মউতের।"

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর উত্তর দিয়ে বললেনঃ

"হে আল্লাহ্! পরকালের সুখ হচ্ছে প্রকৃত সুখ;
তাই তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মানিত কর।"

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৯৬১)

প্রিয় ভাই, আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না, নবীওয়ালা কাজ তো শুধু উম্মতকে ইসলামের সীমাবদ্ধ কিছু বিধি-বিধানের দিকে দাওয়াত দেয়ার নাম নয়, মাদরাসার খেদমত তথা দ্বীন শিক্ষা করা- শিখানো, তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি করা, মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া যেমন নবীওয়ালা কাজ, ঠিক তেমনিভাবে জিহাদের প্রয়োজনে সর্বশক্তি আর জান-মাল দিয়ে জিহাদ করাটাও নবীওয়ালা কাজ, নববী আদর্শ। তবে, আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, বর্তমানে কোন নবীওয়ালা কাজটা অধিক জরুরী, কোনটি ফরযে আইন! আমার মন মত মেহনত- সেটা আল্লাহ পাকের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। শরীয়তের বিধান হল, আমরা যেন ফরযে আইন বাদ দিয়ে ফরযে কিফায়া, ওয়াজিব, সুন্নত বা নফল নিয়ে ব্যস্ত না থাকি। বরং, ফরজে আইন দায়িত্ব পালন করার পর সামর্থ্য থাকলে ফরজে কিফায়া, সুন্নত, নফল আমল বা মেহনতে সময় দেয়া। তা না পারলে কমপক্ষে ফরজে আইন মেহনতই আঞ্জাম দিতে থাকা।

প্রিয় ভাই! মেহনতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে শরীয়তের মেজাজ ও চাহিদা বুঝতে হবে। কখন আল্লাহ পাকের কী হুকুম সেটা মানার নামই 'আনুগত্য'। যখন যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতিতে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার নামই শরীয়ত, আর এভাবে শরীয়ত মেনে চলাই প্রকৃত দ্বীন। সব সময় বা আজীবন কিংবা কোথায় শরীয়তের কোন্ হুকুম, তা লক্ষ্য না রেখে নির্দিষ্ট একটি আমল বা কাজ বা মেহনতে লেগে থাকাটা শরীয়তের মর্জির সাথে মুয়াফিক নয়। আর, যখন আল্লাহ্ পাকের যেই হুকুম তা পুরা করতে না পারলে, ভয় হয়, সেটি দ্বীনদারী না হয়ে দ্বীনের নামে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পুরা করা হয়ে যেতে পারে। (আল্লাহ্ পাক আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।)

• জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াত:

মুহতারাম ভাই!

যদি আমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করাকেই নিজের জীবনের ব্রত বানিয়ে থাকি, তাহলে বলছি, যদি দাওয়াতী মেহনতের উদ্দেশ্য হয়, আমার ঈমান কিভাবে বনে, আমার যিন্দেগী কিভাবে বদলায়, উম্মতের ময়দানে কিভাবে আল্লাহর কালাম বুলন্দ হয়ে যায়, কিভাবে বান্দা মাখলুকের গোলামী ছেড়ে এক আল্লাহর গোলামী করে, কিভাবে আল্লাহ পাকের সাথে বান্দার তা'আল্লুক (সম্পর্ক) হয়ে যায়; তাহলে বলব, জিহাদ ঈমান ও ইসলামের চূড়া, জিহাদ আমার যিন্দেগীর এসলাহ আরো বেশি করবে, আল্লাহর কালাম বেশি বুলন্দ হবে, জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহর সাথে সবচেয়ে বেশি তা'আল্লুক হয়, জিহাদই বান্দাকে সবচেয়ে বেশি গাইরুল্লাহর গোলামীর শৃঙ্খল ছিন্ন করে এক

আল্লাহর গোলামী করতে শিখায়, আর জিহাদ নিজেই সবচেয়ে বড়ো 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ', জিহাদ নিজেই সবচেয়ে বড় 'দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্'। কারণ জিহাদের দ্বারা কুফর, শিরক, বাতিল ও যাবতীয় ফেতনা যত দ্রুত ও কার্যকরী ভাবে সমাজ থেকে দূর হয় এবং তার স্থলে আল্লাহর দীন মানুষের যিন্দেগীতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা অন্য কোনো ভাবে সম্ভব নয়।

এর প্রমাণ, নবুয়ত প্রাপ্তির পর মাক্কী যিন্দেগীতে শুধু দাওয়াতের মেহনত ছিল, জিহাদ ছিল না, তখন মক্কা-মদীনা মিলে তের বছরে মাত্র দেড় থেকে দুই হাজার মুসলমান হয়েছিলেন। আর হিজরতের পর যখন জিহাদ ফরয করা হলো, তখন মাত্র দশ বছরে লক্ষ লক্ষ সাহাবী তৈরী হয়ে গেলেন।

আল্লাহর রাসূলের মাক্কী যিন্দেগী আমাদেরকে যেন এই শিক্ষাই দেয় যে, দেখ! দেখ! পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ আখলাক নিয়ে, সর্বাপেক্ষা ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে, আরবের শ্রেষ্ঠ বক্তা বা বাগ্মী হয়েও, দু-জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ-অলী আর আল্লাহ্ওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও তের বছরের দাওয়াতে মক্কায় মাত্র তিন শতের মত মানুষ মুসলমান হল। সুতরাং কেবল দাওয়াত দেওয়াই দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসার আর প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়।

অন্যদিকে, আল্লাহর রাসূলের মাদানী যিন্দেগী আমাদেরকে শিক্ষা দেয়, দেখ! দেখ! পৃথিবীর সর্বশেষ্ঠ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ আখলাকওয়ালা নবী, সর্বাপেক্ষা রহমদিলওয়ালা নবী, তরবারীর নবী, মালহামার (মহাযুদ্ধের) নবী যখন তরবারি হাতে নিলেন, কাফের ও মুনাফেকদের প্রতি কঠোর হলেন, তখনই ইসলামের বিজয় সূচিত হল, ফলে আল্লাহর বান্দারা প্রকৃত ইসলামের স্বাদ পেল, আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা পেল, দিকে দিকে মানুষ ইসলামের প্রকৃত রূপ বুঝতে পারল আর ইসলামে দলে দলে দাখিল হতে লাগল।

আল্লাহর রাসূলের ﷺ ওফাতের পর মাত্র দশ বছরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে "আক্রমণাত্মক (ইকদামী) জিহাদের" মাধ্যমে সিরিয়া, ইরাক, মিশর, রোম, পারস্য জয় হয়ে ইসলাম অর্ধপৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দিকে দিকে মানুষ ইসলামের পরিচয় পেয়ে তার সত্যতা অনুধাবন করে তার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে শুরু করে, আর এটি এজন্য যে মানুষ সাধারণত পৃথিবীর পরাশক্তিদের দ্বারা সবসময়ই প্রভাবিত হয়, তাদের কৃষ্টি-কালচার, সংস্কৃতি, আকীদা-বিশ্বাস সহজেই গ্রহণ করে; মানুষ কখনো পরাজিত জাতির দীন ও মানহাজকে গ্রহণ করেনা। নবুয়ত এবং খুলাফায়ে রাশেদার যামানায় এটি কোন্ দাওয়াতের বরকতে সম্ভব হয়েছিলো? তা জিহাদ নয়কি?

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ– وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

"যখন আসবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও বিজয়, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।" (১১০ সূরা নছর:১-২)

প্রিয় ভাই, দাওয়াত হচ্ছে মানুষকে (কুফর/শিরক/অন্যান্য) ফেতনা থেকে আল্লাহর দিকে ডাকার জন্য (এতে হয়তো কিছু মানুষ দ্বীনের সন্ধান পাবে), আর জিহাদ হচ্ছে সমাজ থেকে সেই ফেতনাকে নির্মূল করার জন্য (ফলে সকল মানুষ দ্বীনের ছায়া পাবে)।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ

"আর তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকো, যে পর্যন্ত না সকল ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (৮ সূরা আনফাল: ৩৯)

তাই ভাই, আমরা কি বলতে পারিনা, জিহাদ-ই সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াত?

অতএব, আমরা যদি দাওয়াতের কাজ করতে ভালোবাসি, তাহলে তো জিহাদ করা-কে আরো বেশি ভালোবাসা উচিত, তাইনা ভাই?

তাছাড়া, আল্লাহর রাসূলের ﷺ মাদানী যিন্দেগীতে দাওয়াত ও জিহাদের কাজ উভয়টিই একসাথে চলেছিল, তাই আমাদেরকে 'শুধু দাওয়াত' নয়, জিহাদ-ও করতে হবে, ইনশাআল্লাহ্।

• কুরআন ও হাদীসের তাহরীফ করছি নাতো!

আরেকটি দুঃখজনক বিষয় হলো, আমরা যারা দাওয়াতের মেহনত করি, তাদের কেউ কেউ জিহাদের আয়াত ও 'আল্লাহর রাস্তা'র ফাযায়েল সম্বলিত হাদীসসমূহকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। এটি দ্বীনের এক প্রকার বিকৃতি (তাহরীফ)।

যদিও এর দ্বারা কিছু ফায়দা হচ্ছে, "মানুষ দাওয়াতের দিকে ঝুঁকছে", কিন্তু এর 'ক্ষতি' লাভের চেয়ে অনেক বেশি, এর পরিণতি মারাত্মক, আর এর দ্বারা উম্মাহর জিহাদী চেতনার অবস্থা দাঁড়িয়েছে ভয়াবহ, "হায়! মানুষ জিহাদকে ভুলে গিয়েছে। দাওয়াতের ময়দানকে জিহাদের ময়দান মনে করা শুরু করেছে। জিহাদ না করেও জিহাদের সওয়াব পাচ্ছে বলে বিশ্বাস করা শুরু করেছে। ফলে উম্মাহ্ প্রকৃত জিহাদকে ভুলে যেতে শুরু করেছে।"

আবার, অনেক ভাই আছি যারা দাওয়াতকেই জিহাদ ভাবা শুরু করে দিয়েছি।

প্রিয় ভাই!

স্বীকার করছি, 'আল্লাহর রাস্তা' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। যে ইলম হাছিল করছে, যে আত্মশুদ্ধির মেহনত করছে, যে দাওয়াত দিচ্ছে, যে জিহাদ করছে, যে মসজিদে নামায পড়তে যাচ্ছে, যে হজ্জ করতে যাচ্ছে ইত্যাদি, শাব্দিক অর্থে সকলকেই 'ফী সাবিলিল্লাহ' তথা 'আল্লাহর রাস্তার পথিক' বলা যায়। কিন্তু আমাদেরকে তাকাতে হবে সাহাবাদের দিকে, তাবেয়ীদের দিকে, তাবে-তাবেয়ীদের দিকে, ফুকাহাগণের দিকে; তাঁরা 'ফী সাবিলিল্লাহ'র আয়াত ও হাদীস দ্বারা কী বুঝতেন। তাঁরা সাধারণভাবে 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'-ই বুঝতেন।

سَبِيل اللَّهِ :التَّعْرِيفُ

وَسَبِيل اللَّهِ فِي أَصْل الْوَضْعِ هُوَ :الطَّرِيقُ الْمُوَصِّلَةُ إِلَيْهِ تَعَالَى، فَيَدْخُل فِيهِ كُل سَعْيٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيل الْخَيْرِ.وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ الْجِهَادُ.

'ফী সাবীলিল্লাহ' এর পরিচয়:

শাব্দিক অর্থে 'ফী সাবীলিল্লাহ' হল- যে রাস্তা আল্লাহ তা'আলার দিকে পৌঁছে দেয়। সুতরাং এর মাঝে আল্লাহর আনুগত্য ও কল্যাণের পথের সব চেষ্টাই অন্তর্ভূক্ত হবে।

আর পারিভাষিক অর্থে 'ফী সাবীলিল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল জিহাদ।

(সূত্র: মুখতারুস সিহাহ, বাদায়িউস সানায়ে' ২/৪৫-৪৬, ফাতহুল কাদীর ২/২৫০, ইবনে আবেদীন ২/৬০, নিহায়াতুল মুহতাজ ৬/১৫৮, কালউবী ৩/১৯৮, রউজুল তালেব ২/৩৯৮, আলমুগনী ৬/৪৩৫, কাশশাফুল কিনা' ২/২৮৩)
[আলমাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়াইতিয়্যাহ, খণ্ড: ২৪, পৃষ্ঠা: ১৬৬]

প্রিয় ভাই! 'ফী সাবীলিল্লাহ' শব্দটি কুরআন হাদীসে জিহাদ ছাড়াও অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিহাদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কুরআন হাদীসে বর্ণিত 'ফী সাবীলিল্লাহ' এটা জিহাদ ছাড়া অন্য কোন

অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার আলামত না পাওয়া গেলে বুঝতে হবে, ব্যাপকভাবে এটা জিহাদের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ শাব্দিক অর্থে ব্যাপকতা থাকলেও পারিভাষিক অর্থে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'জিহাদ'।

'জিহাদের ক্ষেত্রে কোন্ অর্থ নেয়া হবে? সাধারণ অর্থ, নাকি পারিভাষিক অর্থ?

প্রিয় ভাই! আবার খেয়াল করুন, ইসলামের প্রায় প্রতিটি আমলের জন্য ব্যবহৃত শব্দের দুটি করে অর্থ বিদ্যমান। একটি সাধারণ অর্থ; অপরটি পারিভাষিক অর্থ। তেমনিভাবে, 'জিহাদ' শব্দটিরও একটি সাধারণ অর্থ এবং একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। "জিহাদের" সাধারণ অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, শরীয়তের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের কালিমা বুলন্দ করার জন্য যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্ট ও মুশাক্কাত সহ্য করা হয় তাই জিহাদ, তা যে কোনো পথেই হোক বা যে কোনো পন্থায়ই হোক না কেন।

কিন্তু "জিহাদ" যা শরীয়তের একটি পরিভাষা, তার অর্থ হলো, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করা, মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা ও কাফের মুশরিকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা। এটিই জিহাদের শরয়ী অর্থ। (কিতাবুল জিহাদের ভূমিকা, মাওলানা আব্দুল মালেক হাফি.পৃ. ২৪; লিংক: https://archive.org/details/kitabuljihad_202210)

এখন প্রশ্ন হলো আমরা কোন্ অর্থকে গ্রহণ করবো, আগেরটা না পরেরটা, নাকি দুটাই? আমাদেরকে খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, শরীয়তের কোনো একটি পরিভাষার ক্ষেত্রে সাধারণ অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়, শরীয়তের পারিভাষিক অর্থই গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক। 'যাকাত' এর সাধারণ অর্থ 'পবিত্র করা'। ওযু করে পবিত্রতা হাছিল করলেই "যাকাত" আদায় হবে না। শরীয়তের পরিভাষায় "যাকাত" বলতে আমরা শুধু পবিত্র করা বা হওয়া বুঝি না, আমরা বুঝি 'যার নেসাব পরিমাণ মাল এক বছর অতিবাহিত হবে, তার সম্পদের আড়াই শতাংশ কুরআনে বর্ণিত সাত শ্রেণির উপযুক্ত হকদার ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে সম্পদকে পবিত্র করা।'

আবার দেখুন 'সিয়াম' (রোযা) অর্থ সংযমী হওয়া বা বিরত থাকা। একজন লোক চুরি করা বা মিথ্যা বলা থেকে সংযমী হলো বা বিরত থাকল, তাতেই কি তাকে 'সায়িম' (রোযাদার) বলা যাবে? না। যে ব্যক্তি সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকল, তাকেই কেবল শরীয়তের পরিভাষায় 'সায়িম' (রোযাদার) বলা হবে।

একই ভাবে 'সালাত' (নামায) শব্দের অর্থ 'দুআ বা আশীর্বাদ' কিংবা 'নিতম্ব হেলানো'। শুধু দুআ করলেই কিংবা নিতম্ব হেলালেই কি নামায আদায় হয়ে যাবে? হবে না।

এখন, কেউ যদি শরীয়তের পারিভাষিক অর্থকে গ্রহণ না করে কেবল সাধারণ অর্থকে নিয়ে দাবী করে, আমি ওযু করে পাক-সাফ হয়েছি, তাই আমার আর যাকাত দেয়া লাগবে না, তাহলে সে 'তাহরীফ' (শরীয়তের বিধানের বিকৃতি) সাধন করল; কেউ যদি বলে আমি সারাদিন মিথ্যা বলা থেকে বিরত রয়েছি, তাতেই আমার রোযা হয়ে গেছে কিন্তু সে খানাপিনা ও স্ত্রী-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকেনি, তাহলে সেও তাহরীফ করল; একইভাবে, কেউ যদি কেবল দুআ করে বা নিতম্ব হেলিয়েই দাবী করে আমার নামায আদায় হয়ে গিয়েছে, তাহলে সেও 'তাহরীফ' করল। আর শরীয়তের বিধানের ক্ষেত্রে এ ধরনের 'তাহরীফ' করার দ্বারা ক্ষেত্র বিশেষে অনেক সময় 'কুফর' পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে, যা ব্যক্তিকে ইসলামের গন্ডি হতে বেরও করে দিতে পারে।

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রাদি. এর যামানায় রিদ্দার ঘটনা থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যারা যাকাত কার কাছে হস্তান্তর করবে এই ব্যাপারে ‘তাবীল’ (ভুল ব্যাখ্যা) করে। আর এই ‘তাহরীফ’-এর ফলস্বরূপ তারা আল্লাহ্ পাকের একটি ফরয বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং যাকাত না দেয়ার ঘোষণা দেয়। ফলে আল্লাহর রাসূলের খলীফা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা এগুলো বুঝি, কিন্তু জিহাদের ক্ষেত্রে আমরা জিহাদের অর্থ ‘যুদ্ধ ও যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম’ বাদ দিয়ে অন্য অর্থ তালাশ করি। আমরা কেন জানি ভুলে যাই, শরীয়তের অন্যান্য হুকুমের মত জিহাদের ক্ষেত্রেও সাধারণ অর্থকে নেয়া যাবে না, শরয়ী অর্থই নিতে হবে। জিহাদের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করে দাওয়াতকে ‘জিহাদ’ বলা যাবে না, তাযকিয়াকে ‘জিহাদ’ বলা যাবে না, ইসলামের উপর কেবল কিছু লেখালেখি করে তাকে ‘জিহাদ’ করা বলা যাবে না। এতে ‘তাহরীফ’ (দ্বীনের বিকৃতি) হবে।

প্রিয় ভাই! আমরা সলাত আদায়ের ফাযায়েলগুলিকে কি সিয়ামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি? সিয়ামের ফাযায়েলগুলিকে কি হজ্জের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি? যদি না করি, তাহলে জিহাদের ফাযায়েলগুলিকে কেন দাওয়াতের মধ্যে টেনে আনি?

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ:

আমরা নিরপেক্ষভাবে নবীজীর ﷺ সীরাত আর সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগী পর্যালোচনা করি। তাহলে আমরা দেখতে পাব, সাহাবায়ে কেরাম জিহাদ বলতে “সশস্ত্র যুদ্ধ”-কেই বুঝতেন, ‘যুদ্ধ করা’ ব্যতীত তাঁরা কখনো জিহাদের অন্য কোনো অর্থ করেননি। খোদ নবী করীম ﷺ-ও জিহাদের ব্যাখ্যা সশস্ত্র যুদ্ধ-ই করেছেন।

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ....قَالَ وَمَا الْجِهَادُ قَالَ أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ اِذَا لَقِيْتَهُمْ قَالَ فَأَيُّ الْجِهَادُ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيْقَ دَمُهُ

আমর ইবনে আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, জিহাদ কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যখন তাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হয়। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল: কোন জিহাদ সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, “ঐ ব্যক্তির জিহাদ সর্বোত্তম যার ঘোড়া যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়েছে এবং সে নিজেও বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদাত বরণ করেছে।” (জামিউল আহাদীস ১০১৪৪, আহমদ ১৭০২৭, ত্বাবরানী)

এই হাদীসে স্বয়ং রাসূল ﷺ-ই বলে দিলেন জিহাদ কাকে বলে। এরপর জিহাদকে অন্যত্র টেনে নেয়ার আর কোনো সুযোগ আছে কি?

প্রিয় ভাই! মদীনার অলীতে-গলীতে যখন حَيَّى عَلَى الْجِهَادِ (জিহাদের দিকে আস) এই আযান দেয়া হত, তখন কি সাহাবায়ে কেরাম দাওয়াত দেয়ার জন্য বের হতেন? তখন কি তারা জায়নামায আর তসবীহ নিয়ে যিকিরের মজমা কায়েম করার জন্য বের হতেন? নাকি তারা মিটিং-মিছিল করার জন্য বের হতেন? নাকি তারা নফসের জিহাদ, কলমের জিহাদ, বক্তৃতার জিহাদ ইত্যাদি করেই ক্ষান্ত হয়ে যেতেন? বরং তারা কি লোহার পোশাক পরে, তীর-ধনুক, তরবারী আর বর্শা নিয়ে উটে কিংবা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হয়ে ছুটে আসতেন না? সুতরাং একথা সুস্পষ্ট হল, জিহাদ বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তীতে সকল মুহাদ্দিসীনে কেরাম, ফুকাহায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীনগণ যুদ্ধ করাকেই বুঝতেন।

প্রিয় ভাই! “তা‘লীম, তাযকিয়া, দা‘ওয়াত ও তাবলীগ, ওয়াজ নসীহাত ইত্যাদি করা ‘আমর বিল মা‘রুফ’ সৎকাজের আদেশ ও ‘নাহী আনিল মুনকার’ অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার একেকটি নতুন পদ্ধতি হতে পারে। আর এসবই

স্ব-স্ব স্থানে কাম্য, বরং এসব কর্মপ্রচেষ্টার প্রত্যেকটাই খেদমতে দীনের একেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন ফাযায়েল, ভিন্ন আহকাম ও ভিন্ন মাসায়েল রয়েছে। এসবের কোনটিকেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। আবার কোনটাই এমন নয় যা পারিভাষিক জিহাদের অন্তর্ভূক্ত করা যায় বা তার ব্যাপারে জিহাদের ফাযায়েল ও আহকাম আরোপ করা যায়।" (হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা., 'কিতাবুল জিহাদ' কিতাবের ভূমিকা: পৃ. ৩৭)

রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন,

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

"যে আমার নামে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে লিখে নেয়।" (বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০,২০২; মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃ. ১০)

প্রিয় ভাই! সতর্ক হই!

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল আয়াত ও হাদীস দ্বারা জিহাদ করার ফাযায়েল বর্ণনা করেছেন, উদ্দেশ্য ছিল উম্মাহকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, নিয়ত ছিল উম্মাহ্ যেন জিহাদ করে, ক্বিতাল তথা যুদ্ধ করে, সে সকল আয়াত ও হাদীসের অর্থ পরিবর্তন করে অন্যত্র ব্যবহার না করি, জিহাদের ফাযায়েলকে দাওয়াতের মধ্যে টেনে না আনি, এতে দ্বীন বিকৃতি, তাহরীফ ও বিদ্আতের গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করি! আল্লাহর রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করা হয়ে যায় কিনা ভয় করি! জাহান্নামকে ভয় করি!!

দয়াকরে নিচের হাদীসগুলো এবং জিহাদের ফাযায়েল সম্বলিত অন্যান্য হাদীসগুলোকে দাওয়াতের মধ্যে ব্যবহার বন্ধ করি। আল্লাহর দোহাই!!!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

" لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ".

"আল্লাহর পথে একটা সকাল কিংবা একটা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সমস্ত জিনিস (এর অধিকারী হওয়া কিংবা তা সাদাকা করার সওয়াব) হতে অধিক উত্তম।" (বুখারী-২৭৯২ ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَوْ قُوْفُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ رَجُلٍ سِتِّيْنَ سَنَةً

"সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এক সকাল কিংবা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে নিয়োজিত রাখাটা গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সমস্ত জিনিস হতে উত্তম। আর তোমাদের কারোও যুদ্ধের ময়দানে কাতার বন্দী হওয়া ষাট বৎসরের নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।" (মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক-৫/২৫৯, হাদীস নং-৯৫৪৩)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الحَجَرِ الْأَسْوَدِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "আল্লাহর পথে একটি মুহূর্ত অবস্থান করা কদরের রাতে হাজরে আসওয়াদকে সামনে নিয়ে ইবাদত করার চাইতে উত্তম।" (ইবনে হিব্বান ১৫৮৩, ইবনে আসাকির, বায়হাকী)

আমার প্রিয় ভাই! আল্লাহর ওয়াস্তে বলি- এই হাদীসগুলো আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের ফাযায়েল বর্ণনা করে। দাওয়াতের নয়। গাশতে বেরিয়ে কোন মুসলমানের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও এই সওয়াব হাছিল হবে এমনটি আশা না করি!

وَعَن أَبِي يَحيَى خُرَيْمِ بنِ فَاتِكٍ رضي الله عنه، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُمِئَةِ ضِعْفٍ.

প্রিয় রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) কিছু ব্যয় করে, তার আমলনামায় তার সাত শত গুণ লেখা হয়ে থাকে।" (তিরমিযী-১৬২৫ ও নাসাঈ-৩১৮৬)

এটি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য ব্যয় করার ফযীলত। দয়া করে, এই হাদীসকে অন্যত্র ব্যয়ের ফাযায়েল হিসেবে ব্যবহার না করি।

رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام ألف يوم، وقيام ألف ليلة

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত প্রহরা দেয়া হাজার দিন রোযা রাখা এবং হাজার রাত্রি ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।" (তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন, "আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত প্রহরা দেয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার উপর সমস্ত সম্পদের চেয়ে উত্তম।" (তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)

এই হাদীসগুলো সীমান্ত পাহারা দেয়ার ফাযায়েল বর্ণনা করে, মারকাজের পাহারাদারির নয় ভাই। আল্লাহর দোহাই! এভাবে জিহাদের ফাযায়েলকে অন্যত্র ব্যবহার করে উম্মাহকে বিভ্রান্ত না করি। মরদুদ শয়তান যেন আমাদেরকেও বিভ্রান্ত না করতে পারে!

প্রিয় ভাই! হ্যাঁ, একথা অস্বীকার করছি না- আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে উক্ত ফাযায়েল ও সওয়াব দ্বীনের অন্যান্য শাখায় মেহনত করলেও দিতে পারেন, এটা তাঁর দয়া ও অফুরন্ত করুণার বহিঃপ্রকাশ হবে। তিনি চাইলে আরো অনেক বেশি দিতে পারেন, বা আরো অনেক কিছু করতে পারেন। কিন্তু এ হাদীসগুলো আল্লাহর রাসূল ﷺ দাওয়াতের বা অন্যান্য মেহনতের ফাযায়েল বর্ণনা করতে গিয়ে কোনদিনও বর্ণনা করেননি। অন্য কোনো মেহনতের মাধ্যমে জিহাদের ফাযায়েল লাভ হবে, এমনটি কুরআন-হাদীসের কোথাও বর্ণনা করা হয়নি। বরং উল্টো বর্ণনা এসেছে ভাই! অন্য কোনো আমল বা মেহনত করে কস্মিনকালেও জিহাদের সমান সওয়াব লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন-

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِيْ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ :يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ أُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَقَالَ كَمْ مَالُكَ؟ قَالَ سِتَّةَ الاَفِ دِيْنَارٍ، فَقَالَ لَوْ أَنْفَقْتَهَا فِيْ طَاعَةِ اللهِ لَمْ تَبْلُغْ غُبَارَ شِرَاكِ نَعْلِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَأَتَاه رَجُلٌ فَقَالَ :يَا رَسُوْلَ اللهَ أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ أُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَقَالَ لَوْ قُمْتَ اللَّيْلَ وَصُمْتَ النَّهَارَ لَمْ تَبْلُغْ نَوْمَ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আমার সম্পদ দান করি, তাহলে কি আল্লাহর পথে মুজাহিদদের আমলে পৌঁছতে পারব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার সম্পদের পরিমাণ কত? লোকটি বলল, ছয় হাজার দিরহাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই সম্পদ যদি আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পথে দান করে দাও তবেও একজন মুজাহিদের পায়ের নিচে জুতার বালি সমপরিমাণ হতে পারবে না। অন্য এক ব্যক্তি এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে এমন কিছু আমল বর্ণনা করে দিন যার দ্বারা আমি মুজাহিদের আমলের সমপর্যায়ে পৌঁছব! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যদি তুমি সারা রাত্র নামায পড় আর দিন ভর রোযা রাখ তবেও মুজাহিদগণের ঘুমের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না। (সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর-২/১৫০)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ " لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ " . فَرَدُّوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ " لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ " . فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করে, একদা রাসূলে আকরাম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল, "কোন কাজটি সওয়াবের দিক থেকে আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য?" রাসূলে আকরাম ﷺ বললেন, তোমরা সে কাজের মতো শক্তির অধিকারী নও।" সাহাবায়ে কেরাম দুই কিংবা তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূলে আকরাম ﷺ প্রতিবার এটাই বলছিলেন, "তোমাদের এরূপ করার মতো শক্তি-সামর্থ্য নেই। এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত থাকে তার দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে রোযা রাখে, কিয়াম করে, আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে, এবং নামায-রোযার ব্যাপারে গাফিল থাকে না (অনবরত করতেই থাকে যতক্ষণ না); মুজাহিদ জিহাদ শেষে বাড়িতে ফিরে আসে।" (বুখারী-২৮৯৬ ও মুসলিম, তিরমিজি)

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ " لاَ أَجِدُهُ - قَالَ - هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ ". قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ

বুখারীর আরেক বর্ণনা হল: এক ব্যক্তি নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমায় এমন কোনো আমলের কথা বলুন যা জিহাদের সমতুল্য? তিনি ﷺ বললেন, "আমি এমন কোনো আমল তো দেখছি না।" তারপর আবার বললেন, "তুমি কি এতটা শক্তির অধিকারী, যখন জিহাদকারী আল্লাহর পথে বের হয়, তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে, অতঃপর (মুজাহিদ ফিরে আসার আগ পর্যন্ত) নামায পড়তে থাকবে, এবং গাফলতি করবে না এবং রোযা রাখবে কিন্তু (মুজাহিদ ফিরে আসার আগ পর্যন্ত) ইফতার করবে না।" সে ব্যক্তি বললেন, "এ কাজ করার ক্ষমতা কার আছে?" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৭৮৫)

সুতরাং ভাই! জিহাদ না করে অন্য আমল বা মেহনতের মধ্যে জিহাদের সমান ফাযায়েল লাভ করার স্বপ্ন দেখা বোকামি নয় কি? ইসলামের প্রতিটি আমলের আলাদা ফাযায়েল রয়েছে। যে যেই আমল যতটুকু করছি, সে সেই আমলের ততটুকু সওয়াব-ই আশা করব, ইনশাআল্লাহ।

তাই, আসুন ভাই, জিহাদের ফাযায়েল ও মুজাহিদের মর্যাদা লাভ করার জন্য আজ থেকেই জিহাদী মেহনতে নেমে পড়ি, ইনশাআল্লাহ।

• বর্তমানে কি মক্কী যামানা চলছে (?)

অনেক ভাইদের মুখে শুনা যায়, বর্তমানে (আল্লাহর রাসূলের মাক্কী যামানার ন্যায়) মাক্কী যামানা চলছে, তাই এখন শুধু দাওয়াত চলবে। পরিবেশ তৈরি হলে বা ইমাম মাহদী আসলে (মাদানী যামানা শুরু হবে, তখন) জিহাদ শুরু হবে আর আমরা জিহাদে জুড়ে যাব!

প্রিয় ভাই! বর্তমান সময়ে এই কথা বলার আর মোটেও সুযোগ নেই। একথা এজন্য বলা যাবে না, কারণ, মাক্কী যিন্দেগীতে জিহাদ ফরয ছিল না, বরং জিহাদের হুকুমই নাযিল হয়নি। কিন্তু বর্তমানে প্রতিটি মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে আছে। আবারো বলছি, ইসলামের বিধান পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। যারা বলবেন, বর্তমানে মাক্কী যিন্দেগী চলছে, তাদের ঈমান-হারা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, তারা এসকল উক্তির দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর একটি ফরয বিধান, কেবল জিহাদকেই অস্বীকার করছেন। প্রশ্ন আসতে পারে, কিভাবে? কেননা, বর্তমানে যদি মক্কী যামানাই হয়, তাহলে আমরা সিয়াম (রোযা) কেন পালন করি? রমাযান মাসের রোযা তো আল্লাহর রাসূলের মাক্কী জীবনে ছিলনা!

বর্তমানে তাহলে হজ্জ কেন করবো? মাক্কী জীবনে তো হজ্জের বিধান ছিল না!

আমরা পর্দা কেন করবো? মাক্কী যিন্দেগীতে তো পর্দার বিধান ছিল না।
যদি আমার সেই সব ভাইদের কথা মতো মেনে নেয়া হয়, বর্তমানে মাক্কী যামানাই চলছে, তাহলে মাক্কী যিন্দেগীতে তো মদ হালাল ছিল, তাই বলে কি এখন মদ হালাল হবে?
প্রিয় ভাই! মাক্কী যিন্দেগীর দোহাই দিয়ে আমরা অন্য কোনো আমল কেন বাদ দেই না? বুঝা গেল, মাক্কী যিন্দেগীর দৃষ্টান্ত শুধু জিহাদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়।
আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে হেফাযত করুন এবং দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

• তাবলীগের অনুমতি পেয়ে যাওয়াই কি জিহাদ পরিত্যাগের জন্য যথেষ্ট?

এই প্রশ্নের জবাবে হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা. 'কিতাবুল জিহাদ' কিতাবের ভূমিকায় ৪০-৪৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেন- ('কিতাবুল জিহাদ' কিতাবের লিংক: https://archive.org/details/kitabuljihad_202210)
কোনো কোনো ভাইয়ের এমন ভুল ধারণাও আছে যে, কোনো অমুসলিম সরকার তার দেশে তাবলীগের অনুমতি দিলে তাদের সাথে ইক্বদামী (আক্রমণাত্মক) জিহাদ করা জায়েয নয়! এ জাতীয় ভুল ধারণার শিকার এক ব্যক্তি হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তক্বী উসমানী (দাঃ বাঃ)-কে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেন। হযরত মাওলানা পত্র লিখকের ভ্রান্তি দূর করেন এবং এ বিষয়ে শরয়ী নির্দেশনার ব্যাপারে তাকে অবহিত করেন। তাঁর পুরো উত্তর 'ফিক্বহী মাক্বালাত" খণ্ড ৩ পৃঃ ২৮৭-৩০৪ এ মুদ্রিত আছে। প্রিয় ভাই! হযরতের উত্তরের নির্বাচিত অংশ আপনাদের সামনে পেশ করা হল:
"আপনি জিহাদের ব্যাপারে যা লিখেছেন তার সারাংশ আমি এই বুঝি যে, কোনো অমুসলিম সরকার তার দেশে তাবলীগের অনুমতি প্রদান করলে অতঃপর তার সাথে আর জিহাদ করা জায়েয থাকে না। যদি এই আপনার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে আমি আপনার সাথে একমত নই। ইসলাম প্রচারের পথে প্রতিবন্ধকতা শুধু এই নয় যে, সরকার ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে আইনী নিষেধাজ্ঞা জারী করে, বরং মুসলমানদের বিপরীতে কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র অধিক প্রতিপত্তির মালিক হওয়াও দ্বীনে হক্ব এর প্রচারে অনেক বড় বাধা। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে তাবলীগের ব্যাপারে কোনো আইনী নিষেধাজ্ঞা নেই, কিন্তু পৃথিবীতে তাদের বর্তমান প্রতিপত্তির কারণে বিশ্বব্যাপী সাধারণভাবে এমন একটি মানসিকতা তৈরি হয়ে গেছে যা সত্য প্রচারের ব্যাপারে কোনো আইনী নিষেধাজ্ঞার চেয়ে কোনো অংশে কম নয় বরং বেশি। এজন্য কাফেরদের প্রতিপত্তি চুরমার করা জিহাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম। যাতে করে তাদের বিদ্যমান এই প্রতিপত্তির কারণে যে মানসিক ভীতি (ও প্রভাব) মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীভূত হয় এবং সত্য গ্রহণের পথ উন্মুক্ত হয়। যতদিন পর্যন্ত তাদের এই প্রতিপত্তি বজায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত মানুষের মনে এই ভীতিও অটুট থাকবে এবং দ্বীনে হক্ব কবূল করার জন্য পুরোপুরি অগ্রসর হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভপর হবে না।
অতএব জিহাদ জারী থাকবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। [সুরা তাওবা - ৯:২৯]

উপর্যুক্ত আয়াতে ততদিন পর্যন্ত ক্বিতাল জারী রাখার আদেশ করা হয়েছে যতদিন না কাফেররা অবনত হয়ে জিযিয়া প্রদান করে। যদি ক্বিতালের উদ্দেশ্য শুধু তাবলীগের আইনী অনুমতি অর্জনই হত তবে বলা হত, 'যাবত না তারা তাবলীগের অনুমতি প্রদান করে'। কিন্তু জিযিয়া ওয়াজিব করা এবং এর পাশাপাশি তাদের অবনত হওয়ার উল্লেখ এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তাদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করাই আসল উদ্দেশ্য, যাতে কুফরের রাজনৈতিক প্রভুত্বের কারণে ভীতির যে পর্দায় মনমানস আচ্ছন্ন হয়ে আছে তা উন্মোচিত হয়, অতঃপর মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি স্বাধীন ও মুক্ত মনে চিন্তা করার সুযোগ ঘটে। ইমাম রাযী রহ. এই আয়াতের আলোচনায় তাফসীরে কাবীরে বলেন,

لَيْسَ الْمَقْصُوْدُ مِنْ أَخْذِالْجِزْيَةِ تَقْرِيْرُهُ عَلَى الْكُفْرِ- بَلِ الْمَقْصُوْدُ مِنْهَا حَقْنُ دَمِهِ، وَإِمْهَالُهُ مُدَّةً، رَجَاءَ أَنَّهُ رُبَمَّا وَقَفَ فِي هٰذِهِ الْمُدَّةِ عَلَى مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ، وَقُوَّةِ دَلَائِلِهِ، فَيَنْتَقِلُ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ ..... فَإِذَا أُمْهِلَ الْكَافِرُ مُدَّةً وَهُوَ يَشْهَدُ عِزَّالْإِسْلَامِ، وَيَسْمَعُ دَلَائِلَ صِحَّتِهِ، وَيُشَاهِدُ الذِّلَّ وَالصِّغَارَ فِي الْكُفْرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْمِلُهُ ذٰلِكَ عَلَى الْاِنْتِقَالِ إِلَى الْإِ سْلَامِ، فَهَذَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ مِنْ شَرْعِ الْجِزْيَةِ-

'জিযিয়ার উদ্দেশ্য কাফেরকে কুফরীর হালতে বাকী রাখা নয়, বরং উদ্দেশ্য হল তাকে বাঁচিয়ে রেখে কিছু দিন সময় দেওয়া, যে সময়ের মধ্যে তার ব্যাপারে এই আশা হবে যে, সে ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করে কুফর থেকে ইসলামের দিকে আসবে.......। অতএব যখন কাফেরকে কিছু দিন সময় দেওয়া হবে এবং সে ইসলামের প্রভাব দেখবে, তার সত্যতার দলীলসমূহ শুনবে এবং কুফরের লাঞ্ছনা দেখবে তখন এইসব বিষয় তাকে ইসলামের প্রতি অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে। বস্তুতঃ জিযিয়া বিধিবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য এটিই।'

দ্বিতীয় যে বিষয়টি ভাবার তা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবায়ে কেরামের যুগে কোথাও কি একটি নযীরও এমন পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবায়ে কেরাম কোনো রাষ্ট্রে জিহাদের পূর্বে কোনো তাবলীগী মিশন পাঠিয়েছেন এবং অপেক্ষা করে দেখেছেন যে, তারা তাবলীগী কাজ কর্মের অনুমতি দেয় কিনা? অতঃপর তাবলীগী কাজের অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জানানোর ক্ষেত্রেই শুধু জিহাদ করেছেন?....... বলা বাহুল্য এমনটি কখনো হয়নি। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এছাড়া আর কী ফলাফল বের করা সম্ভব যে, শুধু তাবলীগের অনুমতি লাভ করাই উদ্দ্যেশ্য ছিল না। অন্যথায় বহু রক্তক্ষয়ী লড়াই শুধু এই এক শর্ত দিয়েই বন্ধ করা সম্ভপর হত যে, মুসলমানদের তাবলীগের ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। কিন্তু অন্তত অধমের সীমাবদ্ধ অধ্যয়নে পুরো ইসলামী ইতিহাসের কোথাও এমন একটি ঘটনাও নেই যাতে এটুকু সুযোগ চেয়ে লড়াই বন্ধ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ এর পরিবর্তে কাদেসিয়ার যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ জিহাদ করার পিছনে নিজেদের যে উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছিলেন তা ছিল এই-

وَإِخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلٰى عِبَادَةِ اللهِ

'মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়োজিত করা।' (কামিল, ইবনে আসীর খণ্ড ২, পৃ. ১৭৮)

অনুরূপ কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায়; এবং যে সময় বিজয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়। [সুরা আনফাল - ৮:৩৯]

এই আয়াতের তাফসীরে আমার পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. লিখেন-
'দ্বীন অর্থ বিজয় ও কর্তৃত্ব। এই অর্থে আয়াতের তাফসীর এই হবে যে, মুসলমানদের জন্য কাফেরদের সাথে ঐ সময় পর্যন্ত লড়াই জারী রাখা উচিত যতক্ষণ না মুসলমানগণ তাদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ হয়ে যায় এবং দ্বীনে ইসলামের বিজয় অর্জিত হয়, যাতে সে অন্যদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে পারে।'
'এই তাফসীরের সারকথা হল, মুসলমানদের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দুশমনদের সাথে জিহাদ ও ক্বিতাল করা ওয়াজিব যতক্ষণ না মুসলমানদের উপরে তাদের অত্যাচারের ফিতনা বন্ধ হয় এবং ইসলাম সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হয় এবং এই অবস্থা ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সৃষ্টি হবে, তাই জিহাদের বিধানও ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।' [মা'আরিফুল কুরআন খণ্ড ৪, পৃ. ২৩৩]

মোটকথা, জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু তাবলীগের আইনগত অনুমতি লাভ করা নয়, বরং কাফেরদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করে মুসলমানদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা, যাতে একদিকে কোনো মুসলমানের প্রতি খারাপ দৃষ্টিতে তাকানোর সাহস তাদের না হয় এবং অন্যদিকে কাফেরদের প্রতিপত্তিতে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ এই মানসিক ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত মনে ইসলামের সৌন্দর্য অনুধাবন করতে আগ্রহী হতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে এই বিষয়টিও ইসলামের হেফাজতের উদ্দেশ্যই পূর্ণ করে। এজন্য যে উলামায়ে কেরাম জিহাদের জন্য 'হেফাযতে'র শব্দ অবলম্বন করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও তাই। মনে রাখতে হবে কুফরের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করা ও ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা হেফাজতে ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ। অতএব এই মৌলিক স্তম্ভটিকে 'হেফাযত' এর আওতা থেকে কোনভাবেই বের করা যায় না।'

আমার মতে সকল বড় বড় আলেম জিহাদের উদ্দেশ্য এই বিষয়কেই সাব্যস্ত করেছেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্দলবী রহ. লিখেন-

"জিহাদের আদেশ প্রদান করার পিছনে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এক মুহূর্তে সকল কাফেরের প্রাণ সংহার করা হবে, বরং উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর দ্বীন পৃথিবীতে কর্তৃত্ববান হবে, মুসলমান মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করবে এবং নিরাপত্তার সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে সক্ষম হবে। কাফেরদের ব্যাপারে এই আশংকা থাকবে না যে তারা দ্বীনের ব্যাপারে কোন অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। ইসলাম তার দুশমনদের অস্তিত্বের দুশমন নয়, বরং তাদের এমন প্রতিপত্তির দুশমন যা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য হুমকির কারণ হয়।" (সীরাতে মুস্তফা, খণ্ড ২ পৃ. ৩৮৮)
অন্যত্র লিখেন- "আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায়; এবং যে সময় বিজয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়। [সুরা আনফাল - ৮:৩৯]

এই আয়াতে এই ধরণের জিহাদই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে মুসলমান জাতি! তোমরা কাফেরদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করতে থাক, যখন আর কুফরের ফিৎনা বিদ্যমান না থাকে এবং আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই আয়াতে ফিৎনা বলতে কুফরের শক্তি ও প্রতিপত্তির ফিৎনা উদ্দেশ্য। এবং وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ থেকে দ্বীনের বিজয় ও কর্তৃত্ব উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে এসেছে لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ অর্থাৎ দ্বীনের এ পরিমান শক্তি ও কর্তৃত্ব অর্জিত হবে যে, কুফুরী শক্তির সামনে তার আর পরাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না এবং দ্বীন ইসলাম কুফরের ফিৎনা থেকে পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে যাবে। [প্রাগুক্ত খণ্ড ২ পৃ. ৩৮৬]

যদি শুধু তাবলীগের অনুমতি লাভের পর জিহাদের প্রয়োজন বাকী না থাকে তবে তো আজ দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই তাবলীগের অনুমতি আছে (এবং আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অনুমতি না থাকলে কিছু মুসলিম দেশেই নেই) অতএব বলতে হবে এখন আর মুসলমানদের জন্য অস্ত্র ধারণ করার প্রয়োজন নেই। বিশ্ববাসীর মন মগজে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বসতে থাকুক, তাদেরই নীতিমালা প্রচলিত হতে থাকুক, বিধি-বিধানও তাদেরই চলুক, তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও মতবাদই প্রচারিত হোক আর মুসলমানগণ শুধু এই নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকুক যে, ঐসব অমুসলিম দেশে আমাদের মুবাল্লিগগণের প্রবেশাধিকারতো আর বন্ধ হয় নাই! প্রশ্ন হয়, যে পৃথিবীতে কুফর তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের জয়ভেড়ী বাজিয়ে চলেছে সেখানে যদি আপনাকে তাবলীগের অনুমতি প্রদান করা হয়, তবে কয়জন লোক এমন পাবেন যারা এই তাবলীগকেই স্থির চিত্তে শোনার জন্য এবং তাতে চিন্তা ফিকির করার জন্য প্রস্তুত হবে?

যে পরিবেশে রাজনৈতিক শক্তি ও ক্ষমতার সাহায্যে ইসলাম ও তার শিক্ষার পুরো বিপরীত চিন্তা ভাবনা পূর্ণ শক্তিতে প্রচারিত হচ্ছে এবং এসবের প্রচারের জন্য এমন সব মাধ্যমও ব্যবহৃত হচ্ছে যা মুসলমানদের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, সেখানে তাবলীগের অনুমতি লাভ হলেও তা কী পরিমাণ ফলদায়ক হতে পারে?

হ্যাঁ যদি ইসলাম ও মুসলমানদের এমন শক্তি সামর্থ অর্জিত হয়ে যায় যার মোকাবেলায় কাফেরের শক্তিমত্তা পরাস্ত হয় বা অন্তত তারা ঐ ফিৎনা সৃষ্টি করতে সক্ষম না হয় যা ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে তো সেক্ষেত্রে অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে নিরাপত্তা চুক্তির মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখা জিহাদের বিধানের পরিপন্থি নয়। অনুরূপ যে পর্যন্ত কুফরের প্রতিপত্তি নির্মূল করার মত প্রয়োজনীয় শক্তি মুসলমানদের অর্জিত না হয় ততদিন পর্যন্ত শক্তি অর্জনের পাশাপাশি অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়াও নিঃসন্দেহে জায়েয। মোটকথা অমুসলিমদের সাথে শান্তি চুক্তি দুই অবস্থায় হতে পারে।

ক. যে সব রাষ্ট্রের শক্তি মুসলমানদের শক্তির জন্য বিপজ্জনক নয় তাদের সাথে সন্ধিমূলক ও নিরাপত্তা চুক্তি করা যেতে পারে, যাবৎ না তারা দ্বিতীয়বার মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

খ. মুসলমানদের কাছে সশস্ত্র জিহাদের সামর্থ না থাকলে সামর্থ অর্জিত হওয়া পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ থাকা যেতে পারে।"
[ফিকহী মাক্বালাত, খণ্ড ৩ পৃ: ৩৫১]

• জিহাদের বিধান কি বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে ছিল?

এই প্রশ্নের জবাবে হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা. 'কিতাবুল জিহাদ' কিতাবের ভূমিকায় ৪৭-৫১ নং পৃষ্ঠায় লিখেন-

"জিহাদের হাকীকত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও এর বিধানাবলী সম্পর্কে যিনিই অবহিত হবেন তিনিই নিঃসংশয় হবেন যে, জিহাদ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ 'আলমী ইসলাহী' (আন্তর্জাতিক সংশোধনমূলক) দায়িত্ব, জিহাদের ফরযিয়্যত এখনও

বাকী আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে এবং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট অতি পছন্দনীয় আমল সমূহের অন্যতম।

ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। [সুরা তাওবা - ৯:২৪]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَـٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝١٠ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١١ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ব্যবসার সন্ধান দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বুঝ। আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। আর এটাই মহাসাফল্য।" (সূরা আস সাফ ৬১: ১০-১২)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل

"সে সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জান! অবশ্যই আমি আশা করি: আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাব এবং এতে শহীদ হয়ে যাব, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হবো, এরপর আবার জিহাদে যাব এবং আবার শহীদ হয়ে যাবো।" (বুখারী-৩১২৩ এবং মুসলিম-১৮৭৬)

মোট কথা, জিহাদের ফযীলত সংক্রান্ত আয়াতে কুরআনের পৃষ্ঠাসমূহ পরিপূর্ণ এবং শত শত সহীহ হাদীসে এর ফযীলত উল্লেখিত হয়েছে।

কিন্তু ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশনা থেকে দূরত্বের কারণে অথবা না জানি অন্য কী কারনে কোন কোন লোককে বলতে শোনা যায় যে, 'যেহেতু তখন ক্বিতাল ছাড়া ক্ষমতার পট পরিবর্তনের অন্য কোনো মাধ্যম ছিলনা, তাই ইসলাম এই পন্থাটিকেই বহাল রেখেছে; কিন্তু বর্তমান অবস্থা ভিন্ন' অর্থাৎ এখন রাজনৈতিক কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ক্ষমতা দখল করে পৃথিবীতে ইসলামের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব স্থাপন সম্ভব। অতএব এখন জিহাদের প্রয়োজন নেই। জিহাদের বিধান মানসুখ বা রহিত হয়ে যাওয়াই উচিত।' (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

কেউ কেউ তো এ ধারণাও প্রকাশ করেছে যে, 'যে সরকার তার নিজের দেশে দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি প্রদান করে তাদের সাথে ইক্বদামী বা আক্রমণাত্মক জিহাদ করা উচিত নয়, বিশেষত বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে, যখন সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হয়, কিন্তু যখন রাজ্যজয়ের সাধারণ প্রচলন ছিল এবং এ বিষয়টি রাজ রাজড়ার কীর্তি ও গুণাবলির মধ্যে পরিগণিত হত তখনকার কথা ভিন্ন। যেসব ইক্বদামী জিহাদের ঘটনাবলীতে ইসলামী ইতিহাস পরিপূর্ণ তা সবই ঐ সময়কার।'

এই দুইটি মত যে ভ্রান্ত এবং কিতাব ও সুন্নাহর জিহাদ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী এবং শরীয়তের ইজমায়ী বিধানাবলীর পরিপন্থি তা তো একেবারেই স্পষ্ট কিন্তু লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল, এই দুই মতের মধ্যে অজান্তেই ইসলামী শরীয়তের প্রতি কত বড় অপবাদ আরোপ করা হল যে, একটি সাময়িক বা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট বিধানকে ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য চলমান একটি বিধান বানিয়ে দিয়েছে এবং তার এত এত ফাযাইল বর্ণনা করেছে এবং এর প্রতি এত বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে, যদ্দরুন তা একটি সাময়িক বিধান নয়, বরং চিরন্তন বিধান হওয়া সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

আর দ্বিতীয় মতটিতো আরো বেশি ভয়াবহ। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাক্বী উসমানী (দা.বা.) এর ভাষায়, 'যদি এই মতটি ঠিক ধরে নেওয়া হয় তবে এর অর্থ এই হবে যে, কোন বস্তু ভালো বা মন্দ হওয়ার জন্য ইসলামের নিজস্ব কোনো মাপকাঠি নেই। যদি কোনো যুগে কোনো একটি মন্দ বিষয়কেও 'ভালো ও কীর্তিমূলক' গণনা করা হয় তবে ইসলামও তার অনুসরণ করে এবং যে যুগে মানুষ একে মন্দ মনে করে ইসলামও সেখানে থেমে যায়!

প্রশ্ন হল, 'ইক্বদামী জিহাদ' কোনো ভালো বিষয় কিনা? যদি ভালো হয় তবে মুসলমান এ থেকে শুধু এজন্য কেন বিরত থাকবে যে, আজকাল সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হয়? আর যদি বিষয়টি আসলেই ভালো না হয় তবে বিগত সময়ে ইসলাম কেন এ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে নাই? ইসলাম কি শুধু এজন্যই একে অবলম্বন করেছিল যে, তা রাজা বাদশার কীর্তির মধ্যে পরিগণিত হত?

আমার মতে, ইসলামী ইতিহাসের ইক্বদামী জিহাদসমূহের এই ব্যাখ্যা নিতান্তিই ভুল ও বাস্তবতাবিরোধী। বাস্তব কথা হল, কুফরের প্রতিপত্তি খর্ব করার জন্য ঐ যুগেও জিহাদ করা হয়েছে যখন তা "রাজ রাজড়ার কীর্তি হিসেবে পরিগণিত হত" কিন্তু তা এজন্য হয় নাই যে, ঐ যুগে তার ব্যাপক প্রচলন ছিল, বরং এজন্য ছিল যে, আল্লাহর দ্বীনের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিষয়টি বাস্তবিক পক্ষেই উপযোগী ও ভালো। অন্যথায় রাজা বাদশাহর বীরত্ব প্রদর্শনের মধ্যে তো এও পরিগণিত হত যে, তারা জয়ের নেশায় চুর হয়ে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরও রেহাই দিত না কিন্তু ব্যাপক প্রচলনের কারণে এসব বিষয়কে ইসলাম কখানো সমর্থন করে নাই, বরং লড়াইয়ের এমন সব বিধি-নিষেধ ও সীমা-রেখা নির্ধারণ করেছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে তা অনুসরণ করে দেখিয়েছে যা তখনকার রাজা বাদশার কল্পনারও অতীত ছিল বরং তা ঐসব নিপীড়িত মানবশ্রেণির জন্যও অকল্পনীয় ছিল যারা শুধু রাজা বাদশার এ জাতীয় জুলুম অত্যাচারে কেবল অভ্যস্তই ছিলনা বরং এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল।

যে উদ্দেশ্যে ইক্বদামী জিহাদ অতীতে জায়েয ছিল ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে আজও তা জায়েয এবং শুধু এজন্য এই বৈধতাকে আড়াল করার কোনো অর্থ নেই যে, "এটম বোমা" ও "হাইড্রোজেন বোমা" আবিষ্কার ও উৎপাদনকারী শান্তিপ্রিয়(?) ব্যক্তিবর্গ একে নিতান্তই অপছন্দ করেন এবং এতে ঐসব মহান(?) ব্যক্তিবর্গের নাক-মুখ কুঁচকে যায়, যাদের নিক্ষিপ্ত গোলামীর জিঞ্জিরে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির শরীর রক্তে রঞ্জিত।

মূলতঃ এই বিষয়টিও কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তিরই অবাঞ্ছিত ফলাফল বলে আমার বিশ্বাস যে, মানুষ ভালো মন্দ নির্ধারণের মাপকাঠিও এই বিশ্বব্যাপী প্রচারণাকেই বানিয়ে নিয়েছে যা দিনকে রাত ও রাতকে দিন করে মানুষের মন মগজে স্থাপন করছে এবং শুধু অমুসলিমই নয় খোদ মুসলমানরাও এই প্রচারণায় কাবু হয়ে নিজেদের দ্বীন ও ধর্মের বিধানাবলীর ব্যাপারে ওজরখাহীর পথ অবলম্বন করতে আরম্ভ করেছে। যদি অন্যায়, অসত্যের এই প্রতিপত্তিকে চুরমার করা "সাম্রাজ্যবাদের" সংজ্ঞায় আসে তবে এ জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের অভিযোগ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে মাথা পেতে গ্রহণ করা উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমরা ঐসব অভিযোগকারীদের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে যাব এবং বলব, জনাব! যখন আপনি ইক্বদামী জিহাদকে নন্দিত মনে করতেন তখন আমরাও তা ভালো মনে করতাম এবং তা কর্মে রূপ দিতাম এবং যখন আপনি আপনার লিখনীতে এবং শুধুই লিখনীতে একে মন্দ বলছেন এবং শুধুই বলছেন তখন আমরাও একে নিন্দিত মনে করছি এবং নিজেদের জন্য একে হারাম করে নিচ্ছি। এ জাতীয় চিন্তারীতির সাথে একমত হওয়া এই অধমের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়।" [ফিকহী মাক্বালাত, খঃ ৩ পৃ. ৩০২-৩০৫]

মোটকথা, জিহাদের উভয় প্রকার, ইক্বদামী ও দিফায়ী ইসলামের চিরন্তন ফরযসমূহের অন্যতম। যতদিন পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠে কুফর ও শিরকের প্রভাব প্রতিপত্তির ফিৎনা বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত সত্য-ন্যায়ের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের দায়িত্বও অবশ্য-পালনীয় থাকবে।

রাসূলুল্লাহ সাﷺ. ইরশাদ করেছেন,

اَلْجِهَادُ مَاضٍ مِنْهُ بَعَثَنِيَ اللهُ إِلى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِى الدَّجَّالَ، لَا يُبْطِلُه عَدْلُ عَادِلٍ وَلَا جَوْرُ جَائِرٍ

"আমার প্রেরিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে আমার উম্মতের শেষ ভাগ দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত জিহাদ চলমান থাকবে। কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায়পরায়ণতা এবং কোনো জালেমের জুলুম একে রহিত করবে না।" [সুনানে আবু দাউদ ১/৩৪৩]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে বুঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন।

ইসলাহী মেহনত করনেওয়ালা সাথীদেরকে শয়তানের ধোঁকা:

• এটি আমাদের কেমন বিচার!

আমরা যারা ইসলাহী মেহনত করি, তারা কেউ কেউ মনে করি, যারা নিজেদের সোহাগিনী ও প্রাণ-প্রিয়া স্ত্রীদের ছেড়ে, কলিজার টুকরা আদরের সন্তানদের ছেড়ে, মমতাময়ী মায়ের আচলকে উপেক্ষা করে, পিতার স্নেহ হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে, খেয়ে না খেয়ে, পরে না পরে, গুহার আঁধারে রাত্রিযাপন করে, জিহাদের তপ্ত ময়দানে নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিচ্ছে, তারা ছোট জিহাদ (জিহাদে আসগর) করছে; আর আমরা যারা স্ত্রী সন্তান-পিতা-মাতা নিয়ে আনন্দ-ফূর্তিতে লিপ্ত, তিন বেলা পেট পুরে আহার করছি, ফ্যান-এসি, গ্যাস-বিদ্যুৎ আর রঙ-বেরঙের আলোকসজ্জায়, সকল সুবিধা নিয়ে শহরের পাকা বাড়িতে মজ-মাস্তি করছি, আর যেহেতু আমি অমুক পীর সাহেবের হাতে বাইয়াত হয়েছি, নফসের মুজাহাদা করছি, তাই আমি বড় জিহাদ (জিহাদে আকবর) করছি।

প্রিয় ভাই! একটু চিন্তা করে দেখুন তো, কেমন বিচার আমাদের!

যেই হাদীসটির উপর ভিত্তি করে এই দাবী করা হয়, তা হল-
বলা হয় যে, নবীজী ﷺ এক জিহাদ হতে ফিরে এসে বলেছিলেন,

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ قَالُوْا وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرِ قَالَ جِهَادُ الْقَلْبِ

"আমরা জিহাদে আসগর/ময়দানের জিহাদ হতে জিহাদে আকবর/বড় জিহাদের দিকে ফিরে এলাম।" সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! বড় জিহাদ কোনটি? তিনি ﷺ বললেন, কলবের তথা অন্তরের জিহাদ।" অথচ, অনেক উলামায়ে কেরামের মতে এটি একটি জাল হাদীস; আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, এই হাদিসের কোন ভিত্তি নেই। (তানজীমুল আশতাত, খণ্ড ১, পৃ. ৬৯; তাফসীরে বাইযাবি)

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, এটি কোন হাদীস-ই নয়, বরং এটি ইবরাহীম ইবনে আবলাহ্ নামক এক ব্যক্তির বাণী। (মাওযুআতে কুবরা, মোল্লা আলী ক্বারী রহ.,পৃ. ১২৭)

তারপরও যদি ধরে নেই এটি একটি হাদীস, তথাপি সেই হাদীসের অর্থ না বুঝে, আমরা এতবড় একটা অবিচার দ্বীনের মুজাহিদীনদের সাথে করতে পারি না, তাদের উপর এমন একটি অপবাদ চাপিয়ে দিতে পারি না- "তারা ময়দানে ছোট জিহাদ করছে আর আমরা ঘরে বসে বড় জিহাদ করছি।" এই ব্যাপারে আমি নিজে কিছু বলতে চাইনা। কেননা, এই ব্যাপারে আমি কিছু বললে, সালেকীন ভাইয়েরা হয়ত আমার কথা গ্রহণ নাও করতে পারেন, তাই এই ব্যাপারে পীর-মুরীদীর লাইনে শীর্ষ একজন আলেম, যিনি হিন্দুস্তানে আধ্যাত্মিক মেহনতের রাহবার, হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত শাহ আশরাফ আলী থানবী রাহিমাহুল্লাহর এই ব্যাপারে একটি বিখ্যাত উক্তি আছে সেটিই উল্লেখ করতে চাই।

তিনি বলেন,

آج کال عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قتال مع الکفار جہاد اصغر ہے اور مجاہدۂ نفس جہاد اکبر ہے گویا کہ قتال مع الکفار کو علی الاطلاق اس مجاہدۂ نفس سے جو خلوت میں ہو درجہ میں گھٹا ہوا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں بلکہ اس میں تفصیل ہے ،وہ یہ کہ قتال مع الکفار اگر بلا اخلاص ہے تب تو واقع میں وہ مجاہدۂ نفس سے درجہ میں کم ہے، وہ مجاہدۂ نفس اس سے افضل ہے،اور ایسے قتال مع الکفار کو جہاد اصغر اور اس کے مقابلہ میں مجاہدۂ نفس کو جہاد

اکبر کہا گیا

لکین قتال مع الکفار اخلاص کے ساتھ ہو تو ایسے حالت میں قتال مع الکفار کو جہاد اصغر کہنا غیر محققین صوفیہ کا گلو ہے بلکہ ایسا قتال مع الکفار جہاد اکبر ہی ہے، اور ایسا قتال اس مجاہدۂ نفس سے جو خلوت میں ہوا فضل ہے، کیونکہ جو قتال مع الکفار اخلاص کے ساتھ ہو غاوہ مجاہدۂ نفس کو بھی شامل ہو گا، ایسے قتال کے اور دونوں جہاد کی فضیلت جمع ہو جائیگی-)الافاضت الیومیہ جلد ۴ قط ۸۲ ملفوظ ۱۰۴۱

“আজকাল সাধারণভাবে মানুষের ধারণা এই যে, কাফেরদের সাথে লড়াই করা জিহাদে আসগর (ছোট জিহাদ) এবং নফসের মুজাহাদা (কুপ্রবৃত্তির দমন ও আত্মশুদ্ধি) জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ)। যেন তারা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে কাফেরদের সাথে লড়াই করাকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নমানের মনে করে। এই ধারণা ঠিক নয়। বরং বাস্তব কথা হলো, কাফেরদের সাথে লড়াই করা ইখলাস শূন্য হলে বাস্তবিকপক্ষেই তা নফসের মুজাহাদা থেকে নিম্নমানের কাজ। এ ধরণের লড়াইকেই জিহাদে আসগর এবং বিপরীতে নফসের মুজাহাদাকে জিহাদে আকবর বলা হয়েছে।

কিন্তু কাফেরদের সাথে লড়াই যদি ইখলাসপূর্ণ হয় তবে এই লড়াইকে জিহাদে আসগর বলা গাইরে মুহাকক্বিক (অগভীর জ্ঞানের অধিকারী), সুফীদের বাড়াবাড়ি, বরং এই লড়াই অবশ্যই জিহাদে আকবর এবং তা (ময়দানে ইখলাসের সাথে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ করা) নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে উত্তম। কেননা যে লড়াই ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং এতে উভয় জিহাদের ফযীলতই একত্রিত হচ্ছে।” (আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যাহ খঃ ৪, হিস্সা: ৫, পৃঃ ৮২, মালফূয, ১০৪১)

প্রিয় ভাই! সবচেয়ে বড় কথা হলো, সাহাবায়ে কেরাম আমাদের মতো কোনো দিন ‘জিহাদে আকবরের’ ওযর দেখিয়ে সশস্ত্র জিহাদকে ত্যাগ করে ঘরে বসে থাকেননি, আর মনে করেননি যে, আমরা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করেই ময়দানের সওয়াব হাছিল করছি।

• জিহাদ-ই উম্মতে মুহাম্মাদীর সন্ন্যাসবাদ!

প্রিয় ভাই! আমরা যারা সুলূকের (আত্মশুদ্ধির) লাইনে মেহনত করে থাকি, তারা একটু খেয়াল করি, হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহিমাহুল্লাহর “যে লড়াই ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে।”-এ কথার ব্যাখ্যা কী?

আমরাতো নফসের সাথে কম খাওয়া, কম ঘুমানো, কম কথা বলা, কম মিলামিশা করা ইত্যাদির মেহনতই করে থাকি, যেন আমাদের নফস দুর্বল হয়, আমরা গুনাহমুক্ত হতে পারি, তাইনা?

আমরা যখন জিহাদের ময়দানে থাকব, তখন স্বাভাবিক ভাবেই খাবার দাবারের কষ্ট করতে হবে, নিজের বাসার মত হয়তো এতটা সুখের হবে না! (এটি হলো কম খাওয়ার মেহনত)।

ময়দানে আমাকে ‘রিবাত’ তথা সীমানা পাহারা দেয়া, কিংবা ছামানা ও অস্ত্র-শস্ত্র পাহারা দেয়া, নৈশকালীন অভিযান, এক স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে গমন, নরম বিছানা নেই, মাটি কিংবা পাথরের উপর পিঠ স্থাপন, ফ্যান-এসির অভাব, পোকা-মাকড় ও মশার কামড়, যে কোনো সময় শত্রুর আক্রমণ/বোম্বিং-এর ভয় ইত্যাদি সবকিছু মিলে আমি খুব কমই হয়ত শান্তি বা পরিপূর্ণ তৃপ্তির ঘুম ঘুমাতে পারব! (এ হলো কম ঘুমানোর মেহনত)।

ময়দানে যখন আমি সর্বদা মাথার উপর মৃত্যুকে দেখব, তখন আমার পেট থেকে খোশগল্প বের হবে না। বরং সর্বদা আমার ক্বলবে জিকির জারি থাকবে। সেই সময়টির কথা একটু কল্পনা করুন তো ভাই, যখন একটু পরেই আমরা কোনো অভিযানে বের হব। ফিরে আসতে পারবো কিনা গ্যারান্টি নেই। হয়ত আজকের দিনটিই আমার যিন্দেগীর শেষ দিন। হয়ত এই ওয়াক্তের নামাযটাই আমার জীবনের শেষ নামায। প্রতি পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি! তখন আমার থেকে কি অহেতুক খোশগল্প আর আজেবাজে কথা আশা করা যায়? আমার চেহারায় কি গাম্ভীর্য ফুটে উঠবে না? এটি ‘নিরহঙ্কারপূর্ণ গাম্ভীর্য’। (এই হলো কম কথা বলা এবং অধিক পরিমানে আল্লাহর জিকির ও মৃত্যুর স্মরণ করার মেহনত)।

আর ময়দানে আসার আগে আমি তো আমার স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা-বন্ধু-বান্ধব ছেড়েই আসব, তাইনা? তাহলে অধিক মেলামেশার সম্ভাবনা কোথায়? ময়দানের সাথীদের সাথে যে মিলামিশা হবে সেটি তো হবে নিয়ন্ত্রিত। (এটি হলো কম মিলা-মিশার মেহনত)।

ময়দানে তো আমরা রাস্তা-ঘাটের বেপর্দা মহিলাদের কম দেখবো, গান-বাদ্য আর অশ্লীল কথা শুনবো না, কম খাওয়া আর কম ঘুম, চব্বিশ ঘন্টা মৃত্যু ও আখিরাতের চিন্তা, এসব পারিপার্শ্বিকতার চাপে পড়ে আমার নফস্ এমনি ‘সোজা’ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। আলাদা ভাবে নফসের মুজাহাদার প্রয়োজন পড়বে না। তাছাড়া ময়দানে আমি যখন নিজের চোখে আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য দেখব, দেখব যে শহীদদের লাশ পঁচে-গলে যাচ্ছে না, রক্ত লাল কিন্তু ঘ্রাণ অপার্থিব কোনো মেশকের, হাস্যোজ্জ্বল শুহাদাদের চেহারা, চিন্তা করুন তো, তখন আমার ঈমান কেমন হবে? এগুলো কি ঘরে বসে থেকে অর্জন করা সম্ভব, ভাই? কক্ষনো নয়।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم :إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

আবু উমামাহ রাদি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সন্ন্যাসী জীবন অবলম্বনের অনুমতি দিন। নবী করীম ﷺ বললেন, “আমার উম্মতের সন্ন্যাসবাদ হল- মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করা।” (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৮৬)

অর্থাৎ বৈরাগ্য সাধনার জন্য, কৃচ্ছ্রতা সাধনের জন্য চিরকুমার সেজে, পরিবার পরিজন ছেড়ে, খাল্ওয়াতের (একাকীত্বের) উদ্দেশ্যে বনে জঙ্গলে পাড়ি জমানোর প্রয়োজন এই উম্মতের নেই। জিহাদের মাঝেই রয়েছে উম্মতের জন্য বৈরাগ্য। বৈরাগ্য সাধনার সকল উপাদান জিহাদে বর্তমান রয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এটিই উম্মতের জন্য শ্রেষ্ঠ কৃচ্ছ্রতার সাধনা।

• সেই সময়টির কথা মনে করুন তো!

প্রিয় ভাই! আমাদের জীবনে কখনো কি এমন একটি সময় এসেছে, যখন আমরা আমাদের প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছ থেকে চির বিদায় নিয়ে, কলিজার টুকরা সন্তানের মমতার গলায় ছুরি চালিয়ে, মায়ের আদরের কোলকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে, পিতার মমতাময় বুককে ‘না’ বলে আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর একটি ফরয হুকুম ‘জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্’র জন্য ময়দানে পাড়ি জমিয়েছি? এসেছে কি এমন একটি কঠিন পরীক্ষার মুহূর্ত আমাদের জীবনে?? চেখে দেখেছি কি এমন একটি ‘মৃত্যুযন্ত্রণাসম’ অভিজ্ঞতা???

এমন একটি সময় যার জীবনে একবার এসেছে, সে অবশ্যই বুঝেছে, 'নফসের সাথে মুজাহাদা' নামক বস্তুটি কী জিনিস! জিহাদের জন্য যে কুরবানী পেশ করতে হয়, আর যা কিছু হারাতে হয়, তা তো সারা জীবনের জন্য হারানো! আর এই হারানোর বেদনাও আজীবনের!

অন্যদিকে, ঘরে বসে নফসকে যে সকল মুজাহাদার সম্মুখীন হতে হয়, তার কষ্ট তো ক্ষণস্থায়ী। আমি যতই একাকীত্ব অবলম্বন করি না কেন, আমার নফস জানে, দিন শেষে আমি আমার পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে আসবো। আমি যতই কম খাইনা কেন, আমার নফস জানে আমার এই সাধনা একদিন অবশ্যই শেষ হবে। আমি যতই কম ঘুমাই না কেন আমার নফস জানে একসময় আমি দুর্বল হয়ে প্রয়োজন মতো ঘুমাবোই।

কিন্তু জিহাদের ক্ষেত্রে???

হয়তো এই বের হওয়াই আমার জীবনের শেষ বের হওয়া। একটু চিন্তা করুন তো ভাই- আপনি পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছেন, হয়তো এই দেখাটাই শেষ দেখা, আপনার প্রাণপ্রিয়া স্ত্রীর উপর এই দৃষ্টিটিই শেষ দৃষ্টি! যাকে ছাড়া আপনার ঘুম আসতো না, যার দেহের পরশ ছাড়া আপনার শরীরের ক্লান্তি দূর হতো না, যাকে ছাড়া জীবনটাই ছিল অর্থহীন, বিস্বাদময়, যার সাহচর্যে অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি হতো, প্রেম-সাগরে ভালোবাসার জোয়ার বইত, নীরবে-নিভৃতে যার কাছে পাওয়া যেত জান্নাতের এক টুকরো সুখ, হায়! সেই প্রাণপ্রিয়া স্ত্রীকে ছেড়ে আজ আপনি আল্লাহর ডাকে তাঁর ফরয হুকুম পালনের জন্য বেরিয়ে যাচ্ছেন। কেমন লাগছে আপনার??

আপনার স্ত্রীও জানে- হয়ত আপনাকে শেষবারের মতো বিদায় দিচ্ছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না করছে, কান্নার কারণে মুখে কথা বের হচ্ছে না, আঁচল দিয়ে বারবার চোখ মুছছে, নিজের ও সন্তানদের অনিশ্চিত ভবিষ্যত আর প্রিয়জন হারানোর চিন্তায় তারও তনুমন আচ্ছন্ন, আপনাকে চিরবিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে আপনার মানিকদের বুকে নিয়ে আপনার স্ত্রীর বুকফাঁটা কান্নার শব্দ কি কখনো শুনেছেন ভাই???

দেখেছেন কি আপনার কলিজার টুকরা সন্তানদের সেই সময়টির চেহারা, যখন তারা হয়ত বুঝতে পারছে না কী ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু আপনার স্ত্রীর কান্না থেকে কিছুটা হয়তো আঁচ করতে পারছে! আপনাকে হয়ত জিজ্ঞেস করেছিল, আব্বু, তুমি কোথায় যাচ্ছ? আপনি হয়তো তাদেরকে বুঝ দিলেন, মানিকেরা আমার! খুব শীঘ্রই তোমাদের জন্য মজার জিনিস নিয়ে ফিরে আসবো। কিন্তু আপনি জানেন যে, মজার জিনিস নিয়ে হয়তো আর ফিরা হবে না। হয়তো দেখা হবে আরশের নিচে, নয়তো বা মজার জিনিস পাওয়া হবে খোদা তা'আলার জান্নাতে। তখন আপনার কলিজা ছেঁড়া সে ব্যথার কথা কি আপনার মনে আছে??

প্রিয় ভাই! আমাদের সলাত, আমাদের কুরবানী, আমাদের হায়াত, আমাদের মওত- সবকিছু বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্যই নিবেদিত।

সত্য বলতে কি ভাই, জিহাদের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে কুরবানী আর ত্যাগ তিতিক্ষার নজরানা আল্লাহ্ জাল্লা শা-নুহুর দরবারে পেশ করা হয়, তার তুলনা অন্য কোনো কুরবানী আর মেহনতের সাথে হতেই পারে না!.............

• আরে ভাই, আমরা এখন ইখলাস বানানোর মেহনত করছি!

কোনো কোনো ভাই বলেন, 'আমরা এখন ইখলাস বানানোর মেহনত করছি। ইখলাস তৈরি হয়ে গেলে আমরা জিহাদ করবো।'

তাহলে আমি বলবো, ভাই! এটি শয়তানের একটি ধোঁকা, এই চিন্তা করলে আমার দ্বারা জিহাদ কস্মিনকালেও সম্ভব

হবে না। কেননা ইখলাসের কোনো বাহ্যিক সূরত নেই, যা দেখে আমরা বুঝতে পারবো, আমার ইখলাস অর্জন হয়ে গেছে।

আমি যখন বললাম, "আমি আল্লাহর জন্য জিহাদ করছি" আর আমার ভিতর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, র‍্যাংক, পদ-পদবী, মালে গনিমত, বীর খেতাব লাভ করার অভিলাষ নেই, কেবলই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা, তাঁর হুকুম পালন, আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ, সাহাবায়ে কেরামের অনুকরণ, নির্যাতিত মুসলমানদের উদ্ধার করা, দুনিয়া থেকে ফেতনা ও বদদ্বীনী মিটানো, আল্লাহ্ তা'আলার একটি ফরয বিধান বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে জিহাদ করব, কেউ আমাকে চিনুক বা জানুক এই আশা করিনা, তখন এটিই ইখলাস। এর জন্য তো ভাই বছরের পর বছর মেহনত করার কোনো দরকার নেই!

কখনো মনে উল্টা-পাল্টা চিন্তা এলে সাথে সাথে তাওবা করে নেয়া। যেমনটি আমরা সবসময় বলে থাকি- প্রত্যেক আমলের শুরুতে, মাঝে এবং শেষে নিজের নিয়তকে যাচাই করি। "যদি সেটি আল্লাহর জন্য হয় তাহলে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে আমলটি চালু রাখি। আর যদি নিয়তে কোনো সমস্যা মনে হয়, তাহলে সাথে সাথে 'আসতাগফিরুল্লাহ্' পড়ে নেই এবং নিয়ত সংশোধন করে আমলটি করতে থাকি।"

প্রিয় ভাই! ইখলাস অর্জনের এই উসুলটি আমরা কেন জিহাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করিনা?
জিহাদের জন্য পৃথকভাবে 'বিশেষ' ইখলাস অর্জন করতে হবে, এমনটি শরীয়তে কোথাও নেই!

প্রিয় ভাই! একটু চিন্তা করি- "ইখলাস তৈরির মেহনত করছি" বলে জিহাদ ত্যাগ করলে আল্লাহ তা'আলা কি আমাদেরকে ছেড়ে দিবেন? আল্লাহ্ তা'আলা কি তাঁর ফরয হুকুমের ব্যাপারে এমনি এমনি ছেড়ে দিবেন?

إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٖ قَدِيرٌ

"তোমরা যদি (তাঁর পথে জিহাদের জন্য) বের না হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন (দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও কুফ্ফারদের চাপিয়ে দিয়ে আর আখিরাতে জাহান্নাম দিয়ে) এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৯)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَاْ أَخْبَارَكُمْ

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের মধ্যে জিহাদকারীকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ (অবস্থা ও কর্মকাণ্ড) যাচাই করি।" (৪৭ সূরা মুহাম্মাদ:৩১)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ তা'আলা এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল।" (৩ সূরা আলে ইমরান: ১৪২)

• এই গুনাহে কবীরা থেকে কি আমাদের বাঁচতে হবে না?

প্রিয় ভাই আমার!

শুধু কি চোখের গুনাহ্ই কবীরা গুনাহ্? জিহাদ তরক করা কি গুনাহে কবীরা নয়? এই গুনাহের ইসলাহ করবে কে? এই গুনাহ থেকে বাঁচার মেহনত করবে কে ভাই?

শুধু কি কানের গুনাহ্ই কবীরা গুনাহ্? জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা কি গুনাহে কবীরা নয়? এই গুনাহ হতে বাঁচার 'মুজাহাদা' করবে কে ভাই?
কাপুরুষতা কি গুনাহ নয়? অন্তরে 'গাইরুল্লাহর ভয় দূর করা'র জন্য আমরা কোনো তরীকা অবলম্বন করেছি কি ভাই?
শুধু কি মনের গুনাহ্ই কবীরা গুনাহ্? জিহাদের প্রস্তুতি না নেয়া কি গুনাহে কবীরা নয়? এটি কি অন্তরে নিফাক থাকা'র অন্যতম একটি আলামত নয়? তাই, এই গুনাহ হতে বাঁচার মেহনত কে করবে ভাই?
আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً

"আর যদি তারা (জিহাদে) বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো।" (সূরা আত-তাওবা: ৪৬)

অতএব আমরা বলতে পারি, 'ফরযে আইন জিহাদ' করতে না পারাটাও 'আত্মার একটি মারাত্মক ব্যাধি'! কেননা, ফরযে আইন হওয়া সত্ত্বেও জিহাদ না করা বা জিহাদের প্রস্তুতি না নেয়া- অন্তরের গহীনে লুক্কায়িত কিছু মারাত্মক ব্যাধির (ওয়াহন তথা দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয়/কাপুরুষতা/গাইরুল্লাহর ভয়ের) বহিঃপ্রকাশ মাত্র!
সুতরাং প্রিয় ভাই! পাঁচ ওয়াক্ত ফরযে আইন সলাত আদায় না করে আমরা কি দাবী করতে পারি আমাদের ইসলাহ তথা আত্মশুদ্ধি হয়ে গিয়েছে? তাহলে, 'ফরযে আইন জিহাদ' ত্যাগ করে আমরা কিভাবে দাবী করতে পারি যে, আমাদের 'ইসলাহ' হয়ে গিয়েছে? এটা কি নিজেকে নিজে ধোঁকা দেয়া নয়?
(আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এই সকল ব্যাধি থেকে হেফাযত করুন। আমীন।)

আমার প্রিয় ভাই! আপনি জানেন কি, জিহাদ ও ক্বিতালের সাথে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদেরকে হিদায়াত ও পরিপূর্ণ ইসলাহ করে দেয়ার ওয়াদা?
আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَإِذا لَقيتُمُ الَّذينَ كَفَروا فَضَربَ الرِّقابِ حَتّىٰ إِذا أَثخَنتُموهُم فَشُدُّوا الوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعدُ وَإِمّا فِداءً حَتّىٰ تَضَعَ الحَربُ أَوزارَها ۚ ذٰلِكَ وَلَو يَشاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنهُم وَلٰكِن لِيَبلُوَ بَعضَكُم بِبَعضٍ ۗ وَالَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعمالَهُم سَيَهديهِم وَيُصلِحُ بالَهُم

"অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! একথা শুনলে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন (ইসলাহ/ভাল) করে দিবেন।" (সূরা মুহাম্মাদ , আয়াত ৪,৫)
আল্লাহর তা'আলা আমাদেরকে শাহাদাত নসীব করুন, আমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে ইসলাহ করে দেন। আমীন।

• আমার পীর কি জিহাদ বুঝেন না??

অনেক ভাই আছেন, যারা এই ধারণা লালন করেন যে, "আমার পীর একজন হক্কানী আলেম। তিনি কি জিহাদ বুঝেন না? তিনি যখন জিহাদের কথা বলবেন, তখনই কেবল আমরা জিহাদ করবো? আমার পীরের পরামর্শ ছাড়া যেখানে আমি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ছোট-খাট কোনো কাজও করিনা, সেখানে আমার পীরের এজাজত ছাড়া

কিভাবে আমি জিহাদের মত একটা এত বড় ও কঠিন কাজ করতে পারি? সর্ব হালতে আমি আমার পীরের অনুসরণ করবো। (কাউকে তো এমনও বলতে শুনা যায়-) আমি শাইখের ব্যাপারে একদম ফানা (ফানা ফিশ্ শাইখ)! শাইখ ছাড়া আমি আর কিছুই বুঝি না! শাইখ আমাকে যেদিকে নিয়ে যাবেন আমিও সেদিকেই যাব। আমার পীর যদি জাহান্নামে যায় তাহলে আমিও জাহান্নামে যেতে প্রস্তুত আছি।" (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক)

প্রিয় ভাই! একজন হক্কানী আল্লাহ্ ওয়ালার সোহবত প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়, বিশেষতঃ বর্তমানে এই ফেতনার যামানায় একজন বিজ্ঞ আলেমের ছায়ায় থেকে, তাঁর পরামর্শমত জীবন পরিচালনা করতে পারাটা অনেক বড় খোশ-নসীব! আলহামদুলিল্লাহ! এটা যারা পেয়েছেন তারাই কেবল এর মূল্য অনুধাবন করার ক্ষমতা রাখেন।

যাইহোক, প্রথম কথা হলো, একজন আলেম দ্বীনের সকল বিষয়ে সমান পারদর্শী হবেন, এটি আশা করা ঠিক নয় (যেমন ভাবে একজন ডাক্তার সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবেন এটি আমরা আশা করতে পারি না)।

আমার পীর সাহেব হয়ত নফসের রোগগুলোর চিকিৎসা খুব ভালো বুঝেন, তবে তিনি হয়ত ফিকহের উপর তেমন বেশি পাণ্ডিত্য রাখেন না, তাই তিনি ফতোয়া দিতে পারেন না। দুইটা দুই জিনিস, দু'টি আলাদা বিষয়! ঠিক এমনিভাবে, আমার শায়েখ হয়ত আমার যিন্দেগীর বিভিন্ন বিষয়ে যেমন মুআমালাত, মুআশারাত, নফল আমল, গুনাহমুক্ত যিন্দেগী গঠন করার তরীকা ইত্যাদি বিষয়গুলো ভালো বুঝেন এবং ভালো ফয়সালা দেন, কিন্তু তিনি হয়তোবা জিহাদ বিষয়ে, জিহাদের মাসাইল ইত্যাদি সম্পর্কে এতটা পাণ্ডিত্য বা দক্ষতা রাখেন না। হয়তোবা তিনি জিহাদ নিয়ে এতটা চিন্তা-ফিকির করেন না বা ঘাঁটাঘাটি করেন না।

ঠিক একই ভাবে, আরেকজন শাইখ হয়ত নফসের ব্যাধি গুলো সম্পর্কে খুব বেশি পাণ্ডিত্য রাখেন না, কিন্তু জিহাদের ব্যাপারে পারদর্শী, জিহাদের মাসআলা, মাসাইলগুলো ভালো জানেন, জিহাদের ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতাও বেশি। সেক্ষেত্রে, আমি উভয় শাইখের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে পারি। এতে আমার এছলাহী মেহনতও হচ্ছে, আবার জিহাদী মেহনতও করা হচ্ছে। তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ভাই, জিহাদী মেহনত তুলনামূলক পরিপূর্ণ মেহনত। জিহাদী মেহনতের মধ্যেই ইলম, তাযকিয়া ও দাওয়াতের মেহনত অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। এই বিষয়ে কিছু কথা পূর্বে গিয়েছে, সামনে আরো বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

• জিহাদ করার জন্য আমার শাইখ যদি অনুমতি না দেন!

দ্বিতীয়ত কথা হলো, জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে আমার শাইখ আমাকে জিহাদের অনুমতি দিলেন কি দিলেন না সেটা দেখা যাবে না। বরং এই ব্যাপারে (জিহাদ করবো, কি করবো না) কারো সাথে পরামর্শ করার অনুমতিও শরীয়তে নেই।

প্রিয় ভাই! আমরা কি পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের জন্য শাইখের অনুমতি গ্রহণ করে পরে সালাত আদায় করি, নাকি শাইখের অনুমতি ছাড়াই করি? রোযা রাখার জন্য আমরা কি কোনোদিন শাইখের অনুমতি গ্রহণ করেছি?? না, তা কখনো করিনি। তাহলে আরেকটি ফরযে আইন হুকুম 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্'র জন্য কার অনুমতি লাগবে ভাই?? ফরযে আইন হুকুম মানার ব্যাপারে কারো অনুমতি লাগবে না। বরং উল্টো কেউ নিষেধ করলে তা মান্য করা হারাম। জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় সন্তানের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি, স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি, গোলামের জন্য তার মনীবের অনুমতি, ঋণগ্রহীতার জন্য ঋণদাতার অনুমতি গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। এটিই শরীয়তের হুকুম। তাহলে একজন মুরীদের জন্য তার পীরের অনুমতির কী প্রয়োজন আছে ভাই?

[এই ব্যাপারে 'কিতাবুত তাহরীদ্ 'আলাল ক্বিতাল' কিতাবের দ্বিতীয় পর্ব "তাওহীদ ও জিহাদ" খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।]

ফরযে আইন ও ওয়াজিব হুকুমের ব্যাপারে কারো সাথে পরামর্শ করা যাবে না (করবো, কি করবো না!) পরামর্শ তো করা যাবে শুধু সুন্নত, নফল আর মুবাহ বিষয় সমূহের ব্যাপারে।............

তারপরেও যদি আমার মন পীরের অনুমতি ছাড়া জিহাদ করার ব্যাপারে সায় না দেয়, তাহলে বুঝতে হবে, দ্বীনের ব্যাপারে ও দ্বীন মানার ব্যাপারে আমি সত্যবাদী নই; আমার মনে গাইরুল্লাহর ভয় ঢুকেছে, দুনিয়ার মহব্বত আর মৃত্যুর ভয়ে আমার অন্তর ব্যধিগ্রস্ত! সুতরাং খুব দ্রুত আমার এই ব্যাধিসমূহের চিকিৎসা হওয়া দরকার।

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ يَخۡشَوۡنَ ٱلنَّاسَ كَخَشۡيَةِ ٱللَّهِ أَوۡ أَشَدَّ خَشۡيَةٗۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبۡتَ عَلَيۡنَا ٱلۡقِتَالَ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖۗ قُلۡ مَتَٰعُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيلٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظۡلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧ أَيۡنَمَا تَكُونُواْ يُدۡرِككُّمُ ٱلۡمَوۡتُ وَلَوۡ كُنتُمۡ فِي بُرُوجٖ مُّشَيَّدَةٖۗ

".....অতঃপর যখন তাদের প্রতি ক্বিতাল (যুদ্ধ)-কে ফরয করা হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমনকি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় আমাদের পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধকে ফরয করলে! আমাদেরকে কেন আরোও কিছুকাল অবকাশ দিলে না (দুনিয়া ভোগ করার জন্য)! (হে রাসূল!), আপনি তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার তো একটি সূতা পরিমাণও খর্ব করা হবে না। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই- যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরেও অবস্থান কর, তবুও।......" (০৪ সূরা নিসা:৭৭-৭৮)

• এটি কি ব্যক্তিপূজা নয়?

তৃতীয় কথা হলো, "আমার ইসলাহী শাইখ হুকুম না করলে বা পরামর্শ না দিলে আমি জিহাদী মেহনত করবো না, আমার শাইখ জাহান্নামে গেলে প্রয়োজনে আমিও জাহান্নামে যাব" (নাউযুবিল্লাহ্)- এই ধরনের মানসিকতা লালন করা অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বিশেষের আনুগত্যের কারণে আল্লাহর কোনো ফরয বিধানকে ত্যাগ করার দ্বারা ব্যাপারটি দাঁড়ায়- ঐ ব্যক্তিকেই আমি আমার জীবনের বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছি, আল্লাহ্ তা'আলাকে নয়। আমি ঐ ব্যক্তিকেই আমার রব হিসেবে গ্রহণ করেছি, আল্লাহ্ তা'আলাকে নয়।.........

এটি আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক করা। অর্থাৎ এটি এক প্রকারের শিরক্ এবং ব্যক্তিপূজা। যেমনটি এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে-

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে'। (সূরা তাওবাহ ০৯:৩১)

(আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।)

প্রিয় রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - المصنف لابن أبي شيبة: ٣٤٤٠٦

"খালেকের নাফরমানী করে বান্দার আনুগত্য করা যাবে না।" (আল মুসান্নিফ লিবনে আবী শাইবা:৩৪৪০৬)

সুতরাং প্রিয় ভাই! একটি ফরযে আইন আমল 'জিহাদের' ক্ষেত্রে পীর সাহেবের নিষেধাজ্ঞা মানা কিংবা হুকুমের অপেক্ষা করার সুযোগ শরীয়ত দিয়েছে কি আমাদের??..............

ইসলামী রাজনীতি করনেওয়ালা সাথীদেরকে শয়তানের ধোঁকা:

• ইসলামের মোড়কে কুফর:

আমার প্রিয় ভাই! এখন আপনাদের সামনে বর্তমান যামানার একটি অন্যতম ভয়াবহ দাজ্জালী ফিতনা নিয়ে কিছু কথা নিবেদন করতে চাই।

আমরা একদল ভাই আছি, যারা প্রচলিত কুফুরি রাজনীতির উপর ইসলামী লিবাস পরিয়েছি।

প্রিয় ভাই! 'সত্তাগতভাবে একটি কুফর'কে ইসলামী পোশাক পরালে তা কখনোই ইসলাম হয়ে যায় না। আমরা সকলেই মানি যে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র- এই তন্ত্র-মন্ত্রগুলো শয়তানী তরীকা। তারপরো, হয়ত 'হিকমাহ' ভেবে, কিংবা সময়ের দাবী মনে করে, কিংবা ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়ে, কিংবা 'তুলনামূলক মন্দের ভালোকে অবলম্বন করা' মনে করে, বুঝে না বুঝে আমরা অনেকে গণতন্ত্রকে মেনে নিয়েছি?.......

আমরা যারা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রকে ধারণ করি সাথে সাথে ইসলামী হওয়ার দাবী করি, তাদের দৃষ্টান্ত হতে পারে "ইসলামী মদ" কিংবা "ইসলামী সুদ"-এর মতো। মদের সাথে কিংবা সুদের সাথে ইসলামী শব্দ যোগ করলেই যেমন তা হালাল হয়ে যায় না, তেমনিভাবে গণতন্ত্রের সাথে কিংবা সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলামী শব্দ যোগ করলে তা যৌক্তিকভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

আমরা সকলেই বলি, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলামে সব সমস্যার সমাধান আছে। কিন্তু দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আসলেই আমরা কেন দ্বারস্থ হই বাতিলের তন্ত্র-মন্ত্রের কাছে? ইসলামে যদি সকল কিছুর সমাধান থেকে থাকে, তাহলে সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠার তরীকা কি ইসলামে নেই??....

অবশ্যই আছে...........

দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে।

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ الْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

হযরত হারেস আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: আমি তোমাদের (দ্বীন কায়েমের) জন্য পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে ঐগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। (সে কাজগুলো হচ্ছে-)

ক. আল জামা'আহ (সংগঠন/ঐক্য): একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

খ. আস্ সামউ': আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা।

গ. আত-ত্ব-আহ্: আমীরের নির্দেশ পালন করা।

ঘ. আল হিজরাহ: হিজরত করা।

ঙ. আল জিহাদ: আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা।

(তিরমিযি ২৮৬৩, আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন; মুসনাদে আহমদ ১৭২০৯; জামেউল আহাদীস ৪৪; সহীহ ইবনে হিব্বান ৬২৩৩; সহীহ ইবনে খুযাইমা ১৮৯৫; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৫১৪১)

প্রিয় ভাই!

আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীর দিকে আমরা তাকিয়ে দেখি। দ্বীন কায়েমের মেহনত শুরু হয়েছিল প্রথমে গোপনে একান্ত আপনজনদের কাছে দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে। এরপর নিকটাত্মীয়দের কাছে তাওহীদ ও রিসালাতের প্রকাশ্য

দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে। যার ফলে মুসলমানদের উপর চলে সীমাহীন যুলুম-নির্যাতন। হিজরতের আগ পর্যন্ত দাওয়াত ও সবরের মেহনতই চলেছে। অতঃপর মদীনায় হিজরতের পর প্রথমে কেবল প্রতিরোধ জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়। এরপর প্রতিরক্ষামূলক জিহাদকে সক্ষম সকলের উপর বাধ্যতামূলক (ফরযে আইন) করা হয়। সর্বশেষে আক্রমণাত্মক জিহাদের হুকুম দেয়া হয়, যাতে করে দুনিয়ার সমস্ত ফিতনা মিটে যায় এবং সারা বিশ্বে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হয়। সুতরাং দ্বীন পূর্ণতা পেয়েছে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্'র মাধ্যমে। দ্বীনের পূর্ণতা বিধানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিহাদ ও ক্বিতালকেই সর্বশেষ সমাধান হিসেবে আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। সমাজে পরিপূর্ণরূপে দ্বীন কায়েমের জন্য প্রিয় নবী ﷺ যেই তরীকায় মেহনত করেছেন, তা মূলত উপরের সেই পাঁচটি ধাপেরই প্রতিফলন।

প্রিয় ভাই! আল্লাহর রাসূল ﷺ জীবনে একটি মুহূর্তের জন্যও বাতিলের সাথে এই মর্মে সমঝোতা করেননি, তোমরা আমাদের ধর্মের কিছু মেনে নাও, আর আমরাও তোমাদের ধর্মের কিছু মেনে নিচ্ছি। অন্যদিকে, আমরা কার্যত অনেক বিষয়কে কুফর জানা সত্ত্বেও দ্বীনের স্বার্থে(?) মনে করে গ্রহণ করে নিয়েছি। কিন্তু কেন? এর কারণ হল- ছোট থেকে ছোট একটি কুফর যে কতটুকু ভয়াবহ ব্যাপার, সে বিষয়টি আমরা অনুধাবন করি না; একটি ছোট থেকে ছোট শিরক যে কতটা মারাত্মক জিনিস, সে বিষয়টি চিন্তা না করে তাকে আমরা হালকা বানিয়ে ফেলি। তাই গনতন্ত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই, সেটি হল: একটি গুনাহের স্তর অনুধাবন করা। আল্লাহ্ পাক সহজ করুন। আমীন।

• কোনটা বেশি খারাপ? কে অধিক মন্দ?

হায়! আমরা একেতো কোন্ আমলের গুরুত্ব কতটুকু তা বুঝি না, এর চেয়েও খারাপ কথা হলো, কোন্ গুনাহটা কতটা মারাত্মক সেটাও অনুধাবন করি না। কোন্ গুনাহের খারাবী কতটুকু তা উপলব্ধি করতে পারি না। কোন্ গুনাহটা অধিক ঘৃণিত, অধিক জঘন্য তা বুঝি না!!!

আসল ব্যাপার হলো, শয়তান যেমন ভাবে মানুষকে আমলের গুরুত্ব বুঝতে দেয়না, ফলে এর দ্বারা সে মানুষকে অধিক সওয়াবের কাজ থেকে দূরে রাখে; ঠিক একই রকমভাবে শয়তান মানুষকে গোনাহের খারাপী ও ঘৃণার পর্যায় বুঝতে দেয় না, তুলনামূলক ছোট নাফরমানীমূলক কাজগুলোর গুনাহকে বড় করে দেখায় আর তুলনামূলক বড় নাফরমানীমূলক কাজগুলোর গুনাহ সম্পর্কে ভুলিয়ে দেয়, অজ্ঞ কিংবা গাফেল রাখে; ফলে মানুষ তুলনামূলক কম খারাপ কাজকে বেশি ঘৃণার কাজ মনে করে, পাহাড়ের মতো ভারী মনে করে; আর বেশি খারাপ কাজকে কম ঘৃণার কাজ মনে করে, মশা-মাছির মতো হালকা মনে করে। যার ফলে সে ছোট গুনাহ থেকে ঘৃণার সাথে দূরে থাকে আর বড় গুনাহ গুলো অবাধে করতে থাকে। (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক)।

এই কারণেই আমাদের সমাজে অধিক ভয়াবহ গুনাহগুলো অকপটে, প্রকাশ্য দিবালোকে, বাধাহীনভাবে চলে, আর ছোট গুনাহগুলোর ক্ষেত্রে বাধা বেশি আসে। এই কারণেই সমাজে এক ব্যাটা পাতি চোর মার খেয়ে জান হারায়, আর ঘোষখুর রাঘববোয়ালদের 'স্যার স্যার' করা হয়। মা-বাবাকে না জানিয়ে বিয়ে করাকে অনেক বড় দোষ মনে করা হয়, কিন্তু ছেলে-মেয়েরা অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করছে, এটাকে হালকা মনে করা হয়।

ঠিক একই কারণে, আজ অনেক ভাইয়েরা নামাযে হাত উঠানো (রফ্উল ইয়াদাইন) নিয়ে মাহফিলগুলোতে প্রচুর আলোচনা-পর্যালোচনা করে থাকি, উম্মাহকে এর গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করি, কিন্তু কুফরের বিরুদ্ধে চুপ থাকি! উম্মত

নামাযে 'আমীন' জোরে বলে কিংবা আস্তে বলে, এ নিয়ে আমরা অনেক মাথা ঘামাই! কিন্তু উম্মত গণতন্ত্রকে মেনে নিয়েছে, নারী নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছে, এগুলোর বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটা পর্যন্ত করি না!

আবার আরেকদল আছেন, যারা দেশে নাস্তিক-মুরতাদদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে নারাজ! খেলাফে সুন্নত আমাদের কারো কারো কাছে মহা গুনাহ, কিন্তু খেলাফে ঈমান (কুফর) যেন আমাদের কাছে কিছুই না!

যারা সমাজে নাস্তিক-মুরতাদ খুঁজে পান না, তাদেরকে বলি, আমাদের সমাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শানে গোস্তাকী করার মতো লোকের কি অভাব আছে? আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر

"যে কোনো ব্যক্তিই রাসূল ﷺ এর অবমাননা করবে, চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক বা ঠাট্টাচ্ছলে হোক, সে কাফের হয়ে যাবে।" [আসসারিমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল: পৃ.৩১-৩২]

ইমাম ইবনে হুমাম রাহিমাহুল্লাহ লিখেন:

مَنْ أَبْغَضَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَلْبِهِ كَانَ مُرْتَدًّا

"যে কোন ব্যক্তিই রাসূল ﷺ এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে।" [ফাতহুল কাদীর: খ.৪, পৃ: ৪০৭]

যেই সকল মুজাহিদ ভাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবমাননাকারীদের হত্যা করে, তাদেরকে আবার অনেকেই সহ্য করতে পারেন না। তাদের দিলের মধ্যে মানবপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জেগে উঠে। এদের কাছে আল্লাহর রাসূলের শানে গোস্তাকীর গুনাহ অতি হালকা আর আল্লাহর রাসূলের একজন দুশমনের রক্ত ঝরানো তাদের কাছে খুব ভারী ও অমানবিক মনে হয়। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। মুজাহিদদেরকে তারা নৃশংস, মানবতাবিরোধী মনে করেন। তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া ইস্যু করেন, নিন্দাজ্ঞাপন করেন, মিটিং-মিছিল করেন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্। তাদের মতে, আগে সেই সকল জারজদের দাওয়াত দেয়া দরকার ছিল, কেননা তারা তো বুঝে না।

হায়! আমরা আর কত পাশ্চাত্যের গোলামী করে যাবো? আর কত আমরা এভাবে গোমরাহী ছড়াব? ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم

"কোন মুসলমান যদি (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে) কটুক্তি করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে, এবং কোনোরূপ মতভেদ ছাড়াই তাকে হত্যা করা হবে (ওয়াজিবুল-কতল)। এই ব্যাপারে চার ইমাম ও অন্যান্য মাযহাবের একই মত রয়েছে।' [আসসারিমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল (উর্দু তরজমা) : পৃ ৬২]

أن من قَال فِيه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم مَا فِيه نَقْص قُتِل دون اسْتِتَابَة

[الشفا بتعريف حقوق المصطفى - وحاشية الشمني، ٢/٢١٩]

কাজী ই'য়াজ রাহিমাহুল্লাহ তার 'আশ শিফা' নামক কিতাবে বলেন:

"যে কেউ এমন কোনো কথা বলল যা রাসূল ﷺ কে নিন্দা করে বলা হয়, কোনো রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই তাকে হত্যা করা হবে।"

[বিস্তারিত পড়ুন- "প্রিয়নবী ﷺ-কে অবমাননার শাস্তি"- https://bit.ly/shatims]

অর্থাৎ এটি এমন এক ভয়াবহ গুনাহ যে, যারাই এ কাজ করবে, এদেরকে হত্যা করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো পরওয়ানা লাগবে না, কোনো মুজাহিদ বাহিনীর আমীরের হুকুম লাগবে না, যে কেউ যে কোনো সময়, যে কোনো অবস্থায় এদেরকে হত্যা করতে পারবে।
আরেকদল ভাই আছেন যারা মুশরিকদেরকেও প্রকাশ্যে "কাফের" বলতে নারাজ। তাদের মুখে শুনা যায় "হিন্দুদেরকে (প্রকাশ্যে) কাফের বলা উচিত নয়, কেননা তারা এতে কষ্ট পায়।" এটা কোন স্তরের হুসনে মুআশারাত ভাই? কুফর ও শিরকের প্রতি আমাদের কেন এই উদারপন্থা?? আমাদেরকে কি কাফেরদের প্রতি কঠোর মনোভাবসম্পন্ন হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি?? ভয় হয়, এভাবে আমরা নিজেদেরকে 'অতি উদারপন্থী' পরিচয় দিতে গিয়ে আবার 'মুরজিয়া' না হয়ে যাই! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।

যাই হোক, পূর্বের আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক!

মনে করুন! একজন মুসলমান ব্যক্তি নিয়মিত পতিতালয়ে যায়, আরেকজন মুসলমান ব্যক্তি গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনে অংশ নেয় এবং পালার্মেন্টে (সংসদ ভবনে) গিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন প্রনয়ন করেন।

প্রিয় ভাই! আমাদের সমাজে কোনটিকে বেশি খারাপ মনে করা হয়?

শুনতেতো পতিতালয়ে গমনকারী সেই মুসলমানের কাজটাই বেশি খারাপ মনে হয়, তাই না ভাই? কিন্তু প্রকৃত অর্থে, আল্লাহ তা'আলার কাছে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাজটা এতোটাই অপছন্দীয় যে, কেয়ামত পর্যন্ত কোনো মুসলমান যদি প্রতিদিন পতিতালয়ে যায় সেটি আল্লাহর কাছে যতটা না খারাপ, কোনো মুসলমান যদি একবারও গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষ হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয় এবং পার্লামেন্টে যায়, আর আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন রচনা করে, সেটি আল্লাহর কাছে বেশি খারাপ, বেশি জঘন্য। কেন জানেন?

কারণ, প্রথমটি কবীরা গুনাহ, আর দ্বিতীয়টি কুফর। আর কুফরের গুনাহের সামনে গুনাহে কবীরার তুলনা চলে না। পতিতালয়ে গমনকারী মুসলমানের গুনাহ্ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে মাফ করবেন, কিন্তু যে গণতন্ত্রের নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, পার্লামেন্টে যাচ্ছে, আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন রচনা করছে, তাকে আল্লাহ তা'আলা কস্মিনকালেও মাফ করবেন না, যতদিন না সূঁচের ছিদ্রপথে উট গমন করে, তার জন্য আছে চির কালের জাহান্নাম, কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা সেটি! এই ব্যক্তি যতই মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করুক না কেন, যতই হজ্জ-উমরা করুক না কেন, যতই দান-সদকা করুক না কেন, যতই ইবাদত-বন্দেগী করুক না কেন, সে নামায-রোযা যাই করুক, তার কোনো আমলই কবুল হবে না। তার সমস্ত আমল আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দিবেন। কেননা সে কুফুরী করেছে!!!

ভালোভাবে খেয়াল করি, মদ পান করা গুনাহে কবীরা, কুফর নয়। যেখানে মদের বোতলে 'ইসলামী মদ' লেভেল লাগানো দেখে তা পান করলে গুনাহে কবীরা থেকে বাঁচা যায় না, সেখানে কুফরকে 'ইসলামী' নাম দিয়ে অবলম্বন করলে তা কিভাবে জায়েয ও হালাল হবে? জেনে শুনে কোন কুফর/হারামকে ইসলামী নাম দেয়াও কি কুফুরী নয়?

তাহলে কোন মুসলমান যখন গণতন্ত্র নামক কুফরকে ইসলামের লেবাস পরিয়ে একটি কুফুরী কাজ করলো, তখন যদি তাকে বলা হয়, ভাই এই কাজ করাটা পশ্চিমাদের পতিতালয় ও নাইটক্লাবগুলোতে গিয়ে পড়ে থাকা, হাজার বার জিনা করা, মজ-মাস্তি করার চেয়েও জঘন্য, তাই পার্লামেন্টে যাবেন না, যারা আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন রচনা করে তাদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না, ওটা কুফর, ওটা আরো ভয়াবহ গুনাহ্; আমি কি তাকে সদুপদেশ দিলাম

না?..........

হায়! কেন যে আমরা বুঝি না, গণতন্ত্র কুফর! মানবরচিত বিধান কুফর! এটি লক্ষ কোটি বার জিনা করার চেয়েও বড় গুনাহ্, জঘন্য গুনাহ্, অমার্জনীয় গুনাহ্! 'জিহাদের মাধ্যমে খিলাফত কায়েম করাই' প্রকৃত সুন্নতী রাজনীতি। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে বুঝার ও এ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

• গণতন্ত্রের নিষ্পাপ(?) রূপ:

প্রিয় ভাই! এই পর্যায়ে এসে আমরা গণতন্ত্র সম্পর্কে কিছু বিষয় বুঝার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। একজন সাধারণ মানুষকে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি 'গণতন্ত্র কী জিনিস?' তাহলে হয়তো তিনি গণতন্ত্রের এমন একটি রূপ আমাদের সামনে বর্ণনা করতে পারেন, যেমন:

"গণতন্ত্র একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেখানে একটি রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকবে। তারা ক্ষমতার জন্য পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। নির্বাচনের আয়োজন করবে। জনগণ তাদের পছন্দমত যোগ্য নেতা ও দলকে ভোট দিবে। যে দল সর্বাপেক্ষা বেশি ভোট পাবে, সে বিজয়ী হবে আর নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। নেতৃবৃন্দ দেশের সংবিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে; আর জনগণের উন্নতির জন্য কাজ করে যাবে। যেহেতু এখানে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ব্যক্তিদেরকে জনগণই তাদের নিজেদের মধ্য হতে পছন্দমত কাউকে নির্বাচন করছে, তাই এটি জনগণের দ্বারা পরিচালিত জনকল্যাণমূলক, জনগণের সরকার।"

এটি গণতন্ত্রের একটি নিষ্পাপ চেহারা, আপাতদৃষ্টিতে যাকে নির্দোষ মনে হয়। সাধারণভাবে কোন ব্যক্তি যখন গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলেন তখন তিনি শুধু গণতন্ত্রের এই নিষ্পাপ চেহারাকে সামনে রেখেই কথা বলেন।

কিন্তু ভাই, অন্তরে তীব্র ব্যাথা অনুভূত হয়, যেন কষ্টে কলিজা ছিড়ে যায় তখন, যখন একজন আলেম কিংবা একজন সাধারণ দ্বীনদার ভাইও গণতন্ত্রের শুধু এই নিষ্পাপ রূপটিই দেখেন, এটিকে দেখেই ফতোয়া দেন, এর চেয়ে আর গভীরে প্রবেশ করেন না; ফলে গণতন্ত্রকে ইসলামের সাথে মিলানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেন, কিংবা গণতন্ত্রকে ইসলামীকরণ করার প্রয়াস পান; অবশেষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার দিবা স্বপ্ন দেখেন; আর গণতন্ত্রের পিছনে দৌঁড়ঝাপ করে জীবনের মহামূল্যবান সময়কে নষ্ট করেন ও পরকালকে বরবাদ করেন। অথচ গণতন্ত্রের ভিতরের রূপটি কত যে ভয়ংকর সেদিকে আমরা লক্ষ্য করিনা, হায়! সেখানে রয়েছে প্রতি পদে পদে বে-ঈমান হওয়ার সম্ভাবনা। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

প্রিয় ভাই! গণতন্ত্রের এই নিষ্পাপ চেহারা দেখে আমাদের অনেক ভাই এমন মন্তব্য করেন-

১. ইসলামের খলিফা নির্বাচনের বেশ কয়টি পদ্ধতি রয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে, জনগণ তাদের মধ্য হতে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিটিকে নির্বাচন করবে। এদিক থেকে এটি গণতন্ত্রের সাথে মিলে যায়। তাই, যদি আমরা প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী রাজনীতি করে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করি তাহলে সমস্যা কোথায়?

২. আমরা সামাজিক জীব হিসেবে একটি সমাজ বা রাষ্ট্রে বসবাস করি। প্রতিটি নাগরিকের জন্য যে 'ভোটাধিকার' সরকার প্রদান করে, সেটি তার জন্য পবিত্র আমানত। কেননা আমি যদি ভোট না দেই আর এজন্য যদি একজন অযোগ্য ব্যক্তি ভোটে জয়লাভ করে যায়, আর নির্বাচিত হওয়ার পর সে যদি দুর্নীতি করে, তাহলে এর দায়ভার তো আমার উপরও বর্তাবে, কেন আমি যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে জয়ী করার চেষ্টা করলাম না!

৩. যদি সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচনে অংশ না নেয়, বিশেষতঃ উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার শ্রেণি, যাদের মাঝে আমানতদারিতা আছে, তাহলে ঐ স্থানগুলো অযোগ্য ও খেয়ানতকারীরা দখল করে দেশ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন

করবে। আর এমনটি হলে এর দায়ভার উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার শ্রেণির উপরও বর্তাবে, কেন আমরা এগিয়ে আসলাম না!

৪. পার্লামেন্টে যেতে পারলে আমরা তো আর কুরআনের বিরোধী কোনো আইন রচনা করব না, বরং আমরা যখন দেখব কুরআনের আইনের বিরুদ্ধে আইন রচনা করা হচ্ছে তখন আমরা এর প্রতিবাদ করব। তাই কুরআনের আইনের বিরুদ্ধে যেন আইন রচিত হতে না পারে, সেজন্য পার্লামেন্টে উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার শ্রেণির থাকার আবশ্যকতা রয়েছে।

৫. আমরা দাওয়াত দিতে থাকব। দেশের জনগণ যখন দ্বীনের গুরুত্ব বুঝবে, তখন আমাদেরকে তারা ভোট দিবে এবং আমরা বিজয়ী হব। তখন আমরা দেশে কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠা করব।

৬. এভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে সমাজে ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে। জিহাদ তথা মারামারি-কাটাকাটি ও রক্তপাতের দরকার হবে না। তাছাড়া ইসলাম শান্তির ধর্ম। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সমাজে ইসলাম কায়েম করতে চাই।

৭. যেহেতু আমাদের হাতে এখন নবুওয়তের যামানার ন্যায় জিহাদ করার মত সক্ষমতা ও পরিবেশ নেই, তাই এখন আমাদের হাতে যতটুকু সক্ষমতা আছে, ততটুকু দ্বারাই দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা করে যেতে চাই। এর জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আগানোটাই সবচেয়ে সহজ ও যুগোপযোগী পন্থা হতে পারে। আশাকরি, এই আন্দোলন করতে গিয়ে আমরা যে বাধা-প্রতিবন্ধকতা, নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করব, তাতে আমাদের জিহাদের সওয়াব মিলবে। আর যদি জীবন চলে যায়, এতে আমরা শাহাদাতের মর্তবা লাভ করব ইনশাআল্লাহ।

৮. বর্তমানে উম্মাহ সাধারণ দ্বীনদারিই বুঝে না, অধিকাংশ মুসলমান নামায-কালামই ঠিকমত পড়ে না, তাই জিহাদের পদ্ধতিতে যদি আমরা সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে যাই, তাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে, মানুষ ইসলামের একটি নেগেটিভ দাওয়াত লাভ করতে পারে। তাই আগে মানুষদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে দ্বীনদারি বুঝাই, কুরআনের আইনের গুরুত্ব বুঝাই, ইসলামপন্থি সরকারের গুরুত্ব বুঝাই, যখন অধিকাংশ মানুষ দ্বীন বুঝবে, ইসলামী আইন ও ইসলামপন্থি সরকারের গুরুত্ব বুঝবে তখন তারাই এগিয়ে আসবে এবং ভোট দিয়ে ইসলামী দলগুলোকে বিজয়ী করবে। এভাবে সমাজে ইসলাম কায়েম করা সহজ হবে।

....

প্রিয় ভাই! এই যুক্তি ও চিন্তাগুলো কি সঠিক? নিয়ত যদি ঠিক থাকে তাহলে কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনীতি করায় কোনো সমস্যা আছে?

....

মুহতারাম ভাই! আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি ও চিন্তাগুলো অত্যন্ত 'যুক্তিযুক্ত' মনে হতে পারে, কিংবা সময়ের দাবী বা হিকমাহ্ মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা হল- আমরা যদি গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতাম, গণতন্ত্রের গূঢ় রহস্য যদি আমাদের সামনে স্পষ্ট থাকত, তাহলে আমরা দ্বীনদার শ্রেণি স্বপ্নেও এ ধরণের চিন্তা করতাম না, নির্বাচনে অংশগ্রহণ তো দূরে থাক, ভোট দেয়ার কথাও কখনো ভাবতাম না; বরং উল্টো আমরাই বলতাম- হায়! আমরা যারা এ ধরণের চিন্তা লালন করি, তারা মারাত্মক ভুলের মাঝে আছি, আমরা ভয়ঙ্কর রকমের আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগছি, আমরা যামানার ভয়ানক এক ফিতনায় ফিতনাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, এবং ইবলিশ শয়তান অত্যন্ত সুকৌশলে আমাদের ঈমান নষ্ট করে দিচ্ছে। (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ)

তাহলে, গণতন্ত্রের আসল চেহারা কী? কী সেই ভয়ঙ্কর রূপ? ....

প্রিয় ভাই! এই বিষয়গুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া দরকার। তাই পরবর্তী আলোচনায় আমরা আপনাদের সামনে গণতন্ত্রের মূল রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্ তা'আলাই তাওফীকদাতা।

• গণতন্ত্রের প্রকৃতরূপ:

প্রিয় ভাই! আমরা এতক্ষণ গণতন্ত্রের যে আলোচনা করলাম (গণতন্ত্রের নিষ্পাপ রূপ: শিরোনামে) সেটি গণতন্ত্রের পরিচয় নয়, বরং সেটিকে 'সমাজে/একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়নের একটি মডেল' বলা চলে। অথবা এটিকে গণতন্ত্র নামক একটি দেহের বাহ্যিক কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলা যায়। অর্থাৎ গণতন্ত্রের একটি দেহ আছে, যে সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা এতক্ষণ করলাম, আরেকটি রূহ বা আত্মা আছে- যার আলোচনা আমরা সামনে করব ইনশাআল্লাহ। এই রূহ বা আত্মাই গণতন্ত্রের আসল পরিচয়। যদি কখনো গণতন্ত্র নিয়ে ভাবতে হয়, তাহলে এই রূহটি নিয়েই ভাবা উচিত, যদি কখনো গণতন্ত্রের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত বা ফতোয়া তলব করা হয়, তখন এই রূহ বা আত্মার বিচার-বিশ্লেষন করেই সিদ্ধান্ত বা ফতোয়া দেয়া উচিত। কেননা রূহ ছাড়া দেহের কোনো মূল্য নেই। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে অনর্থক আবেগ ও অদুরদর্শিতা থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

প্রিয় ভাই! গণতন্ত্রের রূহ বা আত্মা সম্পর্কে নিচের পয়েন্টগুলো ভালোভাবে আমরা খেয়াল করি ইনশাআল্লাহ্-

গণতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র শিরকী ধর্ম:

মূলত (তাত্ত্বিকভাবে) গণতন্ত্র বলতে বোঝায় জনগণের শাসন। গণতন্ত্রের ইংরেজি পরিভাষা ডেমোক্রেসি শব্দটির জন্ম গ্রীক শব্দ ডেমোক্রাটিয়া থেকে, যার অর্থ জনগণের শাসন। ডেমোস (Demos) বা জনগণ এবং ক্রাটিয়া (Kratia) তথা শাসন বা ক্ষমতা থেকে ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র নামটির জন্ম। এথেন্স সহ কিছু প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রে প্রচলন হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার। পরবর্তীতে এর সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

আব্রাহাম লিংকনের ভাষায়, "Government of the people, by the people, for the people". অর্থাৎ জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য গঠিত, জনগণ দ্বারা পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা।

তাছাড়া ক্লিয়ান, অধ্যাপক গেটেলসহ আরো অনেকেই গণতন্ত্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন।

প্রিয় ভাই! এটা কুফ্ফারদের দেয়া সংজ্ঞা; তবে আমরা বলব, **গণতন্ত্র কেবলই একটি নিছক শাসনব্যবস্থা নয়, প্রকৃতপক্ষে, এটি হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান ধর্মের মত স্বতন্ত্র একটি শিরকী ধর্ম।** গণতন্ত্রের মেরুদন্ড ও কেন্দ্র কিন্তু কখনো আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী করা নয়, নয় আল্লাহ তা'আলার গোলামী করাও। বরং তা হচ্ছে: **তাঁর পবিত্র সত্ত্বার গোলামীর স্থলে মানুষের গোলামী করা। এখানে সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে প্রতাপশালী শ্রেনীর অভিলাষগুলো পূরণ করা। এক কথায় গণতন্ত্র হলো: لااله الاالانسان অর্থাৎ 'মানুষ ছাড়া কোন মাবুদ নাই' এর বাস্তব নমুনা। কেননা, এখানে মানুষরূপী শয়তানদের অভিলাষ ও কামনার ইবাদত করা হয়।**

কি ভাই, অবাক হচ্ছেন?...........

ইনশাআল্লাহ্, নিচের আলোচনা দ্বারা বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

একটি ধর্মে যেমন একজন 'রব' বা প্রভু থাকে, তেমনি গণতন্ত্রেরও একটি রব বা প্রভু আছে, আর সেটি হল 'আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানসমূহের বিরুদ্ধে আইনপ্রণয়নকারী সম্প্রদায়'।

একটি ধর্মের যেমন ধর্মগ্রন্থ থাকে, যাকে তার অনুসারীরা অনুসরণ করে জীবনবিধান হিসেবে; তেমনিভাবে গণতন্ত্রের পবিত্র(?) ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে 'মানবরচিত' রাষ্ট্রের সংবিধান।

গণতন্ত্রের আসল হৃৎপিণ্ড হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) এবং পুঁজিবাদ (Capitalism)। আর ধর্মনিরপেক্ষতা মানে এটি কখনোই নয় (যা আমাদের মধ্যে অনেক ভাই মনে করে থাকেন,) "ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীন বা ধর্মের পক্ষপাতশূন্য; যে যার মত নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে, রাষ্ট্র তাতে হস্তক্ষেপ করবে না।" বরং, ধর্মনিরপেক্ষতা বা (Secularism) এর প্রকৃত অর্থ হল-

Secularism is the doctrine that state, morality, education etc should be separated from religion.

অর্থাৎ, "ধর্মের প্রভাব থেকে রাজ্য, নীতি-নৈতিকতা, শিক্ষা ইত্যাদিকে মুক্ত রাখার মতবাদই হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।" যারা এই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা, ব্যক্তিগত জীবনে নামে মাত্র কিছু ধর্ম কর্ম করায় তাদের কোনো আপত্তি নেই। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিকতা, শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে ধর্মকে নির্বাসন দেয়াই এদের মূল লক্ষ্য। ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে নাস্তিকতাবাদের ওতপ্রোত সম্পর্ক বিদ্যমান, কেমন যেন ধর্মনিরপেক্ষতার চূড়ান্ত লক্ষ্যই হচ্ছে নাস্তিক্যবাদ (Atheism)। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতা ব্রেডলেফের মত ছিল, ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস প্রতিহত করাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কর্তব্য। তার মতে, ধর্মের এই সব কুসংস্কারমূলক ধারণা বিশ্বাস যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশিত হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত বস্তুগত উন্নতি সম্ভব হবে না। (ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, মাওঃ মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, পৃ. ৬২৬-৬২৯)

গণতন্ত্রের প্রভুর পরিচয়:

প্রিয় ভাই! গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শিরকী এবং কুফুরী দিকটি হল- আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন রচনা করা। যে সম্প্রদায় আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন রচনা করে, তারাই মূলত গণতন্ত্রের ইলাহ বা প্রভু বা উপাস্য। এরাই তাগুত। (এ সম্পর্কে কিতাবুত তাহরীদ দ্বিতীয় পর্ব: তাওহীদ ও জিহাদ" নামক কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখান থেকে দেখে নেয়া যায় ইনশাআল্লাহ। ডাউনলোড লিংক: https://bit.ly/tahrid2)

এখন প্রশ্ন হল, এই তাগুতগুলো কিভাবে 'ইলাহ' হয়??? এরা কিভাবে নিজেদেরকে রবের আসনে সমাসীন করেছে?? কেন মানবরচিত আইন মেনে নিলে প্রকারান্তরে এই বিশেষ সম্প্রদায়টিকে রব হিসেবে গ্রহন করা হবে?

عن عدي بن حاتم قال :أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال :يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت إنا لسنا نعبدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتستحلون قلت بلى قال فتلك عبادتهم

আদী ইবনে হাতেম (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি খ্রিস্টান ছিলেন) রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তখন আমার গলায় একটি ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি বললেন, হে আদী! এই মূর্তিটি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। আমি তা ছুঁড়ে ফেললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে গেলাম। দেখলাম, তিনি সূরা বারাআ'র (সূরা তাওবা) এই আয়াত তিলাওয়াত করছেন:

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে'। (সূরা তাওবাহ ০৯:৩১)

আমি আরজ করলাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন, তারা তা হারাম করতো আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করতো আর তোমরাও তাকে হালাল মেনে নিতে। আমি উত্তর দিলাম- হ্যাঁ, এমনটি তো হয়েছে। তিনি

বললেন, এটিইতো তাদেরকে ইবাদত করা। (আত্ তারিখুল কাবির লিল ইমামিল বুখারি: ৭ম খণ্ড, ৪৭১ নং হাদীস, সুনানুত্ তিরমিজি: ৫০৯৩)

প্রিয় ভাই!

যারা আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় বিধান রচনা করে, আল্লাহ্ তা'আলার কৃত হালালকে হারাম করে আর হারামকৃতকে হালাল করে, এরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে 'বিধানদাতা'র (আল্ হাকীম) আসনে নিজেকে সমাসীন করলো, যা আল্লাহ্ তাআলার একটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য, যা কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের জন্যই খাস।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ

"......রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই,....". (সূরা বনি-ইসরাইল ১৭:১১১)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেন,"তুমি বল, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন, আপনার হাতেই সমস্ত কল্যাণ। আপনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান"। (সূরা আলে ইমরান ৩:২৬)

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান"। (সূরা মূলক ৬৭:০১)

আল্লাহ তায়া'লা আরো ইরশাদ করেন,

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

"শুনে রাখ, সৃষ্টি যার আদেশ/বিধানও চলবে তার।" (সূরা আল আরাফ ৭: ৫৪)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"আল্লাহ ব্যতীত কারো বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" (সূরা ইউসুফ ১২:৪০)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"আল্লাহ ব্যতীত কারো বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" (সূরা ইউসুফ ১২:৪০)

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"তারা কি জাহেলিয়াতের বিধান চায়? বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম হুকুমদাতা আর কে?" (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৫০)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

"ওদের কি এমন কতগুলো দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি?" (সূরা শুরা ৪২:২১)

মুহাম্মাদ আল আমিন আশ্ শানকিতি রহ. বলেন, "কুরআনের এই আয়াতগুলো যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রণীত এবং রাসূল ﷺ এর মুখনিঃসৃত আইনের পরিবর্তে শয়তান ও তার সহযোগীদের মুখনিঃসৃত স্বরচিত আইনের আনুগত্য করা সুস্পষ্ট শিরক এবং কুফর। এতে কোনো সন্দেহ নেই।" (আদ্বওয়া আল বাইয়ান, চতুর্থ খণ্ড, পৃ.৮২-৮৫)

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শায়েখ রাহিমাহুল্লাহ্ (সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী) বলেন,

القوانين كفر ناقل عن الملة

"মানব রচিত কানূন এমন কুফর, যা (ব্যক্তিকে) ইসলাম ধর্ম থেকে বের করে দেয়।" (আল ফাতওয়া, খ. ১২, পৃ. ২৮০)

এছাড়াও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ., আল্লামা ইবনে কাসীর রহ., আল্লামা যাহিদ কাউসারী রহ., আব্দুল কাদের আওদাহ রহ.-সহ আরো অসংখ্য উলামায়ে কেরামের একই মতামত রয়েছে।

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে এটাও স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে বিধান প্রনয়ন করার কোনো অধিকার দেননি। তাই যারা আল্লাহর আইনকে উপেক্ষা করে নিজেরাই বিধান বানিয়ে নেয়, তারা নিজেরাই বিধানদাতার আসনে বসল, তাই এরা মুশরিক এবং এদেরকে যারা মেনে নিবে, এদেরকে যারা সমর্থন করবে, এদেরকে সহযোগিতা করবে, এদেরকে নিরাপত্তা দিবে, এদের পক্ষে বল প্রয়োগ করবে, এদেরকে ভালোবাসবে, এদের বানানো বিধানে যারা বিচারকার্য পরিচালনা করবে, এদের কাছে যারা বিচার প্রার্থনা করবে, এদেরকে প্রশংসা করবে, এদের বানানো বিধান বাস্তবায়নের মাঝে যারা দেশ ও জাতির সফলতা খোঁজে পাবে, এরা সকলেই আল্লাহর সাথে শিরক ও কুফুরী করল।

(বি.দ্র: যদিও কাজগুলো কুফুরি, যারা এসকল কাজ করবে, এদেরকে আবার আমভাবে কাফের বলা যাবে না, এদেরকে কাফের বলার বিষয়টা কিছু শর্তযুক্ত। এদেরকে তাকফীর করার ব্যাপারে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আর এ বিষয়গুলো বিচার বিশ্লেষণ করা ও কাউকে তাকফির করা হকপন্থী উলামায়ে কেরামের কাজ। আমাদের কাজ হল এগুলো থেকে বেঁচে থাকা এবং হকপন্থী উলামায়ে কেরামের অনুসরণ করা।)

কি ভাই, কথাগুলো কি অনেক কঠিন মনে হল??...........................

তাহলে শুনুন-

'গণতন্ত্র' নামক এই শিরকী ব্যবস্থা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার পোশাকটি নতুন হলেও তার বাস্তবতা ফিরআউন, নমরুদ, সামিরি, শাদ্দাদ, আবু লাহাব ও আবু জাহিলদের মতোই ছেঁড়া ও পুরোনো। নমরুদ কিংবা ফিরআউন যে নিজেকে 'সবচেয়ে বড় রব' দাবী করেছিল-

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

"ফিরাউন বলল, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব (প্রভু)।" (৭৯ সূরা নাযিয়াত:২৪)

নমরুদ ও ফিরাউনের নিজেদেরকে এইভাবে রব দাবী করার গূঢ় রহস্য কী? কিভাবে তারা নিজেদেরকে রব দাবী করল? কোন বিষয়টিকে সামনে রেখে তারা নিজেদেরকে রব দাবী করেছিল, প্রিয় ভাই, আপনি জানেন কি?

তারা কি এই দাবী করেছিল, 'আমি এই আকাশ-যমীন সৃষ্টি করেছি?' ....

তারা কি এই দাবী করেছিল, 'আমি পাহাড়-নদী, বন-বনানী ইত্যাদি সৃষ্টি করেছি?'.............

তারা কি এই দাবী করেছিল, 'আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষন করি, তা দিয়ে তোমাদের জন্য রঙ বেরঙের ফসল উৎপাদন করি। তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করি'? ....

তারা কি এই দাবী করেছিল, ‘আমি তোমাদের মায়ের পেটে তোমাদেরকে তিন অন্ধকারের মাঝে সৃষ্টি করেছিলাম? সুতরাং আমি তোমাদের জন্ম ও মৃত্যুর মালিক?”.............

তারা কি এই দাবী করেছিল, ‘আমি তোমাদের মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করব?”................

না, এগুলোর কোনোটাই ফেরাউন কিংবা নমরুদ দাবী করেনি।

প্রিয় ভাই! আপনি কি বলতে পারেন, তাহলে তারা কোন্ ক্ষেত্রে নিজেদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ দাবী করেছিল??

হ্যাঁ, সেটি হল ‘হাকামিয়্যাহ’র ক্ষেত্রে। বিধান দেয়ার ক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে খোদার আসনে বসিয়েছিল। রাষ্ট্রে কোনো ধর্মীয় আইন চলবে না, চলবে শুধু ফিরাউনের হুকুম, চলবে শুধু নমরুদের হুকুম; তাদের হুকুমই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন, তাদের হুকুমই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংবিধান। এই হল ‘আনা রব্বুকুমুল আ’লা’ (আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু)-র অর্থ।

তাহলে ভাই, যে সকল লোক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন করে পার্লামেন্টে/সংসদে নিজেদের সুবিধামত মনগড়া আইন রচনা করে, তাদেরকে কেন আমরা ‘নব্য ফিরাউন’ কিংবা ‘নমরুদের উত্তরসূরী’ বলব না? নেত্রীগুলোকে কেন ‘লেডি ফিরাউন’ কিংবা ‘লেডি নমরুদ’ বলব না?? ফিরাউন যদি তার রাজ্যের রব (প্রভু) হয়ে থাকে, এরা কেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রভু হবে না? ফিরাউন যদি কাফের হয়, এরা কেন হবে না? ফিরাউন যদি মুশরিক হয়, তাহলে এরাও কেন হবে না???...............

মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহ. লেখেন :

‘প্রত্যক্ষদর্শন ও অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্তমানের পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই দীনহীনতা, নির্লজ্জতা ও সকল নষ্টের মূল। বিশেষ করে এ ব্যবস্থাপনায় সংসদকে আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া সম্পূর্ণরূপে কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাহর ইজমা’র বিপরীত।’ (আদইয়ান কি জঙ্গ : ৫৬)

প্রিয় ভাই! আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না, গণতন্ত্রে আল্লাহর আইন-কানুনকে পার্লামেন্টের মুখাপেক্ষী বানানো হয়। এ ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ এবং তার রাসুলের অকাট্য আইন ও বিধানগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলো সংসদে পাশ হয়। এ কারণে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যদি ইসলামি আইন-কানুনের বাস্তবায়ন থাকেও, এরপরও সেই রাষ্ট্রের গণতন্ত্র বৈধ হয়ে যাবে না। কারণ, সেখানে ইসলামি আইনগুলো এ জন্য বাস্তবায়িত হয়নি যে, আল্লাহ এবং তার রাসুল ﷺ এগুলোর আদেশ করেছেন। বরং এ জন্য হয়েছে যে, অধিকাংশ জনগণ তা চেয়েছে। এরপর যখন তারা আবার ভিন্নটা চাবে, তখন সেই ভিন্ন কিছুই এখানে কার্যকর হবে। তো এই ব্যবস্থায় হাকিমিয়্যাত তথা বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা আল্লাহকে না দিয়ে পার্লামেন্টকে দেওয়া থাকে, যারা অধিকাংশ জনগণের রায়কে মূল্যায়ন করে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

গণতান্ত্রিক প্রভুরা আল্লাহ কর্তৃক অবৈধ ও হারামকৃত বস্তুকে সহজেই বৈধ ও হালাল বানিয়ে ফেলে। একইভাবে অবশ্য পালনীয় ফরজকে হারাম ও অবৈধ বানিয়ে ফেলে। এ কারণেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মদ, ব্যভিচার, সমলিঙ্গে বিয়ে, ভাই-বোনে বিয়ে, ফ্রি মিক্সিং, ফ্রি সেক্স এবং পতিতাবৃত্তি থেকে শুরু করে অনেক জঘন্যকর্মকে বৈধতা দেওয়া হয়, যেগুলোকে আল্লাহ হারাম করেছেন। একইভাবে এতে হদ, কিসাস, জিহাদ থেকে শুরু করে অসংখ্য বিধানকে হারাম বানিয়ে ফেলা হয়, যেগুলোকে আল্লাহ ফরজ করেছেন।

এভাবে গণতন্ত্রে আল্লাহর সঙ্গে সুস্পষ্টরূপে শিরক করা হয়। কারণ, এ ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের অধিকার পার্লামেন্টকে দিয়ে দেওয়া হয়। এটা এমন এক অপরিহার্য মূলনীতি, যা ছাড়া কোনো সরকারকেই গণতান্ত্রিক বলা হবে না। আর

এই গণতন্ত্রের সুরক্ষার জন্য রয়েছে প্রত্যেক দেশে জাতীয় নিরাপত্তাবাহিনী। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও এর সুরক্ষায় সদা তৎপর।

গণতন্ত্রের পবিত্র(?) ধর্মগ্রন্থ:

প্রিয় ভাই! প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের প্রভুরা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন করে থাকে, যাকে তারা নাম দেয় পবিত্র(?) সংবিধান; এটি গণতন্ত্রের পবিত্র(?) ধর্মগ্রন্থ। যেহেতু এই গ্রন্থে কুরআনের আইনের বিরোধী আইনসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়, তাই এটি একটি কুফুরিগ্রন্থ।

মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের সংবিধানের ধোঁকা দেখুন! অনেক মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' লিখা থাকে; যাতে করে সাধারণ জনগণ একে পবিত্র মনে করে। প্রশ্ন করি, একটি কুফুরি কিতাবের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' লিখলেই কি তা হালাল হয়ে যায়?? 'আমি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' বলার পর যদি এই কথা ঘোষণা দেই, সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ, আইন প্রণয়ন বা বিধান দেয়ার অধিকারও জনগনের, ভিন্নভাবে বললে- আমি আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র বিধানদাতা হিসেবে মানি না, কিংবা আল্লাহকেও মানি জনগনের বিধানদেয়ার অধিকারকেও মানি, তাহলে ভাই আপনিই বলুন, এই 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' বলার দ্বারা কী ফায়দা? এটি কি আমার কুফুরি এবং শিরককে মিটিয়ে দিবে?? (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

এইবার আমাদের মূর্খতা দেখুন- গণতন্ত্রের প্রভুরা যখন সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' কথাটি তুলে দেয়ার জন্য সংসদে আইন পাশ করে, তখন আমরা আন্দোলনে রাস্তায় নেমে পড়ি। হায়! এই কুফুরী সংবিধানকে রাষ্ট্র থেকে উচ্ছেদ করার জন্য আমাদের আন্দোলন বা কর্মসূচি কোথায়?? এমন একটি কুফুরি গ্রন্থ থেকে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' তুলে দেয়াই উচিত, কেননা একটি কুফুরি গ্রন্থের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' লিখার দ্বারা বরং 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' কালিমাটির প্রতি এক প্রকারের অবমাননা করা হয়। আমাদের দ্বীনী বুঝ এত কম হলে চলে কি ভাই? দ্বীনের ব্যাপারে যদি আমরা আরো চালাক চতুর ও চৌকষ না হই, যদি এমন লো আইকিউ'র পরিচয় দেই, তাহলে আমরা শয়তান ও তার চ্যালাপ্যালাদের হাসির পাত্র হয়ে যাব!! আল্লাহ্ পাক আমাদের হেফাযত করুন।

গণতন্ত্রের বিচার বিভাগ:

গণতন্ত্রের প্রভুদের বানানো মনগড়া আইন অনুযায়ী যেখানে বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হয়, তার নাম কোর্ট বা আদালত। যেহেতু এখানে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার কার্য অনুষ্ঠিত হয় না, তাই এটি কুফরের আরেকটি মারকাজ।
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"যে সব লোক আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।" (৫ সূরা মায়েদা: ৪৪)

প্রিয় ভাই! আল্লাহর ইচ্ছার (বিধানের) কাছে আত্মসমর্পনকারী একজন খাঁটি মুসলিমের কাছে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট (সংসদ) কিংবা বিচারকেন্দ্র (আদালত)-গুলো 'মন্দির' কিংবা 'গির্জার' মতোই ঘৃণিত, যেখানে কুফর ও শিরক চর্চা করা হয়। বরং, এগুলো মন্দির কিংবা গির্জার চেয়েও ভয়ংকর। কেননা, মন্দির কিংবা গির্জার কুফুরি ও শিরকী কার্যক্রম সাধারণ মুসলমানও বুঝে, এগুলোকে জায়েয করার জন্য কেউ ফতোয়া তালাশ করে না; অথচ পার্লামেন্ট

(সংসদ) কিংবা আদালতের কুফুরি বড় কুফুরি (কুফরে আকবার) ও বড় শিরক (শিরকে আকবার) হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ সাধারণ মুসলমান এগুলোর কুফুরি ও শিরকের দিকগুলো বুঝেই না, যার ফলে তারা দলে দলে এই কুফর ও শিরকী ব্যবস্থার ফাঁদে ফেঁসে যায়, সমর্থন দেয়, এগুলোর মাঝেই দেশ ও জাতির উন্নতি খুঁজে বেড়ায়; এমনকি অনেক আলেম ভাই ও ইসলামপন্থী দল এই কুফুরী ব্যবস্থাকে জায়েয করার জন্য নানা বাহানা ও ছিদ্রান্বেষন করেন এবং এই কুফুরি ব্যবস্থায় অংশগ্রহন করেন। (আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে হেফাযত করেন। আমীন।)

প্রিয় ভাই, আমরা কি তাগুতের সংসদ কিংবা আদালতকে ততখানি ঘৃণা করি যতটুকু একটি শিরকের মূর্তিকে করি?? তাগুত সরকার তথাকথিত পবিত্র(?) আদালত প্রাঙ্গনে ন্যায়বিচারের(?) প্রতীক গ্রিক দেবী থেমিসের মূর্তি কেন বসাবে এই নিয়ে আমরা আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে উঠি! অথচ আমরা এই বোবা মূর্তি স্থাপনের চেয়েও বড় শিরক "আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন রচনা করা এবং মানবরচিত আইনে বিচারকার্য পরিচালনা করা"- এই বিষয়ে কখনো আন্দোলন করিনা। আমরা এই বিষয়টি লক্ষ্য করিনা, এই বোবা প্রভু (থেমিস মূর্তি) ইসলামের বা মুসলমানদের যতটুকু ক্ষতি করছে, তার চেয়ে হাজার কোটি গুণ বেশি ক্ষতি করছে এই বোবা মূর্তির পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা আদালতটি, যে কথা বলে, বোবা নয়, যে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য পরিচালনা করছে, হাজার হাজার নিরপরাধ মুসলমানের উপর যুলুম-নির্যাতন করছে, হাজার হাজার ইসলামপন্থীদের আজীবন কারাবাসের ঘোষণা দিচ্ছে, গোস্তাকে রাসূল-কে হত্যাকারী ও অন্যান্য নবীপ্রেমিক মুজাহিদ ভাইদের মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে, হক্কানী উলামায়ে কেরামদের উপর নির্যাতনের স্টীমরোলার চালিয়ে তাদেরকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে, বাকরুদ্ধ করে দিচ্ছে। যারাই এই কুফুরী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'টু' শব্দ করছে, তাদেরই গলাটিপে ধরছে, রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায়িত করছে। প্রিয় ভাই! আপনিই বলুনতো, এসবের কোনগুলো ঐ বোবামূর্তি করতে পারছে??.............

গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিরক্ষা বাহিনী:

প্রতিটি গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার জন্য তাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা বাহিনী রয়েছে, যারা 'গণতন্ত্র' নামের এই কুফুর ও শিরকী ব্যবস্থাকে নিজেদের জীবন বাজি রেখে প্রতিরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। এদের অনুপস্থিতিতে এই শাসনব্যবস্থা মুহূর্তের জন্যও টিকবে না। এরা মুসলমানদেরকে এই কুফুরি শাসনব্যবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য করে। এরা গণতন্ত্র নামক কুফরকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য প্রয়োজনে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

• গণতন্ত্র বনাম ইসলাম:

প্রিয় ভাই! গণতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে রাত-দিন পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। একটি আরেকটির সম্পূর্ণ বিপরীত। আসুন, এরকম কিছু মৌলিক পার্থক্য জেনে নেয়া যাক-

গণতন্ত্র	ইসলাম
১) গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি 'জনমত'।	১) ইসলামের মূলভিত্তি আল্লাহর অভিপ্রায়।
২) সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নাম 'গণতন্ত্র'।	২) আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্থনের নাম ইসলাম।
৩) সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ।	৩) সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ।

৪) সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ।	৪) সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ।
৫) মানবরচিত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।	৫) আল্লাহ্ প্রদত্ত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।
৬) মত প্রকাশে, ভোট দানে ও নির্বাচনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমান অধিকার স্বীকৃত।	৬) কে কতটুকু অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা লাভ করবে, ইসলামী শরীয়তে তার সুনির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে। তবে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গুনীজনেরা বিশেষভাবে মূল্যায়িত হবেন।
৭) উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েই সমান বিবেচিত।	৭) উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের প্রভেদ বিদ্যমান।
৮) নারী ও সংখ্যালঘুরা সাধারণভাবে সমাধিকার ভোগ করবে।	৮) শক্তি ও মেধার তারতম্যের কারণে নারী ও সংখ্যালঘুরা সংরক্ষণ নীতির অধীনে ভোগ করবে বিশেষ অধিকার।
৯) পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক বিশেষ আদর্শ। নৈতিকতার কোনো বালাই নেই গণতন্ত্রে। যেমন: জরায়ুর স্বাধীনতা বা সমকামিতা কোন মতামতকেই বর্জন করতে বাধ্য নয় গণতন্ত্র।	৯) শ্বাশ্বত আদর্শ নৈতিক মানসম্পন্ন পরমত সমাদৃত, ওহী নির্দেশিত। অনৈতিক পরমত ইসলামে বর্জনীয়।
১০) গরিষ্ঠের সমর্থন সকল বৈধতার মানদণ্ড।	১০) শাশ্বত বা প্রত্যাদিষ্ট বিধান (ওহী) গরিষ্ঠের সমর্থন ছাড়াই বৈধ।
১১) জাগতিক উন্নয়নেই সকল চেতনা সীমিত-এই অর্থে প্রগতি।	১১) জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে চেতনা পরিব্যপ্ত- এই অর্থে প্রগতি।
১২) জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি।	১২) চরম জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি।
১৩) মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার কার্য নিয়ন্ত্রিত।	১৩) আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন দ্বারা বিচার কার্য নিয়ন্ত্রিত।
১৪) সংবিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত।	১৪) প্রত্যাদিষ্ট বিধান (ওহী) কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত।
১৫) জীবনের সর্বস্তরে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক।	১৫) জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোই ইসলামী মূল্যবোধের পরিচায়ক।
১৬) গণতান্ত্রিক বিশ্বাসে ধর্ম অবশ্যই রাজনীতি বিবর্জিত।	১৬) ইসলামী বিশ্বাসে মানুষের প্রথম উপাধি খলীফা/প্রতিনিধি, কাজেই ইসলাম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য।
১৭) অর্থনীতির মূলভিত্তি পুঁজিবাদ ও সুদ; যেখানে ধনীরা আরো ধনী হয়, আর গরীবরা আরো গরীব হতে থাকে। ফলে দারিদ্রতা ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।	১৭) যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি যেখানে সম্পদের সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করা হয়; ফলে ধনী ও গরীবের মধ্যে বিদ্যমান বিভেদ ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেতে থাকে; দারিদ্রতা নির্মূল হয়ে একসময় সকলেই যাকাত দেয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়।

• এই যামানার কুফর বনাম ঐ যামানার কুফর:

প্রিয় ভাই! গণতন্ত্রের কুফর অতীতের সকল কুফরের চেয়ে ভিন্ন। অতীতে কুফরের ধরন ছিল, মানুষ সরাসরি এক ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করত আর কেবল তখনই তাকে কাফির বলা হতো। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের কুফরে সরাসরি আল্লাহ কিংবা তার রাসুলকেও অস্বীকার করা হয় না, ব্যক্তিগত কিছু ইবাদত পালনেও বাধারোপ করা হয় না। দাজ্জালী ফিতনার ধরনটিই এমন। সে শুধু বলবে, তোমরা গণতন্ত্রকে মেনে নাও। গনতান্ত্রিক রাজনীতিতে তোমরা অংশগ্রহণ কর। তোমরা যে কোনভাবে অংশগ্রহন কর না কেন তাতে কোন সমস্যা নেই। চাই দ্বীনদারির সাথে অংশগ্রহন কর কিংবা বদদ্বীনির সাথে- সব কিছুই মেনে নেয়া হবে। ইসলাম নিয়ে অংশগ্রহন করতে চাও? শরীয়তের কথা বলতে চাও? তাহলেও কোন সমস্যা নেই, সবই বরদাশত করা হবে; তথাপি তোমরা গণতন্ত্রে অংশগ্রহন কর! এই ফেতনা আমাদেরকে আরো বলবে, তুমি নামায পড়, রোযা রাখ, হজ্জ কর, যাকাত দাও, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা কর বা মাদরাসার খেদমত কর, আত্মশুদ্ধির মেহনত কর, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত কর, তোমার দাঁড়ি-টুপি-পাগড়ি সবই ঠিক থাক, কোনো সমস্যা নেই! শুধু রাষ্ট্রীয় বিধানের অধিকারটা গণতন্ত্রের প্রভুদেরকে দিয়ে দাও। ব্যস, তোমার ঈমান বের হয়ে গেল, এখন তুমি যত বেশি ইচ্ছা তত নেক আমল কর, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

এই জন্যই প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. مسلم،ج:١ ص:١١٠ صحيح ابن حبان، ج:١٥ ص:٩٦

"ফেতনাসমূহ প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই যা নেক আমল করার, দ্রুত করে ফেল! কেননা, ফেতনাসমূহ অন্ধকার রাত্রির অংশের মত (কালো) হবে (মানুষ বুঝতেই পারবে না যে সে ফেতনায় পতিত হচ্ছে)। ঐ ফেতনার সময় মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, সন্ধায় কাফের হয়ে যাবে। অথবা সন্ধায় মুমিন থাকবে, সকালে কাফের হয়ে যাবে। দুনিয়ার তুচ্ছ লাভের আশায় স্বীয় দ্বীনকে বিক্রি করে দিবে।" (সহীহ মুসলিম, সহীহ ইবনে হিব্বান)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :يأتي على الناس زمان، الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني .سنن الترمذي :ج:٤ ص:٥٢٦

"মানুষের উপর এমন একটা সময় আসবে যখন দ্বীনের উপর অটল থাকা হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মত কঠিন হয়ে যাবে।" (তিরমিযি)

প্রিয় ভাই!

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বর্তমান যামানাই সেই যামানা যখন একজন মানুষ সকাল করছে ঈমানদার হিসেবে, আর বিকালেই কাফের হয়ে যাচ্ছে। কিংবা সন্ধ্যায় মুসলমান আর সকালেই কাফের হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু সে বুঝতেই পারছে না। কেননা, সে তো সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করছে, সিয়াম পালন করছে। সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ-তাহলীল আদায় করছে। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক নেক আমল করার পরও যদি বিধান দেয়ার অধিকার গাইরুল্লাহকে দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তার সমস্ত নেক আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। তার নামের তালিকা কুফুরী করনেওয়ালাদের তালিকায় চলে যাবে। (আল্লাহ্ পাক আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।)

• গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটি ধোঁকার নাম:

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের সঙ্গে অনেক ধরণের প্রতারণা রয়েছে, যা আমাদের দেশগুলোতে খুবই স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

মক্কার জাহেলি যুগের পার্লামেন্ট (দারুন নদওয়া) এই কাজই করত। নিজেদের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, দাপট, রাজত্বকে দৃঢ় করার জন্য যা ইচ্ছা হালাল বা বৈধ করে দিত, যা ইচ্ছা হারাম বা অবৈধ করে দিত। তারপর সেই আইন প্রণয়নকে ধর্মের মুখোশ পরানোর জন্য নিজেদের উপাস্যদের দিকে সম্বন্ধ করে দিত যে, এসব তো তোমাদের উপাস্যদের পক্ষ থেকে; যাতে মূর্খ মানুষ তাতে প্রশ্ন করার অবকাশ না পায়।

এখানে সেই ধর্মীয় রাজনৈতিক বাস্তবতা বোঝা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক যুগে ক্ষমতাবানরা আইন প্রণয়নের পর সেটিকে নিজেদের প্রভুদের প্রতি সম্বন্ধ করে থাকে। এ ক্ষমতাবান শ্রেণি সেই আইন প্রণয়নকে সচরাচর নিজেদের দিকে সম্বন্ধ করে না। নব্য জাহেলি ব্যবস্থায় হাকিমিয়্যাতের সব ক্ষমতাকে জনগণের দিকে সম্বন্ধ করা হয়। আর এটিই হলো এ জাহেলি ব্যবস্থার প্রধান প্রতারণা। বাস্তবতা হলো, সব ক্ষমতা নেতাদেরই হাতে। আরেকটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, গণতন্ত্রের আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা মূলত নেতাদের হাতেও নয়, আন্তর্জাতিক একটি মহলের হাতে, দিবানিশি যাদের দাসত্ব করে যায় আমাদের গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ, হোক সে ইসলামী কিংবা অনৈসলামিক দল। কেননা তারা বিদেশী প্রভুর বাঁধা-ধরা এবং নির্দেশিত আইনের বাহিরে নিজেদের পছন্দমত কোনো আইনই সংসদে পাশ করতে পারে না, ইসলামী আইনতো আরো বহু দূরের কথা!

প্রিয় ভাই! 'কোনো জাতির নেতৃস্থানীয় লোকজন আল্লাহর কিতাব ছেড়ে নিজেরাই কেন স্বতন্ত্র শরিয়তপ্রণেতা হয়ে যায়? কেন তারা আইন প্রণয়নে হাত দিয়ে দেয় এবং আল্লাহর সেই ক্ষমতাকে নিজেদের হাতে তুলে নেয়? এর কারণ হলো, সেই ক্ষমতার মাধ্যমে তারা নিজেদের দাপট-কর্তৃত্বের ভিত্তি মজবুত করতে চায় এবং নিজেদের ও সমমনাদের প্রবৃত্তির সুরক্ষা দিতে পারে; ইচ্ছামতো আইন তৈরি করতে পারে এবং সাধারণ মানুষকে নিজেদের দাস বানিয়ে রাখতে পারে। তারপর সেই আইন প্রণয়নকে সম্মানিত করার জন্য সেটাকে কোনো ধর্ম বা কোনো মতবাদের মুখোশ পরিয়ে দেয়; যাতে মানুষ ধর্মীয় শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে সেটার ইবাদত করে এবং সেটার বিরোধিতাকে পাপ মনে করে। ফলে সাধারণ মানুষ পুরো জীবন নেতৃত্বস্থানীয়দের সেবাদাস হয়েই থাকে।

এ ক্ষমতা অর্জিত হওয়ার পর ক্ষমতাশীলরা শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আইন প্রণয়নই করে না; বরং সমাজকে নিজেদের ক্ষমতার ক্রীড়নক বানাতেও নিজেদের পক্ষ থেকে আইন বানিয়ে নেয়। তারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই পরিপূর্ণ একটি ধর্ম বানিয়ে নেয়।

কখনো কখনো মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংবিধানে কিছু কিছু ইসলামী আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু আইনের ধারা রাখা হয়। এর দ্বারা মূলত সেখানে দ্বীনি দলগুলো এবং জনগণের চোখে ধুলো দেওয়া হয়ে থাকে। অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের জনগণ ইসলামকে মহব্বত করেন। এমতাবস্থায় যদি শরয়ী আইন-কানুনকে পূর্ণাঙ্গরূপে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে দ্বীনি দলগুলো গণতন্ত্রের প্রভুদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি এখানে শরয়ী সকল আইন-কানুন বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক প্রভু সম্প্রদায় (আমেরিকা ও পশ্চিমারা) এটা কখনোই গ্রহন করে নিবে না। তাই এখানে এর সহজ সমাধান হলো-শরীয়তের কতক আইন-কানুনকে দেশীয় আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে, কিন্তু বাস্তবে তার উপর আমল কখনো করা হয় না। বিষয়টি যেন এমন হলো যে, এর দ্বারা দ্বীনদারদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে, অন্যদিকে দ্বীনের দুশমনরাও অসন্তুষ্ট হবে না।

• একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইসলামের করুন দশা:

** আসলে গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা হলো সেই পুরোনো জাহিলিয়্যাতের নতুন সংস্করণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যদিও ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার দাবী করে, সকল ধর্ম সমান অধিকার লাভ করবে বলা হয়ে থাকে; কার্যত এটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আরেকটি বড় ধোঁকা। গণতন্ত্র প্রায় সকল মত ও পথকে অনুমোদন দেয়, কেবল ইসলাম ছাড়া। যদিও নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমল করতে নিষেধ করা হয় না বা বাধা দেয়া হয় না, কিন্তু ইসলামের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থান, কর্তৃত্ব ও বিধানসমূহকে গণতন্ত্র কোনো অবস্থাতেই মেনে নেয়না বা সহ্য করে না। আর যে সকল মুসলমান ইসলামের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থান, কর্তৃত্ব ও বিধানসমূহ নিয়ে কথা বলেন, তাদেরকেই মৌলবাদী, জঙ্গী ইত্যাদি ট্যাগ প্রদান করা হয়, তাদেরকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যায়িত করা হয়, যুলুম নির্যাতনের শিকার করা হয়, জেলবন্দী করা হয়, শহীদ করে দেয়া হয়। এটাই গণতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ।

** গণতন্ত্র একদিকে ইসলামকে দমন করে, অন্যদিকে ইসলামবিরোধী সকল প্রকার পাপাচার ও অশ্লীলতাকে প্রমোট করে। গণতন্ত্রের কর্তৃত্বকালীন মানুষ শুধু পাপাচারেই লিপ্ত হয় না; বরং পাপাচার প্রসার করার দাওয়াত, তার প্রতি অনুরোগ ও উৎসাহিতকরণ এবং পাপাচারের সব উপকরণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জোগাড় করা হয়। পাপাচারের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার দাওয়াত, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এগুলো প্রচার ও সুরক্ষাদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব সাব্যস্ত করা হয়। সুদের ভাগাড় (ব্যাংক) হোক বা বেহায়াপনার আখড়া (মালিশকেন্দ্র, সিনেমাহল, ক্যাবল, টিভি, ইন্টারনেট, নাইটক্লাব, ক্যাফে ইত্যাদি) হোক বা গানবাজনার অনুষ্ঠান হোক—এদের কারও কোনো আশঙ্কা হলে রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের নিরাপত্তা দেওয়াকে নিজেদের ওপর ফরজ মনে করে। এমন মুহূর্তে কোনো ঈমানদার পাপাচার রুখতে উঠে দাঁড়ালে তাকে লাল মসজিদ ও জামিয়া হাফসার মতো টার্গেট করা হয়।

** অনেক মানুষ ধারণা করে, ডেমোক্রেসি মানে- স্বাধীনতা, মুক্ততা! এটি একটি ভুল ধারণা। যদিও 'স্বাধীনতা' ডেমোক্রেসির উদ্ভাবিত একটি পণ্য। আমরা এখানে স্বাধীনতা বলতে বুঝাতে চাই: বিশ্বাসের স্বাধীনতা, চারিত্রিক স্খলনের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা। ইসলামী সমাজের উপর এগুলোর নেতিবাচক প্রভাব অনেক। এ প্রভাব মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে রাসূলগণ, তাদের রিসালাত, কুরআন, সাহাবায়ে কেরামের উপর দোষারোপ করার পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। স্বাধীনতার নামে বেপর্দা, বেহায়াপনা, খারাপ ছবি ও ফিল্ম অনুমোদন দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এভাবে এর তালিকা লম্বা হতেই থাকে। এ সবগুলো উম্মতের দ্বীনদারি ও চরিত্র ধ্বংস করার অপচেষ্টা। পৃথিবীর নানা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক শাসনের আড়ালে যে স্বাধীনতার দিকে আহ্বান জানায় সে স্বাধীনতা আবার সবক্ষেত্রে নয়। বরং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির শিকলে এ স্বাধীনতা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরআনকে অবমাননা করার অনুমোদন দান করে; কিন্তু 'মুশরিক নেতা শেখ মুজিব'কে নিয়ে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিষেধ। বরং যে কেউ মুশরিক নেতা শেখ মুজিবকে নিয়ে কোনো বাস্তবসম্মত মন্তব্যও করবে তাকে দেশদ্রোহী'র তকমা লাগানো হয়, তাকে শাস্তি দেয়া হয়, জেলে পুরা হয়।

যদি আসলেই তারা স্বাধীনতার আহ্বায়ক হতো তাহলে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণকে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেদেরকে নেয়ার সুযোগ দিল না কেন?! কেন তারা মুসলমানদের দেশগুলোকে উপনিবেশ বানাল, তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করল? ইতালিয়ানরা যখন লিবিয়ার জনগণকে হত্যা করছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায়

ছিল? ফ্রান্স যখন আলজেরিয়াতে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল অথবা ইতালিয়ানরা মিশরে গণহত্যা চালাচ্ছিল বা আমেরিকানরা যখন আফগান ও ইরাকে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিল?

** একটি গণতান্ত্রিক মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে একজন মুশরিক নেতার যতটুকু সম্মান ও ইজ্জত আছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﷺ ততটুকু সম্মান ও ইজ্জত নেই। বিদেশী প্রভুদেরকে খুশি রেখে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ শানে গোস্তাকদেরকে (অবমাননাকারী নাস্তিক-মুরতাদদেরকে) রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরাপত্তা দেয়া হয়, অন্যদিকে গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক প্রভুদের মনোরঞ্জন করার জন্য নবীপ্রেমিক তাওহীদী জনতার উপর হামলা করা হয়, তাদের উপর অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালানো হয়, তাদেরকে শহীদ করা হয়। অথচ এই লোকগুলোই নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে। প্রিয় ভাই! আল্লাহর রাসূলের শানে গোস্তাকী করনেওয়ালাদের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করে, তাদেরকে যারা তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়, সেই সকল ভাইদেরকে কি আরেকজন ঈমানদার অত্যাচার নির্যাতন করতে পারে কিংবা হত্যা করতে পারে? যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দুশমন তারাই কেবল এমন কাজ করতে পারে!! তাহলে ভাই! গণতন্ত্রের যারা সুরক্ষা দেয়, যারা গণতন্ত্রের পক্ষে লাঠি ধারণ করে আর তাওহীদবাদী মুসলমানদের যারা মাথা ফাটায়, সেই সকল প্রতিরক্ষা বাহিনীকে কেন (দলগতভাবে) কাফের বলা হবে না???............

** মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরিয়তকে প্রতিহত করার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সকল শাখা (তথা সরকার, প্রশাসন, বিচারবিভাগ, গণমাধ্যম) নিজেদের মতো করে কাজ করে যায়। তেমনিভাবে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা, ইসলামের নিদর্শনাবলি (দাড়ি, টুপি, হুদুদ, কিসাস)-কে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা, উম্মাহকে জিহাদ থেকে দূরে সরানোর বিভিন্ন পায়তারা করা, মাদরাসা, উলামা ও দীনি শিক্ষার প্রতি ঘৃণা ছড়ানো ওদের মৌলিক মিশনের অন্তর্ভুক্ত।'

** এ ছাড়াও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দাঁড়িয়েই রয়েছে সুদ এবং করের ওপর; ইসলামের দৃষ্টিতে যে দুটো অত্যন্ত জঘন্য। যা সমাজকে একেবারে বরবাদ করে দেয়। গরীবের রক্ত চুষে খায় আর পুঁজিবাদীদের রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

** ইসলাম শক্তি প্রয়োগ করে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ প্রদানের শিক্ষা দেয়। তাছাড়া ইসলামে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ প্রদান করা ফরয। কিন্তু গণতন্ত্রে অসৎকাজ, নোংরাকাজ স্বীয় অবস্থায় বহাল থাকা, তার প্রচার-প্রসার হওয়া, এটা অসৎকাজের গণতান্ত্রিক অধিকার। কেননা, গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিই হচ্ছে: Book For Book এবং Tv Channel For Tv Channel অর্থাৎ বইকে তার আপন অবস্থায় এবং টিভি চ্যানেলকে তার আপন অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। তাই এখন যদি কেউ খুব অশ্লীল বই লিখে, তাহলে তাকে লিখতে দাও, এই বইকে প্রচার-প্রসার হতে দাও। যদি তোমার কাছে অশ্লীল মনে হয় তাহলে তুমি এই বই পড়ো না। তার চেয়েও যদি আরো বেশী খারাপ লাগে, তাহলে তুমি এই বইয়ের পরিবর্তে আরেকটি ভাল বই লিখে ফেল। অথবা ধরুন: কেউ খুব অশ্লীল টিভি চ্যানেল খুলল, যেখানে চূড়ান্ত পর্যায়ের অশ্লীল দৃশ্য দেখানো হয় বা তাতে কুফরী মতবাদ ছড়ানো হয়, তাহলে তাতেও কোন সমস্যা নেই। আপনি সেই চ্যানেল দেখবেন না, এটা ছাড়া অন্যান্য চ্যানেল তো আরো অনেক আছে, আপনি সেগুলোর মধ্য থেকে ভালো চ্যানেলগুলো দেখুন। এরপরেও যদি আপনার বেশী কষ্ট লাগে এবং আপনার সক্ষমতাও আছে, তাহলে আপনি একটি ভালো চ্যানেল খুলুন... কিন্তু আপনি এই অশ্লীল চ্যানেলকে শক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করে দিবেন, এটা আপনার জন্য বৈধ হবে না। আইন এটাকে অনুমোদন করবে

না! তা এই জন্য যে, সে যা কিছুই করবে এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের আসল রুপ, যেখানে পবিত্র মানুষকে অপবিত্রতা বরদাশত করতে হয়। আর এটা তো প্রকাশ্য বিষয় যে, অবশেষে এই অপবিত্রতাই প্রচার-প্রসার লাভ করে থাকে। তাছাড়া দুর্গন্ধযুক্ত অপবিত্র স্থানে পবিত্র মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে? এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের আসল চেহারা, যেখানে অকল্যাণের সামনে কল্যাণের হাতকে সম্পূর্ণরূপে বেঁধে দেয়া হয়! অথচ ইসলাম সম্পূর্ণ তার বিপরীত। কারণ, ইসলাম সমাজকে পবিত্র রাখার উপর তাগিদ প্রদান করে। কেননা, ব্যক্তি ও সমাজ সকলের দায়িত্ব হলো: তারা অসৎকর্মের রাস্তা প্রতিরোধ করবে এবং অশ্লীলতা ও নোংরামী যারা প্রচার-প্রসার করে তাদেরকে প্রতিহত করবে।

• গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলোর অবস্থা:

প্রিয় ভাই আমার! এখন আমরা কিছু স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এগুলো ভাই একান্তই আত্মসমালোচনা! ইসলামী রাজনীতি মনে করে গণতন্ত্রকে অবলম্বন করার কারণে আমাদের অশুভ পরিণতি ও আমাদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কিছু আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

প্রিয় ভাই! মেহেরবানী করে আমরা নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করি, বিষয়গুলোর বাস্তবতা অনুধাবন করার চেষ্টা করি এবং নিজেদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বৈশ্বিক জিহাদের একক পতাকাতলে একত্রিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

** প্রচলিত ধর্মীয় রাজনীতির সাথে আমরা যারা সম্পৃক্ত, ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে বাঁধ হওয়ার পরিবর্তে কালক্রমে স্বয়ং আমরাই তার স্রোতে ভেসে যাচ্ছি। আমরা দ্বীনের ধারক-বাহকরা যখন এই পথে পা বাড়াচ্ছি, তখন দ্বীনকে বিজয়ী করা তো অনেক পরের কথা, স্বয়ং আমাদের দ্বীন-ই শংকার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। এই পথে চলার দ্বারা দ্বীনের উন্নতি সাধন করা তো অসম্ভব, কিন্তু এর দ্বারা স্বয়ং আমরা (দ্বীনের ধারক-বাহকরা) ধর্মহীনতা প্রচার-প্রসারের উল্লেখযোগ্য কারণ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছি। আমাদের কারণে কাফিরদের শক্তি-সামর্থ বেড়ে যাচ্ছে এবং অসৎ কর্মকান্ডের উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

এই গণতান্ত্রিক রাজনীতির শয়তানী দিকটা হলো: শরয়ীভাবে পালনীয় আবশ্যকীয় আমল এবং দ্বীনি দায়িত্ব পালন করাটা ধর্মীয় রাজনীতিবিদদের জন্য একটা সময় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যা থেকে মুক্ত হতে পারার মধ্যেই দ্বীনের ধারক-বাহকরা তাদের রাজনৈতিক সফলতা দেখতে পায়!

** আমরা (দ্বীনি রাজনৈতিক দলগুলো) বাতিলদের বিজয় ও ক্ষমতায়নকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জেনে বা না জেনে গ্রহন করে নিচ্ছি। বরং এছাড়া আমাদের আর কোনো উপায়ও থাকছে না।

** গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মাপকাঠি ঠিক করে দেয় স্বার্থ। এ কারণেই আমরা (দ্বীনের ধারক-বাহকরা) যখন এই ময়দানে অবতীর্ণ হই, তখন জুলুম, নির্লজ্জতা, অসৎকাজ এবং কুফরী মতবাদের মত অনিষ্টতা প্রচার-প্রসারকারীদেরকে প্রতিহত করা তো পরের কথা, সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে এ সকল ফ্যাসাদকে 'ফ্যাসাদ' বলে আখ্যায়িত করাটাও আমাদের আয়ত্বে থাকে না। বরং এই ফ্যাসাদগুলো রক্ষা করা যেহেতু আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়, তাই আমরা তাদের (অনিষ্টতা প্রচার-প্রসারকারীগণ)-কে সন্তুষ্ট রাখা নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসাবে স্থির করে নিচ্ছি।

** আমরা (রাজনৈতিক দ্বীনি ভাইয়েরা) সেনাবাহিনী ও ধর্মনিরপেক্ষ মিডিয়াকে সন্তুষ্ট রাখাকে নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্থির করে নিয়েছি। আর এ কারণেই সেনাবাহিনীর নির্লজ্জ অত্যাচার, ইসলামী শরীয়াহর সাথে তাদের শত্রুতার প্রচন্ড যুদ্ধক্ষেত্র অথবা ধর্মনিরপেক্ষ মিডিয়ার নির্লজ্জতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণের ক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকার পরও আমাদের রাজনৈতিক দ্বীনি ভাইদেরকে এই শ্রেণীর লোকগুলির সাথে তাদের সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করতে দেখা যায়!

** একটি সময় এমন ছিল, যখন ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতার মোকাবিলা করাই দ্বীনি দলগুলোর প্রধান টার্গেট হত এবং তারা আল্লাহ তা'আলা থেকে দুরত্ব অবলম্বন এবং দ্বীনের দুশমনদের এই ক্ষমতাকেই অসচ্ছলতা, বেকারত্ব ও নিরাপত্তাহীনতার মূল কারণ হিসাবে বিবেচনা করতেন। কিন্তু ভাই বর্তমান অবস্থা দেখুন! স্বয়ং অনেক দ্বীনি দলগুলোর প্রধানরা পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি সমস্যা বলতেও নারাজ বোধ করছেন! আজ এই সকল ভাইদের মুখে শুনা যায়-সমাজের সমস্যার সমাধান যেন রয়েছে "আইনের শাসন, সম্পদের সুষম বন্টন এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মান"!-ইত্যাদির মধ্যে! বর্তমানে এই সমস্ত কথা-বার্তা অন্য সকল ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিই বলে থাকে। তাহলে এখন বলুন! দ্বীনি দল ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির উদ্দেশ্যের মাঝে আর কোন মৌলিক পার্থক্য বাকি থাকলো কি?!

** বর্তমানে গনতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত আমাদের দ্বীনদার ভাইয়েরা ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের শিকারে পরিণত হওয়ার দৃশ্য সামনে আসছে। আরো আফসোসের কথা হচ্ছে; এ জাতীয় সকল চাটুকারিতা দ্বীনের নুসরতের নামে চলছে! এ জাতীয় সকল বাতিল রাজনীতির জন্য "দাওয়াতি মাসলাহাত" অর্থাৎ 'দাওয়াতী স্বার্থ' পরিভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে! অথচ বাস্তবতা হলো: যে মাসলাহাতের কথা এখানে বলা হচ্ছে, তার সাথে দ্বীনের কোন সম্পর্কই নেই!! পরবর্তীতে এই "দাওয়াতি মাসলাহাত" এমন একটা মূর্তিতে পরিবর্তিত হয়ে যায় যে, ফলশ্রুতিতে দ্বীনদার ব্যক্তিরা তার আরাধনা/পূঁজা করা শুরু করেন। আবার কখনো কখনো তিনি প্রকৃত দাওয়াত ও সুস্পষ্ট মানহাযকে পর্যন্ত ভুলে যান! অথচ দ্বীনের দাঈ'দের জন্য আবশ্যক হলো: দ্বীনের এই দাওয়াত তার আসল তরীকার সাথে জুড়ে দেওয়া; যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছে।

** গণতান্ত্রিক তাগুতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে ইসলামী দলগুলো মন্দকে প্রতিহত করার ও বাতিলের সামনে হুংকার দেওয়ার যে ক্ষমতা ছিল তা হারিয়ে ফেলে। তা প্রথমে আপস-মীমাংসা, তারপর পুনর্মিলন, অবশেষে এটা সহযোগিতায় পরিণত হয়...। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রভুরা অসন্তুষ্ট হতে পারে চিন্তা করে আমাদের এই ভাইয়েরা অসৎকাজে বাধা দেয়ার কথা যেন বেমালুম ভুলে যান, বা সেই ক্ষমতা যেন রহিত হয়ে যায়।

** প্রিয় ভাই! একটি কঠিন বাস্তবতা হল- গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে দ্বীনদার ভাইদের একেবারেই কোন শক্তি-সামর্থ নেই, এটার জানান দেয়। কারণ, গণতান্ত্রিক রাজনীতি শক্তি প্রদান করে না, বরং যে শক্তি ধর্মকে রক্ষা করতে পারে এবং কাফের ও ধর্মের দুশমনদের পথকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে পারে (জিহাদের শক্তি), সে শক্তিকে ছিনিয়ে নেয়। আমাদের গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলোর ভবিষ্যত রাজনৈতিক কর্মপরিকল্পনা কিংবা কর্মসূচির হাজার বছরের রূপরেখার মধ্যেও প্রকৃত জিহাদ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এভাবে গণতন্ত্র সুকৌশলে একটি ঈমানী তেজোদ্দীপ্ত প্রজন্ম থেকে জিহাদকে কেড়ে নিল। আর উম্মত হারাল লাখো লাখো সম্ভাবনাময় মুজাহিদকে। সন্দেহ নেই, ইসলামের উপর এটি গণতন্ত্রের এক বিশাল বিজয়। আর এর কারণ হলাম আমরাই, যারা দ্বীন কায়েমের কর্মপন্থারূপে জিহাদকে নয়, গণতন্ত্রকে বেছে নিয়েছি। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে সঠিক দ্বীনের বুঝ দান করুন। আমীন।

** আরেকদল ভাই আছেন, যারা গণতন্ত্রকেই জিহাদ মনে করেন, মিটিং-মিছিল করে নিজেদেরকে মুজাহিদ মনে করেন। (নাউযুবিল্লাহ্)

এর পরিণতি ভাই অত্যন্ত ভয়াবহ!

এর প্রমান, ইসলামের মোড়কে গণতান্ত্রিক এই ভাইয়েরাই অনেকে আজ সত্য জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতান্ত্রিক প্রভুদেরকে খুশি করতে প্রকৃত জিহাদের বিরুদ্ধে মিটিং-মিছিল-র‌্যালী করছেন, ফতোয়া ইস্যু করছেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রোপাগান্ডা দিয়ে উম্মতকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিষীয়ে তুলছেন। নিজেদের মাদরাসাগুলোকে 'জঙ্গীমুক্ত' (তথা জিহাদমুক্ত!!!) ঘোষণা দিতে খুব তৃপ্তি বোধ করছেন, হক মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে পেরে আনন্দিত হচ্ছেন!

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন, সঠিক ইসলাম বুঝার তাওফীক দান করুন এবং তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। গণতন্ত্রের মতো একটি কুফুরী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার তাওফীক দান করুন। আমীন।

• গণতন্ত্র নিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন....

০১. গণতন্ত্র বনাম মজলিশে শুরা: এই দুটি কি এক???

উত্তর: কিছু মানুষ ধারণা করে- ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্র) শব্দটা ইসলামে 'শুরা' শব্দের প্রতিশব্দ। এটি কয়েকটি কারণে ভুল। কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. শুরা বা পরামর্শ করা হয় নতুন কোন বিষয় নিয়ে, এমন বিষয়ে যে বিষয়ে কুরআন-হাদিসের বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের পার্লামেন্টে (সংসদে) ধর্মের অকাট্য বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। এরপর হারামকে হারাম ঘোষণা করা হয় না, হালাল অথবা ওয়াজিবকে হারাম ঘোষণা করা হয়। এসব আইনের বলে মদ বিক্রির বৈধতা দেয়া হয়েছে। ব্যভিচার ও সুদের বৈধতা দেয়া হয়েছে। এসব আইনের মাধ্যমে ইসলামি সংস্থাগুলো ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের তৎপরতাকে কোণঠাসা করা হয়েছে। এ ধরণের কোণঠাসাকরণ ইসলামি শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। শুরা পদ্ধতিতে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগ আছে কি?!

২. শুরা কমিটি গঠিত হয় এমন ব্যক্তিবর্গদের সমন্বয়ে যাদের মধ্যে ফিকহ, ইলম, সচেতনতা ও চরিত্র ইত্যাদির একটা উন্নত মান বিদ্যমান থাকে। কারণ চরিত্রহীন ব্যক্তি বা বোকার সাথে পরামর্শ করা যায় না; আর কাফের বা নাস্তিকের সাথে পরামর্শ তো আরও দূরের কথা। পক্ষান্তরে ডেমোক্রেটিক পার্লামেন্টে: পূর্বোক্ত গুণগুলোর কোন বিবেচনা নেই। একজন কাফের, দুর্নীতিবাজ, নির্বোধ ব্যক্তিও পার্লামেন্ট সদস্য হতে পারবে। সুতরাং শুরার সাথে এ তন্ত্রের কি সম্পর্ক?!

৩. শাসক শুরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য নন। হতে পারে শুরা কমিটির একজন সদস্য যে পরামর্শ দিয়েছেন তার দলিলের বলিষ্ঠতার কারণে তিনি সেটাই গ্রহণ করবেন। অন্য সদস্যদের মতামতের পরিবর্তে এই মতকে সঠিক মনে করবেন। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'অধিকাংশ সদস্যের' মত চূড়ান্ত মত। জনগণকে এ মত মেনে চলতে হবে।

অতএব, মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে- তাদের ধর্মকে নিয়ে গৌরববোধ করা, তাদের রবের পক্ষ থেকে দেয়া বিধানের প্রতি আস্থা রাখা; এ বিধান তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে যথেষ্ট এবং আল্লাহর শরিয়ত বিরোধী সকল তন্ত্র-মন্ত্র থেকে নিজের মুক্ততা ঘোষণা করা।

০২. 'দুই প্রকারের খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপের পক্ষ অবলম্বন করা'র নীতিতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা যাবে কি??

উত্তর: নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নীতিটির দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে-

১. যে প্রার্থীর আদর্শ অপেক্ষাকৃত কম ইসলাম বিরোধী তাকে ভোট দেয়ার মানে হল, কম খারাপের পক্ষ নেয়া।

২. অন্যদিকে, কাউকে ভোট না দিলে বেশি খারাপ প্রার্থীটি নির্বাচিত হতে পারে ভয়ে কম খারাপকে ভোট দেয়া।

প্রিয় ভাই, উপর্যুক্ত নীতিটি কেবল সেক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে ক্ষেত্রে দুটি পথের একটিকে গ্রহণ না করে উপায় নেই। কিন্তু যদি এগুলো থেকে বেঁচে থাকার উপায় থাকে এবং যে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা না হয়-তাহলে সেক্ষেত্রে এই নীতিটি প্রযোজ্য নয়। ভোটের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগকে এভাবে দেখা যায়: কোন ব্যক্তি একজন মুসলিম ভাইকে মদ খাওয়ার দাওয়াত দিল। সেখানে একটি মদে থাকবে ৫০% এলকোহল এবং অন্য একটি মদে থাকবে ২৫% এলকোহল। সুতরাং সে দাওয়াত গ্রহণ করে ২৫% এলকোহলের মদটি পান করল।

প্রিয় ভাই, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আমাদের কেউ বাধ্য করছে না; তাই কম খারাপকে সমর্থন করার নামে একটি শিরক করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা ভোট না দিলে যে ক্ষতি হবে, তার তুলনায় এই শিরক (আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন তৈরির অধিকার দেয়া) অনেক অনেক বেশি ক্ষতিকর।

০৩. 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা'র নীতিতে গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করা যাবে কি??

গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করে ভালো প্রার্থীকে ভোট দেয়ার দ্বারা 'সৎকাজে আদেশ' এবং অসৎ প্রার্থীকে বিজয়ী হতে না দিয়ে মন্দ প্রার্থীকে বাধা দেয়ার মাধ্যমে 'অসৎ কাজের নিষেধ' করা হচ্ছে বলে আমরা অনেকে মনে করি। এক শ্রেণির ভাইয়েরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা কেবল 'বৈধ' বলেই ক্ষান্ত হননি, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য, পবিত্র দায়িত্ব ও ভোটকে পবিত্র আমানত মনে করেন। শুধু তাই নয়, যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহনের বিরুদ্ধে কথা বলেন, এবং মানুষকে এই সিস্টেমে অংশগ্রহণ করতে বাধা প্রদান করেন, তাদেরকে 'যালিম' সাব্যস্ত করে থাকেন। (নাউযুবিল্লাহ্)

প্রিয় ভাই, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার জন্য প্রথম শর্ত হল- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার পদ্ধতিটি শরীয়ত সম্মত হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হল, ঐ মুনকার (খারাপ) নিষেধ করতে গিয়ে যেন আরো বড় মুনকার (ক্ষতি) না হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করা।

যারা মন্দ প্রার্থী আর ভালো প্রার্থীর কথা বলে নির্বাচনে অংশ নেয়াকে বৈধ করে থাকেন, তাদেরকে এ মন্দ ঠেকাতে শিরক বা কুফরের মতো মূল্য দিতে হয়। যা আরো বড় মুনকার, আরো বড় ক্ষতি। চলুন ভাই দুটি জিনিসকে পরিমাপ করে দেখি!

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

"হত্যা অপেক্ষা ফিতনা গুরুতর।" (সূরা বাকারা ২:২১৭)

মহান আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যাবত না ফেতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন (বিজয়) সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করছেন।" (সূরা আনফাল, ৮:৩৯)

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

قال ابن عباس والحسن :حتّى لا يكون شركٌ

وقال محمد بن إسحاق: حتى لا يُفْتَتَنَ مُؤْمِنٌ عن دينه

ইবনে আব্বাস ও হাসান রাযি. (ফেতনার অর্থ) বলেছেন: 'যতক্ষণ না শিরক নির্মূল হয়।' আর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক রহ. বলেন, 'যতক্ষণ না প্রতিটি মুমিন দ্বীনের ব্যাপারে বিপদের সম্মুখীন হওয়া থেকে নিরাপদ হয়।' (আহকামুল কুরআন ৩/৬৫)

অর্থাৎ উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে "ফিতনা" বলতে আল্লাহ্ পাক কুফর ও শিরককে বুঝিয়েছেন, অধিকাংশ তাফসীরের কিতাবগুলিতে তাই পাওয়া যায়।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ্ রহ. বলেছেন: "যদিও হত্যা করার মাঝে পাপ ও অমঙ্গল রয়েছে, তবে কাফিরদের ফিৎনার (কুফুরী) মাঝে রয়েছে তার চেয়েও অধিক গুরুতর পাপ এবং অমঙ্গল।" (আল ফাতওয়া ২৮/৩৫৫) ।

শাইখ আলী আল খুদাইর তাঁর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এই সাক্ষ্যদানে আহ্বান" কিতাবটিতে শেখ সুলাইমান বিন সাহমান রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন: "আল ফিতনা হল-কুফর। সুতরাং সমস্ত বেদুঈন ও নগরবাসী যদি যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যায়, তা অনেক কম গুরুতর ঐ জমীনে একটি তাগুতকে নির্বাচন করার চেয়ে, যে এমন এক আইনে শাসন করে যা ইসলামের শরীয়ত বিরোধী।"

তাই, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের অজুহাতে শিরক করা যাবে না, তাতে অত্যাচার যতই কমে যাবার সম্ভাবনা থাকুক। এটা এ কারণে যে, মুসলিমরা অত্যাচারের কারণে যে ক্ষতির শিকার হচ্ছে তার চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিরক করার মাধ্যমে।

০৪. 'আমলসমূহ সর্বোপরি নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল' এই ভিত্তিতে আমরা ভালো নিয়তে (ক্ষমতা লাভ করে মুসলমানদেরকে যুলুম থেকে বাঁচানোর নিয়তে/কুরআনের আইন প্রণয়ন করার নিয়তে) গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করতে পারব কি??

উত্তর: প্রিয় ভাই, উত্তম নিয়্যতের দ্বারা কোনো গুনাহের কাজ সওয়াবের কাজে পরিণত হয় না। ইমাম আবু হামিদ আল গাজ্জালী রহ. বলেন, "গুনাহ, এগুলোর প্রকৃতি নিয়্যতের দ্বারা কখনো পরিবর্তন হয়ে যায় না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বাণী: "প্রত্যেক আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল" তিনটি জিনিসের (ইবাদত, মুবাহ ও গুনাহ) এর মধ্যে

কেবল আনুগত্য ও মুবাহ (অনুমতি প্রাপ্ত আমলের) মধ্যে সীমিত, গুনাহের জন্য নয়। এটা এই কারণে যে, আনুগত্য গুনাহতে পরিণত হয় (খারাপ) নিয়্যতের দ্বারা। বিপরীতে একটি খারাপ কাজকে কখনোই নিয়্যতের দ্বারা আনুগত্যে পরিণত করা যায় না।" (এহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ৪/৩৮৮-৩৯১)

প্রিয় ভাই, কুফর হলো সবচেয়ে বড় গুনাহ। গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নে অংশ নেয়া কুফর, এটিকে ভালো নিয়তের দ্বারা জায়েয করা যায় না। কেননা হতে পারে কোনো ব্যক্তি নেক নিয়তের মাধ্যমে সংসদে আইন প্রণয়নের সময় আল্লাহর আইনের বিরোধী আইন প্রণয়নের বিপক্ষে ছিল; কিন্তু আইন প্রণয়নের এই পদ্ধতিটিই তো কুফর। আজ যদি আইন প্রণয়নকারীদের অধিকাংশই আল্লাহর আইনের পক্ষে রায় দেয় (যেহেতু জনগণ কুরআনের আইন চায়), আগামীকালই হয়ত কুরআন বিরোধী আইন জয়যুক্ত হবে। কেননা আগামীকাল হয়ত জনগণ কুরআন বিরোধী আইনই চাইবে। তাই এই পদ্ধতিটিই কুফুরী, যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা বা ক্ষমতার উপর মানুষের ইচ্ছাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর মানুষকে ক্ষমতাবান করা হয়। তাই নেক নিয়ত থাকলেও এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করা কিভাবে জায়েয হতে পারে??

প্রিয় ভাই, নেক নিয়তে (অভাবী মুসলিমদেরকে সাহায্য করার নিয়তে) আমি যদি বাইবেল কিংবা মুর্তি বিক্রি করে টাকা উপার্জন করি, তাহলে আমার এই কাজকে আপনি কি জায়েয বলবেন??.....

০৫. 'নিতান্ত প্রয়োজনে হারাম গ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে'- এই যুক্তিতে গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করা যাবে কি??

উত্তর: কিছু কিছু ভাই মনে করেন, এখন মুসলমানদের জন্য জরুরি অবস্থা বিরাজ করছে, সুতরাং এমতাবস্থায় ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গণতান্ত্রিক রাজনীতি করার অনুমতি রয়েছে। অর্থাৎ যে জিনিসটি হারাম ছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে হালাল হয়ে যাবে।

প্রিয় ভাই, এই নীতি সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। এর কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে এবং কিছু বাধ্যবাধকতা বা সীমা আছে যার কারণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমতঃ অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে 'প্রয়োজন' বা জরুরী বলা যায় না। সুতরাং আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা সত্যিকার প্রয়োজন ছাড়া এই নীতির নমনীয়তাকে ব্যবহার না করি। মানুষের 'প্রয়োজন' বা জরুরি অবস্থা পাঁচ প্রকারের। ১. দ্বীনের জন্য আবশ্যকীয়, ২. জীবনের জন্য আবশ্যকীয়, ৩. মানসিক সুস্থ্যতার জন্য আবশ্যকীয়, ৪. রক্ত (বংশ) বা সম্মান রক্ষার্থে আবশ্যকীয়, ৫. সম্পদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়।

এই সকল প্রয়োজনীয়তা সমান পর্যায়ের নয়। যেমন: কারো জ্বিনা করার কিংবা কোনো মাহরাম মহিলাকে বিবাহ করার অজুহাত কখনো এই হতে পারে না যে, আমার যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সকল প্রয়োজনকেই এই নীতির আওতায় ফেলা যাবে না, এক্ষেত্রে একটি সীমারেখা আছে।

দ্বিতীয়তঃ শিরক বা কুফরের ক্ষেত্রে এই নীতি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শিরক এবং কুফর থেকে নিজেকে রক্ষা করাই সবচেয়ে বড় আবশ্যকীয় ব্যাপার। মানুষের দ্বীন রক্ষা করাটাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। একটি প্রয়োজন রক্ষা করতে গিয়ে আরো বড় প্রয়োজন বিসর্জন দেয়া কখনোই অনুমোদনযোগ্য হতে পারে না। শুধুমাত্র ইকরাহ

(চূড়ান্ত জোর জবরদস্তি)-এর ক্ষেত্রেই এটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। সুতরাং গণতন্ত্র নামক শিরক ও কুফরকে হালাল করার জন্য আমরা এই নীতিটি কিভাবে অবলম্বন করতে পারি?

০৬. 'জোর জবরদস্তি বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে কুফুরী ক্ষমার যোগ্য'- এই নীতিতে কি আমরা গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করতে পারি?

উত্তরঃ প্রিয় ভাই, যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই জোরজবরদস্তি ও নিপীড়নের শিকার হয়, তাহলে তার জন্য এটি হালাল। কিন্তু আমরা যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এই ক্ষেত্রে ইকরাহর (জোর-জবরদস্তি) সংজ্ঞা ও শর্তাবলির কোনো সামঞ্জস্য নেই। প্রথম কথা হল, এই নীতি সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয়, যে স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করে। এক্ষেত্রে তাকে যে জোর করা হয়েছে এবং তার আর কোন উপায় বা ক্ষমতা নেই- সেই প্রমাণ থাকতে হবে। সাধারণত, ভোটের ক্ষেত্রে বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মুসলমানদেরকে জোর জবরদস্তি করা হয় না। বরং এভাবে দাওয়াত দেয়া হয়- 'স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করুন'; কিংবা এ ধরণের স্লোগান শুনা যায়-'আমার ভোট আমি দিব, যাকে খুশি তাকে দিব।'। এসব কথাই ইঙ্গিত করে যে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণকে কোনো কিছু করতে বাধ্য করা হয় না।

ইকরাহ (জোর জবরদস্তি)-এর শর্তের ব্যাপারে ইবনে হাযর রহ. বলেন, "ইকরাহর চারটি শর্ত রয়েছে। যেমন:
১) যে জোর করছে তার ঐ হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা রয়েছে, সেই সাথে যাকে জোর করা হচ্ছে, সে সেটি ঠেকাতে এমনকি পালাতেও অক্ষম।

২) এব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে যে, সে যদি অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে ঐ হুমকি তার উপর পড়বে।

৩) তাকে যে হুমকি দেয়া হচ্ছে তা অতি নিকটে।

৪) যাকে জোর করা হয়েছে তার থেকে এমন কিছু প্রকাশ পাবে না যা দ্বারা বোঝা যায় যে সে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করছে।" (ফতহুল বারী, খণ্ড ১২ ,পৃ:৩১১)

সুতরাং আমরা বলতে পারি, 'জোর জবরদস্তি বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে কুফুরী ক্ষমার যোগ্য'- এই নীতিটি কমপক্ষে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রজোয্য নয়।

০৭. এখন তো জিহাদ করার মতো আমাদের সামর্থ্য নেই, তাই জিহাদ করার সামর্থ্য অর্জন করার আগ পর্যন্ত কি আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনীতি চালিয়ে যেতে পারবো না??

উত্তর: এখানে কেউ এই কথা বলতে পারেন যে, আমাদের জিহাদ করার মতো সাধ্য নেই, আর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা কি কেউ কারো উপর কখনো চাপিয়ে দিতে পারে?

তাহলে এখানে আমার প্রিয় ভাইদের কাছে একটি প্রশ্ন রাখছি...যদি ধরে নেয়া হয় যে, বাতিলদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মত শক্তি আমাদের নেই, তথাপি কি এখানে বাতিলদের সৈনিক হওয়ার এবং তাদের রঙে রঙিন হওয়ার কোন সুযোগ আছে?! বর্তমানে দুর্বলতা ও অক্ষমতার দরুন কি বাতিল শাসনব্যবস্থার অনুগত হওয়ার ও জাহিলিয়্যাতের ঝান্ডাবাহী হওয়ার কোন অনুমতি এই দ্বীন প্রদান করে? এখানে কি এই দু'টি উপায়ই আছে; হয়তো এই বাতিল শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা, আর যদি এটির সক্ষমতা না থাকে, তাহলে নিজেরাই বাতিল শাসনব্যবস্থার হাতিয়ার হয়ে যাওয়া; তার থেকে ভরপুর ফায়েদা (সুবিধা) নেওয়া, গুণগান গাওয়া, তার অনুসরণে গোমরাহীর পথে চলা, তার প্রতিরক্ষা, শক্তি যোগানো ও উন্নতি করা এবং নিজেদের সুবিধা আচ্ছামত ভোগ করা?!

প্রিয় ভাই! না, বিষয়টি কখনো এমন হতে পারে না। এটা আল্লাহর দ্বীন হতে পারে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলার দ্বীন ত্বাগুতদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ও বাতিলদের সাথে শত্রুতা পোষণ করার শিক্ষা দেয়। তাছাড়া এই দ্বীন যার যতটুকু সাধ্য-সক্ষমতা আছে, ততটুকু দ্বারাই জুলুম ও কুফরের বিরোধিতা করাকে ফরয আখ্যায়িত করেছে। শরিয়তের কোন কাজ করার শক্তি, সামর্থ্য, প্রস্তুতি, পরিবেশ নগদ না পাওয়া গেলে মূল কাজ শুরু করা পর্যন্ত এর প্রস্তুতি নেওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। আর যেমন 'অজু নাই' একথা বলে নামাজ থেকে বসে থাকা জায়েজ নেই, অজু করতে হবে। এমনিভাবে বর্তমানেও অনেক স্থানে প্রস্তুতির কারণে জিহাদের মূল কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। তাই প্রস্তুতি আবশ্যক হয়ে গেছে। যেমন ভারতবর্ষে আমরা তো এখন প্রস্তুতির কাজই করছি। বাস্তবতা হল এই প্রস্তুতি সবার উপর ফরজ; সামর্থ্যবান ও সম্ভবপর হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু আমরা অনেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করা থেকে পিছিয়ে আছি।

প্রিয় ভাই আমার!
এই দ্বীন খুবই সহজ-সরল, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন। রহমতে ভরপুর এই দ্বীন কখনো আমাদের উপর এমন কোন বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে না, যা বহন করার সাধ্য/সক্ষমতা আমাদের নেই। মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুধু ঐ সমস্ত বিষয়ের ব্যাপারেই আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, যা আমাদের সাধ্যের ভিতরে ছিল। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলার এই দ্বীন 'দাওয়াত ও জিহাদ'কে ইসলাম হেফাযত করা ও তাকে বিজয়ী করার পন্থা বলে আখ্যায়িত করেছে। দাওয়াত ও জিহাদের এই রাস্তা একটি সম্পূর্ণ প্যাকেজ ও একটি সম্পূর্ণ মানহাযের নাম। এমনিভাবে জুলুম-ফ্যাসাদ দূর করা এবং আল্লাহ তা'আলার হাকিমিয়্যাত তথা আইনের ক্ষেত্রে আল্লাহর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মান-সুখ্যাতি লাভ করাই এই দ্বীনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য দাওয়াত, ই'দাদ তথা প্রস্তুতি গ্রহন করা, হিজরত ও কিতাল করার নির্দেশ দিয়েছে।
দাওয়াত ও জিহাদের এই মানহায একটি পূর্ণাঙ্গ মানহায। তাতে প্রত্যেক দুর্বল ও সবলের জন্য কাজ করার সমান সুযোগ ও ময়দান বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বীন বিজয়ের সফরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চলার পূর্ণাঙ্গ নকশা হলো উল্লিখিত বিষয়গুলো। আর এটি পুরোপুরিভাবে শরীয়তের আলোকে প্রণীত নকশা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

০৮. আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক সরকার তো নামাযে বাধা দেয় না, তাহলে কেন আমরা তার বিরুদ্ধে জিহাদ করব?

যেসকল ভাইয়েরা এই যুক্তিতে জিহাদ হতে পিছিয়ে আছেন, তারা নিম্নের হাদীসটি দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন-

وعن عَوْفِ بنِ مالكٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خِيارُ أئمتكم الذين تُحِبُّونَهُمْ ويُحِبُّونَكُمْ، ويُصَلُّون عليكم وتُصَلُّون عليهم. وشِرارُ أئمتكم الذين تُبْغِضُونَهم ويُبْغِضُونَكم، وتُلْعِنُوْنَهم ويُلْعِنُوْنُكم. قِيلِ يا رسولَ الله، أفلا نُنابِذُهم بالسيف؟ **فقال: لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاةَ**. (صحيح مسلم. رقم الحديث:1855 دار المغني).

আউফ বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে উত্তম শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসবে এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসবে, তোমরা তাদের জন্য দোয়া করবে, তারাও তোমাদের

জন্য দোয়া করবে। আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করবে এবং তারাও তোমাদেরকে অপছন্দ করবে, যাদেরকে তোমরা লা'নত করবে এবং তারাও তোমাদেরকে লা'নত করবে।" বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তরবারি দ্বারা তাদের মোকাবেলা করবো না? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "না, যতদিন তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে।" (মুসলিম শরীফ, অধ্যায়-খিয়ারুল আয়িম্মাহ, হাদীস নং-৪৯১০)

প্রিয় ভাই! এই হাদীস থেকে আমরা অনেকেই এমন একটি ভাবার্থ গ্রহণ করি-

১. 'নামধারী মুসলিম শাসকশ্রেণি যা ইচ্ছা তাই করুক, তাদের যুলুমের মাত্রা যতই হোক না কেন, তারা যতই সীমালঙ্ঘন করুক না কেন, এমনকি যদি তারা কুফুরিও করে, তবুও আমরা জিহাদ করব না, যতক্ষণ না তারা আমাদেরকে নামায আদায় করতে নিষেধ করছে বা বাধা প্রদান করছে।
২. যখন বা যেদিন তারা আমাদেরকে নামায আদায় করতে দিবে না বা বাধা প্রদান করবে, তখন বা সেদিন আমরা শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামব।
৩. এককথায়, তাগুত শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার মাপকাঠি হচ্ছে- এটি দেখা যে, তারা নামায আদায়ে বাধা প্রদান করে কিনা। রক্তপাত এড়ানোর জন্য 'নামাযে বাধা দেয়া' পর্যন্ত আমরা ধৈর্য ধরে যালিমের যুলুমকে সহ্য করে যাব, যদিও সে কুফুরিতে লিপ্ত হয়, যদিও তার কর্মকাণ্ড ইরতিদাদের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, সেগুলো ধর্তব্য নয়।
৪. ইসলাম শান্তির ধর্ম। তাই ইসলাম চায় যতদূর সম্ভব রক্তপাত এড়াতে। তাই আমরাও চাই যতদূর সম্ভব রক্তপাত এড়িয়ে দাওয়াত ও প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে সমাজে শান্তির ধর্ম 'ইসলাম' কায়েম করতে।"

যুক্তিখণ্ডন:

প্রিয় ভাই! এই কথা ঠিক যে, অনেক ফুকাহায়ে কেরামের মতে, রক্তপাত এড়ানোর জন্য যালেম শাসকের যুলুমকে ততক্ষণ সহ্য করা উচিত, যতক্ষণ না তারা নামায আদায় করতে বাধা দেয়; কিন্তু এটি কখনোই সেই শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যার দ্বারা কোনো প্রকাশ্য কুফর প্রকাশ পেয়েছে, যে আল্লাহর কোনো বিধানকে পরিবর্তন করেছে, যে ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে, যে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে, যে নিজেকে বিধানদাতার আসনে সমাসীন করে আল্লাহর সাথে শিরক করেছে। এর প্রমাণ-

উবাদা বিন সামেত রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

(دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ. فكان فيما أخذ علينا أَنْ بَايَعَنَا على السمع والطاعة فِي مَنشَطِنا ومَكْرَهِنا، وعُسرنا ويُسرنا، وَأَثَرَة علينا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَه. قَالَ: إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ). (متفق عليه وهذا لفظ مسلم. رقم الحديث: 1709، تحقيق فؤاد عبد الباقي)

আমাদেরকে রাসূল ﷺ ডাকলেন এবং আমরা তাঁর হাতে বাইআত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের থেকে যে বিষয়ে বাইআত নিলেন তা হলো, আমরা আমাদের পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় বিষয়ে, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপর যদি অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয় তথাপিও (আমীরের কথা) শুনবো ও আনুগত্য করবো এবং আমরা দায়িত্বশীলের সাথে দায়িত্ব নিয়ে বিবাদে জড়াবো না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তবে হাঁ, যদি তোমরা কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭০৯, তাহকিক: ফুআদ আব্দুল বাকী)

প্রিয় ভাই! এবিষয়ে উম্মতে মুসলিমার ইজমা রয়েছে যে, শাসক থেকে যদি 'কুফরে বাওয়াহ' বা সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পায় বা কুরআন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা না করে, অথবা নামাযসহ ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো প্রতিষ্ঠা না করে, তাহলে সে আর মুসলমানদের শাসক হিসাবে বাকি থাকে না; তাই তাকে অপসারণ করে এমন একজন শাসক নিয়োগ দেয়া ফরজ হয়, যে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।

যেমন: ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন-

"قال أبو بكر بن الطيب: أجمعت الأُمَّةُ أنه **يُوجِبُ خَلْعَ الإمامِ وسُقوطَ فرضِ طاعتِه كُفرُه بعدَ الإيمانِ، وتركُه إقامةَ الصلاة والدعاءَ إليها**، واختلفوا إذا كان فاسقًا ظالِمًا غاصبًا للأموالِ". (معالم السنن،كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام).

"আবু বকর ইবনুত তায়্যিব বলেন, উম্মাহর এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, ঈমান গ্রহণের পর শাসক কুফরী করলে এবং নামায প্রতিষ্ঠা ও নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দিলে, তাকে অপসারণ করা ফরজ হয়ে যায় এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যায়।" (মাআলিমুস সুনান, কিতাবুল আহকাম, খণ্ড: ৮ পৃষ্ঠা: ২১৫, মাকতাবাতুর রুশদ)

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

"فإن أَمَرَ بمعصيةٍ فلا تَجُوْزُ طاعتُه في تلكَ المعصيَة قولاً واحدًا، **ثم إنْ كانتْ تلكَ المعصيةُ كُفرًا: وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلِّهم. وكذلك: لو تَرَكَ إقامةَ قاعدةٍ من قواعدِ الدينِ**؛ كإقامة الصلاةِ، وصومِ رمضانَ، وإقامة الحدودِ، ومَنَعَ من ذلكَ. وكذلك لو أباحَ شُربَ الخَمرِ، والزِّنى، ولم يَمنَعْ منهما، **لا يُختَلَفُ في وُجوبِ خَلْعِهِ**". المفهم كتاب الإمارة 39/4 دار إبن كثير

"শাসক যদি গুনাহের আদেশ করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে গুনাহের কাজে তার আনুগত্য করা জায়েয হবে না। এখন সেই গুনাহটা যদি কুফর হয়, তাহলে সকল মুসলমানের উপর ফরজ হলো, তাকে অপসারণ করা। এমনিভাবে সে যদি নামায, রমযানের রোযা, হুদুদ তথা দণ্ডবিধির মতো দ্বীনের মৌলিক কোন বিধান প্রতিষ্ঠা করা ছেড়ে দেয় এবং সেগুলো পালনে বাধা দেয়, তদ্রুপ সে যদি মদপান ও যিনাকে বৈধতা দান করে এবং সেগুলো থেকে বারণ না করে, তখনও তার অপসারণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।" (আলমুফহিম, কিতাবুল ইমারাহ, খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ৩৯, দারু ইবনে কাসির)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন,

وجملةُ الأمر فيه: أن الإمامَ لو أَمَرَ بالكفر البَوَاح، يَجِبُ الخروجُ عليه وخَلْعُه عن الإمارة.

"মোটকথা, ইমাম যদি কুফরে বাওয়াহের আদেশ করে, তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা ফরজ।" (ফয়যুল বারী, কিতাবুল আহকাম: ৪/৪৯৯, মাকতাবায়ে আশরাফিয়্যাহ)

এছাড়াও আরো অনেক উলামায়ে কেরাম এ মাসআলায় ইজমা নকল করেছেন, দেখুন: আত-তাউযিহ, ইবনুল মুলাক্কিন, কিতাবুল ফিতান, খণ্ড: ৩২, পৃষ্ঠা: ২৮২, ওয়াযারাতুল আওকাফ, কাতার; দারু ইবনে কাসির; মাজমুউল ফাতাওয়া, ইমাম ইবনে তাইমিয়া: ২৮/৫০২,৫১০; আল কাশেফ, ইমাম তিবি, পৃষ্ঠা: ২৫৬০; শরহে মুসলিম, ইমাম নববী, অধ্যায় 'উজূবু ত্বাআতিল উমারা': ১২/২২৯, আলমাতবাআহ আলমিসরিয়্যাহ; হাশিয়াতুশ শিরওয়ানী আলা তুহফাতিল মুহতাজ: ১১/৩৪৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ; ফাতহুল বারী, কিতাবুল আহকাম: ১৩/১৫৩, দারুস সালাম, রিয়াদ; ১৩/১২৩, দারুল মা'রেফাহ এবং মাকতাবায়ে সালাফিয়্যাহ ইত্যাদি।

প্রিয় ভাই!

ইমামে আজম আবূ হানীফা রহ.-এর মত হলো, কোনো শাসক যদি জালেম হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ও তাকে অপসারণ করে নতুন খলীফা নিযুক্ত করা ফরজ; যদিও তার থেকে সুস্পষ্ট কোনো কুফর প্রকাশ না পায়। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছাড়াও সালাফে সলেহীনের আরো অনেকেই একই মত ব্যক্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা নাতি; জান্নাতী যুবকদের সর্দার হুসাইন রাযি. এর ঘটনা তো সকলেরই জানা। তিনি ইয়াজিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। অথচ তৎকালীন সাহাবীগণ ইয়াজিদকে কাফের মনে করতেন না। তথাপি পুরো উম্মাহ হুসাইন রাযি.-এর জিহাদকে জিহাদ বলে স্বীকার করেন, তার জিহাদ নিয়ে গর্ব করেন। জান্নাতের যুবকদের সর্দার হুসাইন রাযি.-এর উপরোক্ত আমলই এ ক্ষেত্রে অনেক বড় প্রমাণ।

হযরত যায়েদ বিন আলী রহ. ছিলেন হযরত হুসাইন রাযি.-এর নাতি, বিশিষ্ট তাবেয়ী এবং ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর উস্তাদ। তৎকালীন বনু উমাইয়ার খলীফাদের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. উক্ত জিহাদে নিজের মাল দ্বারা অংশগ্রহণ করেন। এই মর্মে মানুষকে গোপনে ফতওয়া প্রদান করতে থাকেন যে, যায়েদ বিন আলী রহ. কে সাহায্য করা এবং তার সাথে মিলে যালিম শাসকদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরজ। (দেখুন- আহকামুল কুরআন: ১/৭০,৮৪-৮৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

এক বর্ণনায় এসেছে-

سُئِلَ عن الجهاد معه، فقال: خروجه يُضاهِيْ خُروجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ بَدْرٍ.

"ইমাম আবূ হানীফা রহ. কে যায়েদ বিন আলী রহ.-এর সঙ্গে মিলে জিহাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। প্রতি উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তার এই জিহাদ তো বদরের দিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিহাদ সদৃশ।" (দেখুন মানাকিবুল ইমামিল আজাম, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৬০-২৬১)

অন্যদিকে, হযরত মুহাম্মাদ রহ. ও হযরত ইবরাহীম রহ. ছিলেন হযরত হাসান রাযি.-এর নাতি হযরত আব্দুল্লাহ রহ.-এর সন্তান। তারা দুই সহোদর তৎকালীন খলীফা মানসুরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।

এক বর্ণনায় এসেছে,

أن أبا حنيفة كان يَحُضُّ الناسَ على إبراهيم و يأمرهم باتباعه، وذُكَرَ قبلَ ذلك أنه كان يُفَضِّلُ الغزوةَ معه على خمسين حَجَّة.

"ইমাম আবূ হানীফা রহ. জনসাধারণকে ইবরাহীম রহ.-এর পক্ষে উদ্বুদ্ধ করতেন। তার আনুগত্যের আদেশ প্রদান করতেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি তার সাথে মিলে যুদ্ধ করাকে পঞ্চাশটি হজ্জের উপর প্রাধান্য দিতেন।" (মানাকিবুল ইমামিল আজাম, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৮৪)

ইমাম আবূ হানীফা রহ. নিজেও তাদের সাথে মিলে জিহাদ করার জন্য মানুষকে ফতওয়া প্রদান করতেন এবং উদ্বুদ্ধ করতেন। অথচ খলীফা মানসূর ইসলামের কোনো অকাট্য বিধানকে পরিবর্তন করেননি।

এই ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.। যিনি জালিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে বদর যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছেন। পঞ্চাশটি হজ্বের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। মাল দ্বারা সে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। অথচ তৎকালীন শাসকরা ইসলামের কোন অকাট্য বিধানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবর্তন বা অকার্যকর করেনি। তাদের অন্যায় অপরাধগুলো বর্তমান শাসকদের কুফর ও ইরতিদাদের ধারে কাছেও ছিল না। তাদের ব্যাপারে জান্নাতী যুবকদের সর্দার হুসাইন রাযি.

এবং ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অবস্থান যদি এই হয়, তাহলে বর্তমান সময়ের মুরতাদ শাসকদের ব্যাপারে তাদের ফতওয়া কী হতে পারে?

গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শাসকবৃন্দ কেন মুরতাদ?

প্রিয় ভাই! 'নামায প্রতিষ্ঠা না করা বা নামায প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়া'- এটি তাগুত শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করার একমাত্র কারণ হতে পারেনা, কিংবা একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না, কিংবা সবচেয়ে বড় কারণ হতে পারে না; বরঞ্চ এটি জিহাদ শুরু করার জন্য অন্যতম, প্রাথমিক ও ছোট একটি কারণ হতে পারে। এর চেয়ে বড় কিংবা এর উপরের পর্যায়ের কোনো কারণ পাওয়া গেলে অবশ্যই সেটিকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং সেই শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পূর্বের যামানার শাসকবৃন্দ কেবল যুলুম করলেই আমাদের আকাবীরগণ জিহাদ করেছেন, নামায প্রতিষ্ঠায় বাধা দিচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য করেননি, অথচ বর্তমান যামানায় আমাদের শাসকবৃন্দ অগণিত কুফরে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেবল এই অজুহাতে হাত গুটিয়ে বসে আছি যে, তারা তো এখনো আমাদেরকে নামায আদায় করতে দিচ্ছে। এর একটি কারণ হতে পারে, বর্তমান যামানার শাসকবৃন্দ কিভাবে কুফুরী করছে সে বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান না থাকা, কিংবা একটি কুফুরী কত বড় অপরাধ সেই বিষয়ে আমাদের উপলব্ধি না থাকা, অথবা জিহাদবিমুখতার ফলস্বরূপ আমরা নিজেদেরকে একটি বুঝ দিয়ে রেখেছি।

তাই ভাই চলুন, জেনে নেয়া যাক, বর্তমান যামানায় গণতান্ত্রিক মুসলিম দেশসমূহের শাসকদের কাফের (মুরতাদ) হওয়ার কারণগুলো কী কী:

১. ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করা, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার স্লোগান তোলা এবং ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে তারা কাফের।
২. কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করার কারণে তারা কাফের।
৩. কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধর্মীদের তৈরিকৃত আইনের অনুসরণ করার কারণে তারা কাফের।
৪. গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানের মূল ভিত্তি করার কারণে তারা কাফের।
৫. কুরআন-সুন্নাহর আইন ছেড়ে পাশ্চাত্য বিধর্মীদের তৈরিকৃত নীতিমালা দ্বারা বিচারকার্য করার কারণে তারা কাফের।
৬. আল্লাহ তা'আলা যে সব বস্তুকে হারাম করেছেন (যেমন- সুদ, যিনা, মদপান, অশ্লীলতা ইত্যাদি) রাষ্ট্রীয়ভাবে তার অনুমোদন দেওয়া (হালাল বানানো), রাষ্ট্রীয়ভাবে সেসবের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং প্রচার-প্রসার করার কারণে তারা কাফের।
৭. আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তুকে হালাল করেছেন, (যেমন- বাল্যবিবাহ, জিহাদ ইত্যাদি) সেসব বস্তুকে নিষিদ্ধ (হারাম) করার কারণে তারা কাফের।
৮. 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নাম দিয়ে মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সহযোগিতা করার কারণে তারা কাফের।
৯. মুজাহিদদেরকে ধরে ধরে ভারত, আমেরিকা, ইসরাঈলসহ অন্যান্য কাফেরদের হাতে হস্তান্তর করা এবং কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার কারণে তারা কাফের।
১০. পবিত্র জিহাদের হুকুমকে 'জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ' নামে আখ্যায়িত করার কারণে এবং পাঠ্যপুস্তককে জিহাদ মুক্ত করার ঘোষণা দেয়ার কারণে তারা কাফের।

১১. মুজাহিদীনে ইসলামকে ঘৃনা ভরে 'জঙ্গী ও সন্ত্রাসী' ট্যাগ দেয়ার কারণে তারা কাফের।
১২. আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দুশমন থাবা বাবা (রাজীব) এবং এই জাতীয় অন্যান্য শাতিম হত্যাকারী মুজাহিদগণকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দোষী সাব্যস্ত করত ফাঁসি ও অন্যান্য দণ্ডে দণ্ডিত করার অপরাধে তারা কাফের।
১৩. হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা ছিল মূলত ইসলামের মৌলিক কতগুলো বিধানের সমষ্টি। এই ১৩ দফা ও ইসলামের অন্যান্য বিধানাবলিকে নাকচ করা, তের দফাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা এবং তের দফার দাবীদার মুসলিমদের উপর রাতের আঁধারে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করার অপরাধে তারা কাফের।
১৪. বোরকা ও হিজাব পরিহিতা পর্দানশীন নারীদেরকে 'চলন্ত তাঁবু' আখ্যায়িত করে ইসলামের একটি ফরয বিধানকে কটুক্তি করার কারণে তারা কাফের।
১৫. সর্বোপরি জিহাদকে অপছন্দ করা, জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা, যারা আল্লাহর রাজ কায়েমের জন্য জিহাদ করতে চায় তাদেরকে আটক করে নির্যাতন ও হত্যা করার কারণে তারা কাফের।
১৬. হিন্দুদের পূঁজায় অংশগ্রহণ করা এবং পূঁজা উপলক্ষে তাদেরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা, 'গজে চড়ে মা দূর্গা দেশে আসার কারণে এবার দেশের ফসল ভালো হয়েছে' এই জাতীয় আকীদার কারণে তারা কাফের।
১৭. মুসলিমদেরকে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন-কানুন মানতে বাধ্য করার অপরাধে তারা কাফের।
১৮. জাতিসংঘ নামক কুফুরী সংঘের অন্তর্ভূক্ত হয়ে তাদের উদ্দেশ্যের সাথে একমত পোষণ করা, তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথ মসৃণ করে দেয়া, বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করা এবং তথাকথিত 'শান্তিমিশন'(?) এ সেনাবাহিনী পাঠিয়ে মুসলিম দেশগুলোতে অশান্তি সৃষ্টি করা ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করানোর অপরাধে এরা কাফের।
১৯. ইত্যাদি! ইত্যাদি!!

[বিস্তারিত পড়ুন: নেদায়ে তাওহীদ-শাইখ আবু উমার আল মুহাজির: https://bit.ly/nt22]

এককথায়, বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক শাসকদের কুফুরি কর্মকাণ্ডের তালিকা অনেক দীর্ঘ, যা লিখে শেষ করার মত নয়!

'নামায আদায় করতে বাধা দেয়' কেবল এই কারণে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে না, এটি কোন্ যুক্তিতে মেনে নেয়া যায় ভাই? কেবল এই একটি কারণে কী তাদের রক্ত হারাম হয়ে যাবে, যেখানে শত শত কারণে তাদের রক্ত হালাল হয়ে আছে?

প্রিয় ভাই! এদের কুফরের কারণে এরা 'নামায পড়তে দিয়ে' মুসলমানদের যতটুকু উপকার করছে, তার চেয়ে লক্ষ গুণ তারা মুসলমানদের অনিষ্ট সাধন করছে?

ভাই! কেউ আমাকে একদিকে নামায পড়তে দিল, অন্যদিকে ঈমানটা কেড়ে নিল, এর দ্বারা আমার উপকার বেশি হল না ক্ষতি বেশি হল, ঈমানহীন এই নামাযের কী মূল্য আছে?

কাফের ও মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী এই কাজটিই করে থাকে। এরা একদিকে নিজেরা কুফুরি কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়, অন্যদিকে দেশের জনগণকে কুফুরি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ফেলে, কুফরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, কখনো কখনো বাধ্য করে।

আর বিশেষতঃ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসকবৃন্দ সাধারণত নামাযকে নিষিদ্ধ করবে না, কেননা এটি ব্যক্তিগত ইবাদত। আর ব্যক্তিগত ইবাদতের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রভুদের কোনো মাথাব্যাথা নেই। কেননা এর দ্বারা কুফরের রাজত্বের কোনো ক্ষতি সাধিত হয় না। গণতান্ত্রিক প্রভুদের এ্যালার্জী হল ইসলামের রাষ্ট্রীয় বিধানাবলি নিয়ে, তাদের চুলকানি হল রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের হাতিয়ার 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'কে নিয়ে। সুতরাং নামায পড়তে দেয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে না' একথা মেনে নিলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কখনোই জিহাদ ফরয হবে না, আর সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে সকল অনিষ্টের জননী গণতন্ত্রকেও আর হটানো সম্ভব হবে না, রাষ্ট্রে পরিপূর্ণরূপে ইসলামও আর কায়েম হবেনা, 'খিলাফাহ আলা মিনহাযিন্নুবুয়্যাহ'ও আজীবন স্বপ্নই থেকে যাবে।

এটিই চরম বাস্তবতা!!

০৯. হিকমাহ (!), নাকি আত্মপ্রবঞ্চনা ?

অনেক ভাই বলেন, "আরে ভাই! আমরা তো জানি গণতন্ত্র কুফর। কিন্তু এখন যেহেতু খিলাফত নেই, তাই ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে হেকমতের দাবী হিসেবে আমরা গণতন্ত্রকে বেছে নিয়েছি। আমরা ক্ষমতায় যেতে পারলে তখন খিলাফাহ কায়েম করবো।"

এখন প্রশ্ন হল, হেকমতের দাবী হিসেবে গণতন্ত্র অবলম্বন করা যাবে কি?

উত্তর: এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে হিকমাহ কী?

হিকমাত বা হিকমত বা হেকমত, আরবি: حكمة , ḥikma, আক্ষরিক অর্থে প্রজ্ঞা (Wisdom), দর্শন; যুক্তি, অন্তর্নিহিত কারণ ইত্যাদি বুঝায়। অর্জিত গ্রন্থগত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বাস্তবজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান ও গভীর চিন্তার সমন্বয় ঘটিয়ে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষমতা হচ্ছে প্রজ্ঞা। গভীর অন্তর্দৃষ্টি, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির সমষ্টিও হিকমাহ। (উইকিপিডিয়া, https://bit.ly/wikihikma)

বিভিন্ন ইসলামিক পণ্ডিত, গবেষক ও দার্শনিকগণ এটিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

যেমন:

ইবনে মানযুরের মতে,

"হিকমাহ হচ্ছে ভালো ও উত্তম কিছুর বৈজ্ঞানিক বা উচ্চ পর্যায়ের ধারণা রাখা, ঐ রকম চিন্তন ক্ষমতা এবং এর ফল বাস্তবে বাস্তবায়ন।" ('লিসান আল আরব', ইবনে মানযুর, পৃ. ১৫/৩০)

ইবনে ফারিসের মতে,

"হিকমাহ হচ্ছে বাস্তব জ্ঞান এবং এর মাধ্যমে বিচার-বিবেচনা।" (মু'জাম মাক্বাইস আল লুগাহ, ইবনে ফারিস, পৃ. ২/৯১)

পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, বিচারক ও ইসলামিক পণ্ডিত, শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মাদ ত্বকি উসমানী দা. বা. এর মতে,

"হিকমাহ হচ্ছে ফিকহ শাস্ত্রের একটি দিক; যেটি যাবতীয় সব জ্ঞানের সর্বোত্তম ব্যবহারে আইন প্রণয়ন করার সময় প্রণেতারা ব্যবহার করে থাকেন।" [Usmani, Muhammad Taqi (December 1999). The Historic Judgment on Interest Delivered in the Supreme Court of Pakistan (PDF). Karachi, Pakistan: albalagh.net., paras 119-120]

ডক্টর দিপারতুয়ারের মতে-

"এটি হচ্ছে বাস্তবজ্ঞান ও গ্রন্থগত জ্ঞানের প্রয়োগ।" [Asyraf Wajdi Bin Dato' Hj. Dusuki Yang Dipertua. "The Challenge of Realizing Maqasid Shariah in Islamic Finance" (PDF). iais.org.my. Retrieved 27 November 2016.]

ইবনে আল-কাইয়ূম রহ. এর মতে,

"হিকমাহ এর সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে পেরেছিলেন রসূলের সাহাবারা এবং এটিই হচ্ছে আলেমদের জন্য জ্ঞানের বা পান্ডিত্যের সর্বোচ্চ স্তর।" [তাজ আল 'আরুস, পৃ. ৮/৩৫৩]

ইমাম নববী রহ: বলেন-

الحِكمةُ :عبارةٌ عن العلمِ المتَّصِفِ بالإحكامِ، المشتَمِلِ على المعرفةِ باللَّهِ تبارك وتعالى، المصحوبِ بنفاذِ البصيرةِ، وتهذيبِ النَّفسِ، وتحقيقِ الحَقِّ والعَمَلِ به، والصَّدِّ عن اتِّباعِ الهوى والباطِلِ، والحكيمُ مَن له ذلك -شرح النووي على مسلم : 2/33

"হিকমত বলা হয়: আহকাম সম্বলিত ইলমকে যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে চিনা যায়। পাশাপাশি যার সাথে প্রজ্ঞা, আত্মশুদ্ধি, সত্যের অন্বেষণ, সত্যের উপর আমল করা, কুপ্রবৃত্তি ও বাতিলের অনুসরণ থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি বিষয় পাওয়া যায়। আর যার মাঝে এগুলি পাওয়া যায় তাকে হিকমতওয়ালা বলা হয়।" (শারহুন নববী আলাল মুসলিম-২/৩৩)

কুরআন কারীমের বাণীতে 'হিকমাহ'

হিকমাহ হচ্ছে মহান আল্লাহর একটি গুণ। তিনি 'الحكيم (আল-হাকিম)' অর্থ প্রজ্ঞাময়।

সূরা লোকমানে বলা হয়েছে:

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৩১ সূরা লোকমান, আয়াত ২৭)

কুরআন কারীম মানবজাতির জন্য দুরদর্শিতা ও হিকমাহ'র উৎস। যেমন:

يس –وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

"ইয়াসীন, প্রজ্ঞাময় কুরআনের শপথ।" (৩৬ সূরা ইয়াসীন: ১-২)

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

"আল্লাহ পাক আপনার প্রতি আসমানী গ্রন্থ আল কিতাব (কুরআন) ও ঐশী প্রজ্ঞা আল হিকমাত নাযিল করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহ পাকের অসীম করুণা রয়েছে।" (০৪ সূরা আন নিসা: আয়াত ১১৩)

'হিকমাহ' আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ নিয়ামত। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

"তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমাহ (প্রজ্ঞা) দান করেন এবং যাকে হিকমাহ দান করা হয়েছে তাকে অবশ্যই প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে। আর বুদ্ধিমান ছাড়া আর কেউ স্মরণ রাখবে না/উপদেশ গ্রহণ করবে না।" (২ সূরা বাকারাহ :২৬৯)

'হিকমাহ' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কুরআন কারীমের এমন আরো বহু আয়াত রয়েছে।
যেমন: কুরআন কারীমে আরো বর্ণিত হয়েছে-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করুন, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে, তাদের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবে এবং তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (০২ সূরা বাকারাহ: ১২৯)

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াত সমূহ তোমাদের নিকট আবৃত্তি করে, তোমাদের পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়।" (০২ সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৫১)

প্রিয় ভাই! বিভিন্ন মনীষীদের উক্তি ও কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত থেকে আমরা 'হিকমাহ' সম্পর্কে নিচের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি-

** আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে প্রজ্ঞা দান করেন। আর তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন নবী-রাসূল, বিশেষতঃ সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ করেছেন মানবজাতিকে প্রকৃত হিকমাহ তথা প্রজ্ঞা শিক্ষা দান করার জন্য।

** তাই কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামী শরীয়ত- মানবজাতির জন্য হিকমাহ (প্রজ্ঞা) বা দুরদর্শিতার উৎস।

** কুরআন সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়ত মেনে চলাই হল প্রকৃত হিকমাহ। যে সকল কাজ শরীয়ত পরিপন্থী তা আপাতৎদৃষ্টিতে যতই বুদ্ধিদীপ্ত বলে মনে হোক না কেন তা হিকমাহ (প্রজ্ঞা) নয়। অবশ্যই তা জাহেলিয়াত (অজ্ঞতা)। সাময়িকভাবে তাকে হিকমাহ মনে হলেও একসময় অবশ্যই তা জাহিলিয়াত হিসেবে প্রমানিত হবে।

** হিকমাহ হল সঠিকভাবে ইসলাম বা রসুলের সুন্নাহ মেনে চলা। হিকমাহ একেক ক্ষেত্রে একেক রকম হতে পারে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সত্য বলা যেমন হিকমাহ তেমনি জেহাদের ক্ষেত্রে কৌশল হিসেবে মিথ্যা বলাও হিকমাহ। অনেকে হিকমাহর ভুল ব্যাখা করে সত্যকে পাশ কাটিয়ে যান বা আড়াল রাখেন, সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেন না।

** হিকমাহ হল- আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনের বিশেষ পদ্ধতি; এ হিসেবে সুন্নাহই হল হিকমাহ।

** কুরআন, হাদীস, মনীষীদের বিভিন্ন উক্তি ও বাস্তবতার আলোকে 'হিকমাহ'র সংজ্ঞা আমরা এভাবে দিতে পারি-

১. যাবতীয় বিষয়-বস্তু, পরিস্থিতি বা অবস্থাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান দ্বারা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা, সেই উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং শরীয়াহ মোতাবেক বাস্তবক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করাকে হিকমাহ বলে।
২. উদ্ভূত যে কোনো পরিস্থিতিতে শরীয়াহর চাহিদা কী, তা সঠিকরূপে নির্ণয় করতে পারা বা বুঝতে পারা, এবং সে অনুযায়ী নিজেকে এবং অন্যদেরকে পরিচালনা করার নাম 'হিকমাহ'।

প্রিয় ভাই! এবার আসা যাক মূল আলোচনায়। দ্বীন কায়েমের জন্য 'হিকমাহ' হিসেবে কি গণতন্ত্রকে অবলম্বন করা যাবে?

পূর্বের আলোচনা থেকে নিশ্চয় আমরা ইতোমধ্যেই উত্তর পেয়ে গিয়েছি। তারপরো বলছি-

ক. গণতন্ত্র একটি কুফুরী ও শিরকী ব্যবস্থা, যার সাথে ইসলামী শরীয়তের দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। তাহলে শরীয়ত বিরোধী একটি বিষয়, যা ইসলামে নেই, কিভাবে সেটি আল্লাহ তা'আলার কাছে 'হিকমাহ' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে?

খ. আমরা যদি বর্তমান বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই, আর গণতন্ত্রেরও প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হবো যে, গণতন্ত্র দ্বারা এ উম্মাহর মুক্তি কিংবা দ্বীন কায়েম করা কোনোটাই সম্ভব নয়।

গ. বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে শরীয়তের চাহিদা বা হুকুম কী তা যদি আমরা বুঝতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমরা 'হিকমাহ'র দাবী কী তাও বুঝতে ব্যর্থ হব। অবশ্যই বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে শরীয়তের চাহিদা তথা 'হিকমাহ'র দাবী হল 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'। জিহাদের পথকে সুগম করার জন্য যা যা করণীয়, সে সকল পন্থা আবিষ্কার করাই বর্তমানে হিকমাহ। জিহাদ থেকে পলায়ন কিংবা জিহাদকে পাশ কাটানো-বর্তমান সময়ের জন্য অবশ্যই শরীয়ত বিরোধী কাজ। আর শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ কখনো হিকমাহ হতে পারে না, যা আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। প্রকৃতপক্ষে তা জাহিলিয়াত, একসময় যা অবশ্যই প্রমাণিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

ঘ. প্রিয় ভাই! দ্বীন কায়েমের ক্ষেত্রে যদি গণতন্ত্র অবলম্বন হেকমতই হতো, তাহলে তো আল্লাহর রাসূলের ﷺ যিন্দেগীতে কিংবা সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগীতে এ ধরণের হেকমতের কোনো না কোনো আলামত অবশ্যই পাওয়া যেত। কিন্তু আমরা এ ধরনের কোনো নজির খুঁজে পাইনা। অথচ তখন তো দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাধা-বিপত্তি বর্তমানের চেয়েও অনেক গুণ বেশি ছিল; ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম ও মুসলমানগণ ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্বল অবস্থানে ছিল। অথচ তাঁরা দ্বীন কায়েমের জন্য কোনো প্রকার কুফর ও শিরককে হিকমাহ হিসেবে গ্রহণ করেননি, কিংবা হিকমাহ হিসেবে মক্কার কাফির-মুশরিকদের সাথে এমন কোনো সমঝোতাও করেননি যে- তোমরা আমাদের কিছু মেনে নাও, আমরাও তোমাদের কিছু মেনে নিচ্ছি। তাছাড়া, ইসলামের পরবর্তী চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসেও এধরণের হেকমত অবলম্বনের মাধ্যমে পৃথিবীর এক ইঞ্চি ভূমিতে দ্বীন কায়েম হয়েছে- এমন কোনো দৃষ্টান্ত কেউ কখনো দেখাতে পারবে না।

ঙ. সুতরাং আমরা যারা হিকমাহ মনে করে গণতন্ত্রকে সমর্থন করছি, তারা মূলত শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকান্ডে নিজেদেরকে জড়িত করে ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করছি। তাই আমরা বলতে পারি, "গণতন্ত্র হিকমাহ নয়, গণতন্ত্র একটি আত্মপ্রবঞ্চনা, দ্বীন মনে করে নিজেকে নিজে ধোঁকা দেয়া।" (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

চ. প্রিয় ভাই! আপনি জানেন কি, কেন সলফে সালেহীনগণ কাফেরদের সাথে সমঝোতা করেননি? কেন তাঁরা "হিকমত" হিসেবে কুফরের কিছু অংশ মেনে নেননি? অন্যদিকে কেন আমরা জিহাদ ত্যাগ করে নানা ধরনের গোমরাহীকে 'হেকমত' মনে করছি?

আসল কথা হলো, দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয় আমাদের কারো কারো উপর চেপে বসেছে, তাই আমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জিহাদের পন্থা বাদ দিয়ে বাতিল পন্থা তালাশ করি, অপরদিকে জিহাদ করাকে আমরা অপছন্দ করি।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" [সুরা বাকারা - ২:২১৬]

ছ. বর্তমানে আমাদের অনেকের অবস্থা হল, যেখানে মৃত্যুর ঝুঁকি নেই সেদিকেই আমরা দৌঁড় দেই। এক কথায়, "কেউ জিহাদ না করলে আমি একাই জিহাদ করবো"- আমাদের মাঝে এই মানসিকতার অপমৃত্যু হয়েছে, আর সেটির একমাত্র কারণ- মৃত্যুর ভয়!!! মৃত্যু থেকে পালানোকে আজ আমরা নাম দিয়েছি 'হিকমত'!!!

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

"তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। (হে রসূল) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমান ও খর্ব করা হবে না।" (সূরা নিসা ৪:৭৭)

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও।" (সূরা নিসা ০৪:৭৮)

জ. আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর হুকুমই করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বীন মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"আর তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকো, যে পর্যন্ত না সকল ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (৮ সূরা আনফাল: ৩৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

১০. গণতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা-কতটুকু যুক্তিসঙ্গত??

** প্রিয় ভাই! সমাজে দ্বীনি মেহনত যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, মসজিদ-মাদরাসার সংখ্যা যতই বাড়ুক না কেন, তাবলিগ জামাত আরও বিস্তৃত পরিসরে মেহনত শুরু করুক না কেন, আমরা হাজারটা 'ইসলামী'(?) গণতান্ত্রিক দল একত্রিত হয়েও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মেহনত করি না কেন, কিছুতেই সমাজ থেকে ফিতনাসমূহ নির্মূল হবে না। কারণ, যে ব্যবস্থা বিজয়ী থাকবে, তারই জীবনধারা বিজয়ী থাকবে। একই সাথে যদি দ্বীন ও বদদ্বীন উভয়টিকে চলার স্বাধীনতা দেয়া হয়, তাহলে বদদ্বীনই বিজয়ী হবে, কেননা সমাজে দুষ্ট লোকদের আধিক্য সবসময়ই বেশি থাকে। ফলে দ্বীনদাররা সমাজে কোনঠাসা হয়ে যায়। দুষ্ট লোকেরা খারাবীটাকেই প্রমোট করে থাকে, আর ভালোদেরকে এমন সকল কুটকৌশল করে দমিয়ে রাখে, যেসকল কাজ একজন দ্বীনদার ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারে না। এই জন্যই 'ইসলামী'(?) গণতান্ত্রিকদলগুলো সহজে নির্বাচনে ভালো করতে পারে না। তাহলে ভাই কিভাবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ছত্রছায়ায় ইসলাম কায়েম হতে পারে? সেই ব্যবস্থার ছায়াতলে থেকে যতই সমাজের সংশোধনের চেষ্টার করা হোক না কেন, তা কোনো সুফল বয়ে আনবে না। এ জন্যই সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

'শরিয়তের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও; যাবত্ না ফিতনা নির্মূল হয়, এবং দ্বীন সর্বোতভাবে আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়।' (সুরা আনফাল ৮: ৩৯)

সুতরাং যতদিন গাইরুল্লাহর মতবাদের শাসন বিদ্যমান থাকবে, ততদিন সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে না। স্মতর্ব্য যে, ইসলাম প্রচার এক বিষয় আর ইসলাম প্রতিষ্ঠা আলাদা বিষয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইসলাম প্রচারও করেছেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠাও করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তাকে পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এ-ও বলেছেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

'আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি আল্লাহর দীনকে সকল দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।' (সুরা তাওবা ৯: ৩৩)

মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহ. বলেন :

'যতদিন এই দুর্গন্ধযুক্ত গণতন্ত্র, ইংরেজপ্রদত্ত শাসনব্যবস্থা এই দেশে থাকবে, ততদিন কূপ পাক হতে পারে না। সর্বপ্রথম মৃত কুকুরকে কূপ থেকে বের করতে হবে, তবেই এই পানি পাক হবে। যতক্ষণ মরা কুকুর পানিতে পড়ে থাকবে, হাজার বালতি পানি বের করলেও কূপ পাক হবে না।'

তিনি আরও বলেন : 'ভোটের ব্যবহার মূলত পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কার্যত মেনে নেওয়া এবং সেটার সকল অন্যায়ের অংশীদার হওয়াকে সাব্যস্ত করে। এ জন্য প্রচলিত পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অধীনে ভোটের ব্যবহার শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়িয নয়।' (আদইয়ান কি জঙ্গ : ৫৬)

প্রিয় ভাই! ভোট দেয়াকে কেউ বলেন "আমানত"; কেউ বলেন, ভোট হচ্ছে ওকালত বা প্রতিনিধিত্ব; কেউ বলেন, ভোট হচ্ছে শাহাদাত বা সাক্ষ্য। ভোট যা-ই হোক না কেন, সাক্ষ্য সর্বদা হকের ব্যাপারে দেওয়া উচিত নয়কি? একটি কুফুরী ব্যবস্থার অংশ 'আমানত' হওয়াকে কি মেনে নেয়া যায়? যে বাতিল শাসনব্যবস্থা রয়েছে, তার সমর্থনে ভোট দেওয়া আদতে সেই বাতিল ব্যবস্থাকে এভাবে মেনে নেওয়ার নামান্তর যে, এই বাতিল শাসনব্যবস্থা সঠিক, তাই নয়কি?

মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানবি রহ. বলেন:

"আফসোস তো হয় ওই সকল ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে, যারা দাবি করে, প্রচলিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশে সহিহ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। অথচ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তারা ইসলামি বিধিনিষেধের তোয়াক্কা করে না এবং শরিয়ত-পরিপন্থী কৌশল অবলম্বন করে।

যখন তাদের বলা হয়, আপনারা তো ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার দাবিদার; কিন্তু আপনারা ইসলাম বাস্তবায়নের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তা তো অনৈসলামিক এবং নাজায়িয, তখন তারা প্রত্যুত্তরে বলে, যদিও এ পদ্ধতি নাজায়িয; কিন্তু তা ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ জন্য এখন তো জায়িয-নাজায়িযের তোয়াক্কা না করে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা আবশ্যক। ক্ষমতা অর্জিত হলে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম বাস্তবায়ন করব।

এটা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের নিয়তের ব্যাপারে আমরা সন্দেহ করছি না; কিন্তু তাদের কর্মপদ্ধতি এমন, যার মাধ্যমে কখনোই ইসলাম বাস্তবায়নের আশা করা যায় না। কেননা অনৈসলামিক পদ্ধতিতে দীনহীনদের জন্য তো সফলতা অর্জন করা সম্ভব; কিন্তু দীনদারদের জন্য প্রথমত সফলতা অর্জন করাই সম্ভব নয়। আর যদি বাহ্যত সফল হয়েও যায়, তবুও সেটার পরিণামে ইসলাম আসবে না; বরং ইসলাম নামের অন্য কিছু হবে। বাহ্যত যে সফলতা অর্জন করেছে, তা-ও দীর্ঘস্থায়ী হবে না। যেহেতু তার ভিত্তি দুর্বল ছিল, তো সেটার ওপর ভবন কীভাবে টিকে থাকবে?" (আহসানুল ফাতাওয়া : ৬/৪৩)

"দিফায়ে মিল্লাতে ইবরাহীম" (মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণ) গ্রন্থের লেখক বলেন:

"সকল গোষ্ঠী তিনটি বিষয়কে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করায় :

ক. সদস্য-সংখ্যার স্বল্পতা

খ. বস্তুগত প্রস্তুতির অবিদ্যমানতা

গ. শত্রুর সংখ্যাধিক্য, ভয়ানক অস্ত্রশক্তি এবং অসাধারণ রণপ্রস্তুতির সামনে টিকতে না পেরে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা।

অথচ এ বিষয়গুলো কখনোই অজুহাত হতে পারে না। সদস্য-সংখ্যার স্বল্পতা তো এ জন্য অজুহাত হতে পারে না যে, মক্কায় তেরো বছর পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিরা সব ধরনের কষ্ট সয়েছেন। আমাকে বলো, তাদের সংখ্যা কত ছিল? এরপরও কি রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নীরব থাকার, সন্ধি করে নেওয়ার, বস্তুবাদী পৃথিবীর বেশি থেকে বেশি উপকার অর্জনের দিকে অভিমুখী হওয়ার এবং শত্রুদের সঙ্গে মিলে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেছেন? তিনি কি তাদেরকে কাফিরদের ধোঁকায় রেখে তাদের গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের উৎসাহ দিয়েছেন? নাকি রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদেরকে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিকল্পনাগুলোর মতো কোনো সুদৃঢ়-সুসংহত পরিকল্পনা করে দিয়েছিলেন? পক্ষান্তরে তোমাদের পরিকল্পনাগুলোর অবস্থা তো আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করছি এবং তার ফলাফল পুরোপুরিই ভোগ করছি।

অপরদিকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াতের ফলাফল তো কোনো চক্ষুষ্মানের দৃষ্টিপটে অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। তার সাথে ছিল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সাহাবিদের এক কাফেলা, যাদের ভয়ে রোম এবং পারস্য আতঙ্কিত হয়ে উঠত—যে রোম এবং পারস্য ছিল তৎকালীন পরাশক্তি, তোমাদের এ যুগে যেমন যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া হলো দুনিয়ার পরাশক্তি। আবু সুফিয়ানের সাথে রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রশ্নোত্তর এবং তা থেকে হিরাক্লিয়াস যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল—তা থেকে সেই অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে।

সহিহ বুখারির দীর্ঘ হাদিসে বিবৃত হয়েছে :

হিরাক্লিয়াস বলল, 'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, সম্ভ্রান্ত লোক তার অনুসরণ করে, নাকি সাধারণ লোক? তুমি বলেছ, সাধারণ লোকই তার অনুসরণ করে। আর বাস্তবেও এই শ্রেণির লোকেরাই হন রাসুলগণের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি সন্ধি ভঙ্গ করেন কি না? তুমি বলেছ, না। প্রকৃতপক্ষে রাসুলগণ এরূপই সন্ধি ভঙ্গ করেন না। তুমি যা বলেছ, তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার দুপায়ের নিচের জায়গার অধিকারী হবেন। (সহিহ বুখারি : ৭)

হিরাক্লিয়াসের সুগভীর জ্ঞান এবং তার দূরদর্শিতার দিকে লক্ষ্য করো—সে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বিজয়লাভের ঘোষণা দিচ্ছে, অথচ এটা তার জানা যে, এই নবির অধিকাংশ অনুসারী নিতান্ত সাধারণ লোক। সে নবির রণপ্রস্তুতি, শক্তি এবং বাহিনী সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই করেনি।

আখের নবি ﷺ-এর দীনের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, নাকি তা হয়নি?

হ্যাঁ, দীন ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তা যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার সমকক্ষ রোম-পারস্য শাসন করেছিল।

কিন্তু তোমরা যেহেতু মিল্লাতে ইবরাহিম ত্যাগ করেছ, তার বিরোধিতায় সরব হয়েছ, ভিন্ন কোনো আদর্শ গ্রহণ করেছ, নিজেদের ধারা বদলে ফেলেছ আর মিল্লাতে ইবরাহিমের মধ্যে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধনের প্রচেষ্টায় রত হয়েছ, তাই আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে এ কথা বলব যে, কিছুতেই তোমাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।

যদি বলো, কেন আমাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না?

আমরা বলব, তোমরা ধোঁকার পথকে নিজেদের পরিকল্পনার অংশ বানিয়ে নিয়েছ, অথচ রাসুল ﷺ এবং তার অনুসারীরা কখনো ধোঁকার পথে হাঁটেননি।

তোমরা নিজেদের সংগঠনের জন্য তোমাদের দৃষ্টিতে বিশেষ ক্ষমতাধর শ্রেণি এবং শক্তিশালী কর্তৃপক্ষের সদস্যদের বেছে নিয়েছ, অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসারীরা ছিল দুর্বল। 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষদের মধ্যে পার্থক্যকারী'—যেমনটি সহিহ বুখারির উদ্ধৃতিতে পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। তেমনি তার সাহাবিরাও নিজ প্রতিপালককে কিয়ামতের দিন বলবে :

فارقناهم، ونحن أحوج منا إليه اليوم

'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মানুষদের থেকে আলাদা হয়েছি এমতাবস্থায় যে, তাদের প্রতি আমাদের প্রয়োজন ছিল প্রচণ্ড।'

অথচ তোমরা সব ধরনের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে চলো, সবাই-ই তোমাদের দৃষ্টিতে মুসলমান; তাদের বিশ্বাস দৃষ্টিভঙ্গি কাজকর্মে পারস্পরিক কতটা ভিন্নতা—তা সবই তোমাদের দৃষ্টিতে অবিবেচ্য এবং গুরুত্বহীন একটি বিষয়।

একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারা জাতীয়তার সারিতে সহাবস্থানে চলে আসুক, সম্মানজনক পদসমূহ অধিকার এবং ধোঁকার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা তোমাদের সহযোগী হয়ে যাক—যাতে তোমরা নিজেদের কল্পিত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হও।

অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ তার প্রকাশ্য মানহাজকে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে, মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন। তার সাহাবিদের মধ্য থেকেও শহিদ হয়েছে মাত্র গুটিকয়েক প্রাণ, বন্দির সংখ্যা তো নিতান্ত স্বল্প।

তোমরা নিজেদের বিশ্বাসকে গোপন রাখো, মুশরিকদের সারিতে প্রবেশ করে ঐক্যের বন্ধনেও আবদ্ধ হও, সবধরনের চাল প্রয়োগ করো, এতদসত্ত্বেও নিজেদের কল্পিত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হও না। অথচ এই ধোঁকার আন্দোলনে তোমাদের হাজার ব্যক্তি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছে। বাস্তবতা হলো, তোমরা এখনো পর্যন্ত নবিজি ﷺ-এর এই বাণী হৃদয়ঙ্গম করোনি :

لا يلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين

‘মুমিন এক গর্তে দুবার দংশিত হয় না।’

আমরা তোমাদের সে কথাই বলব, ইমাম মালিক রহ. যা বলেছিলেন :

لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها

‘এই উম্মাহর শেষভাগের লোকেরা কিছুতেই সংশোধিত হতে পারবে না, তবে সেই উপাদানের মাধ্যমে পারবে, যার মাধ্যমে প্রথমভাগের লোকেরা সংশোধিত হয়েছিল।’

আর নবিজি ﷺ তো বলেছেন :

لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله

‘আমার উম্মাহর একদল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের বিরুদ্ধাচারণ করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যাবত্ না আল্লাহর নির্দেশ আসে।’ (সহিহ বুখারি : ৭৩১১; সহিহ মুসলিম : ১৯২১)

[মিল্লাতে ইবরাহিমের জাগরণ, শাইখ মুদ্দাস্সির আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আরশাদ লুধি রহ., পৃ. 51-55: https://bit.ly/mij3]

** প্রিয় ভাই! আমরা পুরো বিশ্বের ইতিহাসের দিকে একটু তাকাই! তাহলে আমরা একটি চরম বাস্তবতা দেখতে পাবো, গণতন্ত্রের ভিতরে ক্ষমতা স্থানান্তর হয় কেবল। যার কারণে ব্যক্তির চেহারা তো পাল্টায়, কিন্তু জোর-জবরদস্তি ও শক্তির উপর নির্ভরশীল পূর্ব থেকে চলে আসা চাপিয়ে দেওয়া সিস্টেমে কখনো কোন পবিরর্তন আসে না। সিস্টেমের পরিবর্তন অর্থাৎ উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সম্পূর্ণ এক নতুন সিস্টেম আনা; যার মাধ্যমে পূর্ব থেকে চেপে বসা শাসকশ্রেনী ও বুদ্ধিজীবিদের থেকে পরিত্রান হাসিল হবে, সেটা ভোটের গণনা দ্বারা কখনো হাসিল হয়নি ও কখনো হতেও পারে না। তার জন্য এমন একটি শক্তির দরকার, এমন শক্তি সঞ্চারের প্রয়োজন; যা বাতিলদের শক্তিকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলে দিবে। ইসলামের ইতিহাস আমাদের সামনে রয়েছে। সীরাত আমাদের জন্য এক আমলী নমুনা বা আদর্শ। মক্কার মুশরিকরা যখন সত্যের বিরোধিতায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ইসলাম বিজয়ের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন নবী মুহাম্মাদ ﷺ শুধু প্রজ্ঞাপূর্ণ মতামত দিয়েই মক্কা বিজয় করেননি। বরং রাসূল ﷺ প্রথমে মদীনায় শক্তি সঞ্চার করেছেন, ময়দানে বদর ও ময়দানে উহুদের মারহালা অতিক্রম করেছেন, অবশেষে মক্কা বিজয়ের রাস্তা সুগম হয়েছে, যার মাধ্যমে সকল বাঁধা-বিপত্তি দূর হয়ে যায় এবং মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে।

১১. গণতন্ত্র নিয়ে সর্বশেষ প্রশ্ন:

প্রিয় ভাই! এখানে সর্বশেষ আরেকটি প্রশ্ন রয়ে গেল, কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শতভাগ মানুষও যদি ইসলামী শরিয়াহ চায়, (অর্থাৎ সিস্টেম থাকবে গণতন্ত্র কিন্তু বিধান হবে কুরআনের) তাহলে কি সেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে? বাস্তবে কি এটি সম্ভব? "আমরা যদি ক্ষমতায় যেতে পারি, তাহলে রাষ্ট্রে ইসলামী শরীয়াহ কায়েম করব"-এই কথাটি কতটুকু বাস্তবসম্মত??? বাস্তবতার আলোকে বুঝতে চাই।

উত্তর: এটি একটি অবাস্তব ধারণা, একটি অলীক স্বপ্ন। এই ভুল ধারণাটা আমরা অনেক দ্বীনদার ভাইয়েরা করে থাকি, আমরা মনে করি, "আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন করার পর শতভাগ শরীয়াহ কায়েম করতে চাই।"

কিন্তু ভাই, এটা কখনোই সম্ভব নয়। কেননা গণতন্ত্রের নাটাই (নিয়ন্ত্রণ) সবসময়ই একটি আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেট মহলের কব্জায়। এরা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন নামে কাজ করে থাকে। যেমন: ব্যবীলনীয়ান ব্রাদারহুড, নাইট টেম্পলার, হাশাশিন, ফ্রী মেসন, ইলুমিনাতি, বিল্ডারবার্গ গ্রুপ, রোসিক্রুসিয়ান, স্কাল এবং বোন্স অর্ডার, বোহেমিয়ান গ্রুভ, এল্ডার্স অব জায়ন, জাতিসংঘ ইত্যাদি । যাদের নেতৃত্ব দেয় শয়তানপূজারী ইহুদী জাদুকর, শিল্পপতি এবং ব্যাংকাররা। এরা সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের মাধ্যমে স্যাকুলার তথা ধর্মহীণ ও তাদের কদমদাস একটি মানবসমাজ গঠন করতে চায়। তারা বিশ্বব্যাপী তাদের প্রতীক্ষিত বাদশাহ দাজ্জালের জন্য একক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যাকে বলা হয় 'বৈশ্বিক নতুন শাসনব্যবস্থা' বা New World Order। [বিস্তারিত পড়ুন: https://bit.ly/3CGpNaD]

মুফতি নিজামুদ্দিন শামজায়ি রহ. বলেন :

'বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যে দুটো রাষ্ট্রব্যবস্থা চলছে, এ দুটো রাষ্ট্রব্যবস্থাই ইহুদিদের তৈরি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা— এটাও ইহুদিদের আবিষ্কার, ইহুদিরাই এর স্রষ্টা এবং ইহুদিরাই এটাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে। তেমনিভাবে এই যে সাম্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল, সেটাকেও বিশ্বের সামনে ইহুদিরাই উপস্থাপন করেছে।' (খুতবাতে শামজায়ি : ১/১৭২-১৭৩)

প্রিয় ভাই! এদের প্রভাব বলয় প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এরা নিরলসভাবে সারা বিশ্বব্যাপী শয়তান ও দাজ্জালের রাজত্ব কায়েম করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এরা কখনোই কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে 'ইসলামী' রাষ্ট্র হতে দিবে না।

'খেলাফতে উসমানিয়ার ধ্বংসের পর পৃথিবীর বুকে আল্লাহর শরিয়ত পুরোপুরি শাসিত ও পরাভূত হয়ে গেছে। মুসলিম ভূখণ্ডসমূহে শরিয়াহব্যবস্থা শেষ করে দিয়ে ইংরেজ, ফরাসি ও অন্যান্য মিশ্র ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রি.) পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যখন নিজেদের অধীনস্থ মুসলিম দেশগুলো ত্যাগ করছিল, তখন তারা খুব ভালোভাবেই খেয়াল রেখেছে যে, তাদের চলে যাওয়ার পরও যাতে কোনো ভূখণ্ডে মুহাম্মাদ ﷺ-এর শরিয়ত বাস্তবায়িত হতে না পারে। তাই অধিকাংশ মুসলিম দেশে গণতন্ত্র চালু করা হয় এবং এ বিষয়টি আবশ্যক করে দেওয়া হয় যে, কোনো মুসলিম দেশে শরয়ি শাসনব্যবস্থা চালু করা যাবে না। এ লক্ষ্যে জাতিসংঘের চার্টারকে জীবনব্যবস্থা (ধর্ম) হিসেবে প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। সরকারগুলো এসব আইন-কানুন গুরুত্বের সঙ্গে বাস্তবায়ন করছে। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনী তা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে। ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে ইসলামের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে।

যেহেতু গণতন্ত্র নামক এ নব্য কুফরে পূর্বের ধর্ম থেকে বের হয়ে যাওয়া আবশ্যক নয়, তাই অনেকে এ কুফরি ধর্মের কুফরিই বোঝে না। তারা নিজেদের ধর্ম পালনের পাশাপাশি আরেকটি নতুন ধর্মকেও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করে নেয়। খ্রিষ্টানরা রবিবারে গির্জায় যেতে পেরেই সন্তুষ্ট। কারণ, নতুন এ ধর্ম ইবাদতের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি। পুরো সমাজব্যবস্থা যে ইহুদিদের তৈরি সেকুলারিজমের অধীনে চলে যাচ্ছে, সেটার প্রতি তাদের কোনো পরোয়াই নেই।

তেমনিভাবে মুসলমানদের এ ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রথমে খিলাফাতব্যবস্থা ভেঙে ফেলা হয়; যাতে কুরআন কারিমের জীবনব্যবস্থা তাদের নিজেদের জীবন থেকে বিদায় নেয় এবং তারা শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতকেই ধর্ম মনে করে। এর জন্য প্রাচ্যবিদ, তথাকথিত প্রগতিশীল ও আধুনিকমনা বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রয়াস চালানো হয়। শরয়ি পরিভাষাসমূহের অর্থ বিকৃত করা হয়। যেমন : ফকিহগণ ধর্মীয় স্বাধীনতার এক ব্যাখ্যা দেন; কিন্তু ইংরেজ মুফতি ও কাদিয়ানিমার্কা মুফতিরা তার ব্যাখ্যা দেয় নতুন করে। তেমনিভাবে দারুল হারব ও দারুল ইসলামের রূপ, হাকিমিয়্যাত ও আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র রূপ, আল্লাহর আইন ও গাইরুল্লাহর আইনে বিচারকার্য—সবগুলোর এমন সব অর্থে দাঁড় করিয়েছে যে, ফকিহগণের কথাগুলো পুরোনো কিতাবাদিতেই রয়ে গেছে।

মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র শরয়ি পরিভাষাসমূহকে খুবই শঠতার সঙ্গে ব্যবহার করেছে। যেখানেই গণতন্ত্রের কুফরি স্পষ্ট হয়ার আশঙ্কা ছিল, সেখানেই নতুন পরিভাষা সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামী পরিভাষাসমূহকে শঠতাপূর্ণ পন্থায় ব্যবহার করে মুসলমানদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মুসলমানদের কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও কিছু ইবাদতের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, অথচ তাদের সামাজিক জীবন থেকে শুধু ধর্মকেই বিতাড়ন করা হয়নি; বরং সামাজিক জীবনের জন্য কুফরের স্রষ্টারা তাদের একটি নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছে। যে ধর্মমতে জীবন পরিচালনা করার কাজটি জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রকে আবশ্যিকভাবে পালন করতে হয়। কুফরি আইন ও জীবনব্যবস্থাকে জোরপূর্বক মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এটা তারা অনুভব করতে পারেনি। কারণ, নামাজ-রোজা-হজ ইত্যাদির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ইসলামি নাম রাখতেও নিষেধ করা হয়নি। তাদের অনুভব না করার কারণ হলো, তাদের দৃষ্টিতে কুফর হলো ইসলাম থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে বের হয়ে যাওয়ার নাম। এককালে কেউ নতুন ধর্ম গ্রহণ করে নিজের নাম পরিবর্তন করাকেই কেবল কুফরি মনে করা হতো। নব্য কুফর তো এমন কোনো কিছুই দাবি করছে না।

গণতন্ত্র ও সেক্যুলার সিস্টেমে একটু চিন্তা করলেই এ কথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি ইসলামের সাথে চরম সাংঘর্ষিক একটি ধর্ম; তাতে রয়েছে নিজস্ব হালাল-হারাম। রয়েছে ফরজ-ওয়াজিব। রয়েছে শত্রুতা-বন্ধুত্বের মাপকাঠি। এসব তো স্বতন্ত্র ধর্মের মধ্যেই থাকে।

প্রিয় ভাই! ইসলাম ও গণতন্ত্র- এ দুই ধর্ম এক স্থানে একত্রিত হতে পারে না। একজন মানুষ একই সময়ে দুই ধর্মের প্রতি আনুগত্য করতে পারে না। এটি অসম্ভব। শয়তানও খুশি থাকবে, আবার আল্লাহ্ তা'আলাও নারাজ হবেন না-এটা কিভাবে সম্ভব?

প্রকৃতপক্ষে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যতটা না অসম্ভব, তার চেয়েও বেশি অবাস্তব। এর সবচেয়ে বড় কারণ হল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা ক্ষমতা লাভ করলেও, গণতন্ত্রের পশ্চিমা প্রভু ও অভিভাবকরা ততক্ষণই আমাদেরকে ক্ষমতায় রাখবে যতক্ষণ আমরা তাদের গোলামী করতে থাকব, তাদের পদলেহন করতে থাকব এবং

তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো ইসলামী বিধান সমাজে চালু না করব। যখনই আমরা তাদের স্বার্থবিরোধী কোনো কিছু করব, তখনই তারা নানা কৌশলে আমাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করবে, হয়তো দেশের ভিতর তাদের এজেন্ট দ্বারা অরাজকতা সৃষ্টি করবে, কিংবা কখনো সামরিক জান্তাকে উস্কিয়ে দিয়ে, অথবা আন্তর্জাতিক মহলের চাপ সৃষ্টি করে, কিংবা সামাজিক, অর্থনৈতিক নানাভাবে বয়কট করার মাধ্যমে। যেমনটি আমরা দেখেছি, মিশরে মুরসির সাথে করা হয়েছে। সুতরাং দেশের সকল মানুষ ইসলামী আইন চাইলেও, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার আশা দিবাস্বপ্ন বৈ নয়। হাজার বছর সাধনা করলেও আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো না। বাস্তবতা হচ্ছে: গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলাম কখনোই বিজয় লাভ করতে পারবে না। আর এই বাস্তবতাকে কেবল কোন অন্ধ লোকের পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিসর, আল-জাযায়ের, তুরস্ক, তিউনিসিয়া প্রভৃতি দেশগুলোই নয় বরং পুরো ইসলামী বিশ্ব এর বাস্তব সাক্ষী।

মুফতি নিজামুদ্দিন শামজায়ি শহিদ রহ. বলেন :

'নির্বাচন পদ্ধতি ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে আলিমগণ আটচল্লিশটি বছর নষ্ট করেছে। আমি জোর দাবি করে বলছি, এই ব্যবস্থায় আটচল্লিশ হাজার বছরেও ইসলাম আসবে না। কবি ইকবালের কথা অনুযায়ী—গণতন্ত্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা, যাতে মানুষকে গণনা করা হয়; কিন্তু মাপা হয় না। সুতরাং এ কর্মপন্থায় শ্রম ব্যয় না করে তরুণদের নিয়ে মেহনত করুন। তাদের মানসিকতা তৈরি করুন। মার্কিন ও ইহুদি অভিসন্ধি তাদের বুঝিয়ে দিন। প্রথমে নিজেও বিষয়টি বুঝে নিন।' (খুতুবাতে শামজায়ি : ১/২০৩-২০৪ (সংক্ষেপিত))

অন্যত্র তিনি বলেন :

'আল্লাহ তাআলার দীন পৃথিবীতে ভোটের মাধ্যমে, পশ্চিমা গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিজয় লাভ করতে পারবে না। কেননা পৃথিবীতে ফাসেক-ফাজের দুষ্টমতি ও দুশমনদের আধিক্য। আর গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষদের গণনা করার নাম; মাপার নাম নয়। পৃথিবীতে ইসলামকে বিজয়ী করার একমাত্র পথ হচ্ছে, যেটা রাসুলুল্লাহ ﷺ গ্রহণ করেছেন। আর তা হচ্ছে জিহাদ-কিতালের পথ।' (আদইয়ান কি জঙ্গ : ৫৮ (সংক্ষেপিত))

সুতরাং প্রিয় ভাই, এতক্ষণের আলোচনা দ্বারা এটাই কি স্পষ্ট প্রতিভাত হয় না, "আল্লাহর জমীনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের করণীয় হল- গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক প্রভুদের প্রভুত্বকে অস্বীকার করে, তাদের নাটাইয়ের বলয় হতে বের হয়ে, তাদের সিস্টেমের সাথে বিদ্রোহ করে, তাদের গোলামীর শৃঙ্খলকে চুর্ণবিচুর্ণ করে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করা।"

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে বুঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কিছু কিছু জিহাদ সমর্থক ভাইদেরকে শয়তানের ধোঁকা

গত বেশ কয়েক বছরে তাওহীদ ও জিহাদের দাওয়াহ সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে বেশ অনেকটুকুই ছড়িয়ে পড়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। যে প্রজন্মের আগে সময় কাটতো জাহিলিয়্যাহর বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে, আজ তাদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশের কাছে এসব কিছু ছাপিয়ে জিহাদের ডাক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যারা আগে নিজেদের সালাত নিয়েই চিন্তা করতো না, আজ উম্মাহর রক্তের নদী দেখে তাদের হৃদয় প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে।। কুফফার ও তাওয়াগীত যতোই জিহাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে, যতোই জিহাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাচ্ছে, যতই জিহাদের ডাককে চাপা দিতে চাইছে ততোই এ ডাক আরো ছড়িয়ে পড়ছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য তাঁর স্বীয় কাজে প্রবল থাকেন যদিও অধিকাংশ লোকেরাই তা জানেন না।

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" [আত তাওবাহ ৯:৩২]

তবে চিরাচরিত সত্য হল, একটি কাজ যখন শুরু হয় তখন মান নিয়ন্ত্রন করা যতোটুকু সহজ হয়, কাজের ব্যাপ্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে তা আর ততোটা সহজ থাকে না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, তবে এটা সাধারন ভাবে সত্য। এ কথা অনলাইন দাওয়াহ ও দা'ঈদের ক্ষেত্রেও সত্য। আমরা যদি অনলাইনে জিহাদের দাওয়াহ এবং দা'ঈদের দিকে তাকাই তাহলে এ সত্যের প্রমান পাওয়া যায়। যে মানহাজের দাওয়াহ আমরা করছি, যে মানহাজের অনুসরন আমরা করছি তার শর্ত, বৈশিষ্ট্য এবং দাবিগুলো সম্পর্কে দেখা যায় অনেক ভাই-ই ওয়াকিবহাল নন।

প্রকৃতপক্ষে, যে বিষয় বা কর্মের প্রতি আমরা অন্যদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি, আমরা নিজেরাই সেই দাওয়াহর হক আদায় করছি না, সে দাওয়াহর দাবী পুরা করছি না। কেবল অনলাইনে কিছু দাওয়াত দেয়া আর জিহাদ ও মুজাহিদ ভাইদেরকে সমর্থন করেই নিজেদের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করছি।

অথচ, রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন –

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ–كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ –إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

"মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা বল কেন? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক। আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর।" (সূরা সফ ৬১: ২-৪)

আজকাল একটি কথা খুব বেশি শোনা যায় আর তা হল "মানহাজের ভাই" বা "অমুক আমাদের মানহাজের"। এধরনের কথা দ্বারা বোঝানো হয় উদ্দিষ্ট ব্যক্তি জিহাদের মানহাজের অনুসারী।

প্রিয় ভাই! মুসলিম হিসেবে আমাদের 'মুসলিম' পরিচয়ে সন্তুষ্ট থাকাই যথেষ্ট। 'আমভাবে এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই, এক মুসলিমের সম্পদ, রক্ত, সম্মানকে তার মুসলিম ভাই হেফাযত করবে। পরিচয় হিসেবে এটাই

যথেষ্ট হওয়া উচিত। সেখানে আলাদা করে "মানহাজের ভাই" বা এধরনের শব্দাবলীর প্রয়োগ কতোটা যৌক্তিক সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ, তার উপর এ ধরনের শব্দাবলী ব্যবহৃত হয় সম্পূর্ণ বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন ভাবে। খোঁজ নিলে হয়ত দেখা যাবে, যাকে বা যাদেরকে "মানহাজের ভাই" বলা হচ্ছে তিনি না কোন জিহাদী তানযীমের সাথে যুক্ত, আর না সক্রিয়ভাবে কোন ধরনের জিহাদী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। এবং এই ভাইদের বিশাল একটা অংশকে যখন জিহাদের কাজের দিকে আহবান করা হয় তখন তারা বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে যান। বিশেষ করে যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে সেলিব্রিটি হিসেবে এবং "জিহাদী সেলিব্রিটি, মানহাজের ভাই" ইত্যাদি হিসেবে পরিচিত তাদের জন্য এটা প্রায় ১০০% ক্ষেত্রে সত্য।

বাস্তবতা হল, আমরা জিহাদের দাওয়াত দিচ্ছি, জিহাদের মহব্বতও অন্তরে লালন করি, জিহাদ করা দরকার- তাও বুঝি; কিন্তু নিজেরা জিহাদের কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হই না। জিহাদের জন্য যে সকল ভাইয়েরা জান ও মাল দ্বারা কুরবানী করে যাচ্ছেন, তাদের সাথে মিলিত হওয়ার ফিকির করিনা, বর্তমান সময়ে জিহাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করি না কিংবা এজেন্ডাসমূহ বাস্তবায়ন করি না, হক মানহাজের ভাইয়েরা যেভাবে জিহাদ করছেন বা জিহাদের ময়দান প্রস্তুত করছেন, তাদের সাথে এক হয়ে কাজ করি না। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাইয়েরা আমাদেরকে দাওয়াত দিলে তাও নানা অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করি। এত কিছুর পরেও আমরা নিজেদেরকে 'মানহাজী' মনে করি। তাহলে ভাই, এখানে কোন মানহাজের কথা বলা হচ্ছে?

প্রকৃতপক্ষে, যারা এরকম বলে থাকেন তাদের মধ্যে প্রচলিত ধারনাটা হল, যে ব্যক্তি জিহাদ সমর্থন করে, কিংবা তানযীম আল-ক্বা'ইদাকে সমর্থন করে, যারা জিহাদ সমর্থন করেন, যারা ৯/১১ সমর্থন করেন, শাতিম হত্যা করা সমর্থন করেন, জিহাদ করা উচিত সমর্থন করেন, তারা হল "মানহাজের ভাই", তারা হল আমাদের "মানহাজের"। কিন্তু আসলে কি মানহাজ বলতে এটাকেই বোঝানো হয়, মানহাজ বলতে কি নিছক কোন তাত্ত্বিক ও নিষ্ক্রিয় সমর্থনের মনোভাবকে বোঝানো হয়? আর এটা কি বৈশ্বিক জিহাদ তথা তানযীম আল-কায়েদার মানহাজ?

• প্রিয় ভাই! এ দ্বীন তাত্ত্বিকতার না, এ 'মানহাজ' নিষ্ক্রিয়তার মানহাজ না!!!

মানহাজ বলতে আসলে কি বোঝানো হয়? কোনো প্রকারের অ্যাকাডেমিক আলোচনায় না গিয়ে সাধারণভাবে বলা যায়, মানহাজ হল কর্মপদ্ধতি। যদিও মানহাজের সবচেয়ে প্রচলিত সংজ্ঞা হলঃ মানহাজ হল 'ইলম, গ্রহন, বিশ্লেষন ও বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি, তথাপি একথা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে, মানহাজের পরিধি শুধুমাত্র 'ইলম অর্জন ও বাস্তবায়নের মধ্যে সীমিত না, বরং তা আরো ব্যাপক। আধুনিক সময়ে মানহাজের সর্বাধিক প্রচলিত অর্থ হল 'দ্বীন কায়েমের জন্য কর্মপদ্ধতি'। যেমন ধরুন, কেউ যদি বলে দ্বীন কায়েমের পন্থা হল দাওয়াত ও তাযকিয়্যাহ এবং এ বিশ্বাসের উপর কাজ করে, তবে তার মানহাজ হল দাওয়াহ ও তাযকিয়্যাহর মানহাজ। যেমন তাবলীগ জামাত। কেউ যদি বলে দ্বীন প্রতিষ্ঠার উপায় হল, ইসলামী সমাজ বিনির্মান ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়া, এবং সে এই তত্ত্বের উপর আমল করে তবে এটা তার মানহাজ। যেমন - জামায়াতে ইসলামী বা ইখওয়ানুল মুসলিমীন। কেউ যদি মনে করে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ হল কেবল আক্বীদার দাওয়াহ দেওয়া, এবং সে এই বিশ্বাসের উপর কাজ করে, তবে তার সেটাই তার মানহাজ, যেমন শায়খ আলবানীর সালাফি দাওয়াহ। কেউ যদি মনে করে উম্মাহর উত্তরনের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল তারবিয়্যাহ, তাসফিয়াহ, তা'লীম, দাওয়াহ, এবং সে এই বিশ্বাসের উপর 'আমল করে তবে সেটাই তার মানহাজ।

এখানে লক্ষনীয় হল, মানহাজ 'সরাসরি আমলের' সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। মানহাজ 'বাস্তবায়নের' সাথে সম্পর্কিত, নিছক সমর্থন বা সহমর্মিতার সাথে না। একারনে শুধুমাত্র সমর্থনের সাথে মানহাজের যোগসূত্র খোঁজা হাস্যকর। নির্দিষ্ট কোন একটি আদর্শ ধারন ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই একটি মানহাজের অনুসরন সম্ভব।

তবে জিহাদের ক্ষেত্রে যখন এটা বলা হয় তখন এটা আরো বেশি গুরুতর একটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কারন জিহাদ হল একটি ইবাদাত, যা আমাদের সময় একটি ফরয ইবাদাত। ইবাদাতের ক্ষেত্রে সমর্থনের কোন ধারনা সাহাবায়ে কেরামদের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত দ্বীন ইসলামে কখনই ছিল না।

প্রিয় ভাই! কোন সুস্থ মস্তিকের দ্বীনের বুঝ সম্পন্ন ব্যক্তিকে আপনি কখনো বলতে দেখবেন না, "আমি মাগরিবের তিন রাকাত সালাত" সমর্থন করি। নিজে আদায় করি না।" তার চেয়েও বড় কথা হল এই ব্যক্তিকে কেউ কখনো আমার "নামাজী ভাই" বলে কিন্তু সম্বোধন করবে না, আর সে নামাজী হিসেবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য হবে না শার'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কিংবা সাধারণ মানবিক বিচার-বিবেচনার দৃষ্টিকোণ থেকে, যতক্ষণ না সে ফরয সালাত আদায় করছে। একইভাবে কেউ কিন্তু কখনো বলে না "আমি রামাদ্বানের সিয়াম সমর্থন করি, ফরয মনে করি, যারা সিয়াম পালন করছে তাদের সমর্থন করি, তারা খুব ভালো কাজ করছে, তবে আমি নিজে সিয়াম পালন করি না। আর এই সমর্থনের কারণেই আমি রোযাদার।" তবে শার'ঈ ভাবে এ ধরনের কথার কোন ভিত্তি নেই, এবং ফরয আমল থেকে বিনা ওজরে বিরত থাকার কারনে এই ব্যক্তি ফাসিক্ব বলে গন্য হবে।

প্রিয় ভাই! এই দ্বীন তাত্ত্বিকতার দ্বীন না, দ্বীনের আবশ্যক বিষয়ে 'কেবল সমর্থনের অবস্থান' আল্লাহ আমাদেরকে দেননি। ইবাদাতের বিষয়গুলো আমাদের সমর্থন সাপেক্ষ নয়, বরং এগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক হল শোনার ও মানার। আমরা যখন জানলাম ফযরের দুই রাকাত সালাত ফরয, এখন আমরা বাধ্য এই দুই রাকাত সালাত আদায় করতে। আমরা যদি তা না করি তাহলে আমরা আল্লাহর অবাধ্যতা করলাম এবং আমাদের এ অবস্থানের কোন শার'ঈ যৌক্তিকতা বা জাস্টিফিকেশান নেই। এখানে আমরা কেবল সমর্থনের কথা বলে পার পাবো না।

প্রিয় ভাই! এখন চিন্তা করুন জিহাদের কথা। সালাফদের, সকল মাযহাবের ইমামদের অবস্থান অনুযায়ী বর্তমানের জিহাদ ফারযুল আইন। অর্থাৎ বর্তমানে জিহাদ প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয যেভাবে প্রতিটি ব্যক্তির উপর ফযরের দুই রাকাত সালাত ফরয। [বিস্তারিত জানতে দেখুন, "কিতাবুত তাহরীদ 'আলাল ক্বিতাল: দ্বিতীয় পর্ব: তাওহীদ ও জিহাদ" কিতাবটি]। একই সাথে শাহ আব্দুল আযীযের বিখ্যাত ফাতাওয়া (যা রদ করা কিংবা অপনোদন করা এখনো সম্ভব হয়নি, সেটি) অনুযায়ী হিন্দুস্তান দারুল হারব, যেখানে জিহাদ ফরয। এবং আমরা যেসব "জিহাদ সমর্থক মানহাজের ভাই" আছি তারাও জিহাদ যে 'ফারযুল আইন' তা স্বীকার করি। তাহলে প্রশ্ন হল কেউ যদি এটা স্বীকার করে তবে তার করণীয় কি? অবশ্যই তার জন্য আবশ্যক এই ফরয কাজে শামিল হওয়া। এখানে মাঝামাঝি কোন কিছু নেই। দ্বীনের যে কোন ফরয বিধান সম্পর্কে ব্যক্তি অবগত হওয়া মাত্র তার উপর ওই বিধান ফরয। অর্থাৎ সে বাধ্য তখন তা পালন করতে। এখানে নিছক সমর্থনের কোন সুযোগ নেই। আর মুসলিম মাত্রই জিহাদ সমর্থন করে, শাহবাগী ফরিদউদ্দীন মাসউদও জিহাদ সমর্থন করে, কারন জিহাদ অস্বীকার করা কুফর। সমস্যাটা জিহাদ সমর্থন নিয়ে কখনোই ছিল না, যে 'আলিমরা সালাহ আদ-দ্বীনকে বলেছিল ক্রুসেডারদের সাথে মিত্রতা করতে তারাও কিন্তু জিহাদ সমর্থন করতেন।

কিন্তু তারা কী সমর্থন করতেন না? তারা কিসের বিপক্ষে ছিলেন? তাদের সমস্যাটা কী নিয়ে ছিল? তাদের সমস্যা ছিল ওই মূহুর্তে জিহাদ করা নিয়ে। তাদের সমস্যা ছিল তাত্ত্বিকভাবে যা দ্বীনের ফরয বিধান হিসেবে স্বীকার তারা করছেন তার উপর সঠিক ভাবে আমল করা নিয়ে। নিজে জিহাদ করা নিয়ে। যতক্ষণ জিহাদ একটি দূরবর্তী, তাত্ত্বিক বিষয় থাকে ততক্ষণ সবাই এর পক্ষেই কথা বলে। কিন্তু যখনই তাগুতের সামনে আজ, এখন, এখানে জিহাদ করার কথা আসে, তখন সমস্যাটা ব্যাপক ভাবে দেখা দেয়। দুঃখজনক ভাবে এই হাজার বছরের পুরনো ব্যাধি এখনো প্রবল বিক্রমে বিদ্যমান, এবং আজ শুধুমাত্র উলামায়ে সু'রাই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত না।

এতো গেল ফরয জিহাদের কথা, আর জিহাদের মানহাজ অর্থাৎ দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি হিসেবে জিহাদকে বেছে নেওয়া এবং তার অনুসরণ করার অর্থ কি? এ ব্যাপারে আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

"সুতরাং, এই মানহাজ, যা আমাদের সামনে সুবাহের ন্যায় স্বচ্ছ, তা কিছু সুনির্দিষ্ট গুণাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা শারী'আহ্-এর দালীলে পাওয়া যায়। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের থেকে যে কেউই তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করে, তবে আল্লাহ্ অপর এক ক্বওম নিয়ে আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ্ ভালোবাসবেন, এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে, তারা ঈমানদারদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কুফফারদের প্রতি অতি কঠোর, তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, এবং নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞ।' [আল-মাইদাহঃ৫৪]

সুতরাং, এই আয়াতটি আমরা যে অবস্থার মধ্যে আছি সেই সম্পর্কে বলছেঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের থেকে যে কেউই তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করে,..."

যখন রিদ্দাহ্/দ্বীন-ত্যাগ সংঘটিত হয়, তখন মানুষকে দ্বীন ইসলামে ফিরিয়ে আনার জন্য কী কী গুণাবলীর প্রয়োজন? তো এখানে ৬টি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার বানী হতে আমরা পাই,

"...যাদেরকে আল্লাহ্ ভালোবাসবেন, এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে, তারা ঈমানদারদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কুফফারদের প্রতি অতি কঠোর,..."। সুতরাং, এই গুণাবলী অর্জন করা আমাদের জন্য খুবই জরুরীঃ

[১] আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি একান্ত ভালোবাসা
[২] ঈমানদারদের প্রতি বিনয় ও সহানুভূতি
[৩] কল্যাণের সাথে সাহায্য করা এবং তা করা সর্বোত্তম পদ্ধতিতে
[৪] কুফফারদের প্রতি কঠোরতা, আর এটা ইসলামের সবচাইতে শক্তিশালী বন্ধনঃ আল-ওয়ালা' ওয়াল-বারা' (আনুগত্য এবং সম্পর্কচ্ছেদ)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, আমরা ঈমানদারদের সাথে আনুগত্য ও কর্তব্যপরায়ণতার সম্পর্ক স্থাপন করি, এবং আমরা কুফফারদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করি, আর তাদের সাথে খুব কঠোর আচরণ করি।

[৫,৬] এরপর ৫ম এবং ৬ষ্ঠ গুণাবলী হলঃ "...তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, এবং নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না..."।

আর, মানুষদেরকে দ্বীনে ফিরিয়ে আনার জন্য, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, এবং নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করা – এ বৈশিষ্ট্য দু'টির গুরুত্ব অত্যাধিক।

সুতরাং, যারা এমন মনে করে যে, মানুষকে দ্বীনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব (এই গুণাবলী অর্জন ব্যতীত) এবং একটি ইসলামিক ভূমি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যখন কিনা ইসলামের ছায়া পৃথিবীর বুক থেকে অপসারিত হয়েছে, তবে এমন মানুষেরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার মানহাজ উপলব্ধি করতে পারেন নি। কারণ এই আয়াতটি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ এবং স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান একটি আয়াত। [মানহাজের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা, আস সাহাব মিডিয়া]

অতঃপর শায়খ উসামা রাহি. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিমোক্ত হাদীসটি উল্লেখ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর বলেন –

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ اَلْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

হযরত হারেস আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: আমি তোমাদের (দ্বীন কায়েমের) জন্য পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে ঐগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। (সে কাজগুলো হচ্ছে-)
ক. আল জামা'আহ (সংগঠন/ঐক্য): একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।
খ. আস্ সামউ': আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা।
গ. আত-ত্ব-আহ্: আমীরের নির্দেশ পালন করা।
ঘ. আল হিজরাহ: হিজরত করা।
ঙ. আল জিহাদ: আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা।
(তিরমিযি ২৮৬৩, আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন; মুসনাদে আহমদ ১৭২০৯; জামেউল আহাদীস ৪৪; সহীহ ইবনে হিব্বান ৬২৩৩; সহীহ ইবনে খুযাইমা ১৮৯৫; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৫১৪১)

এখানে বিষয়টি হল, প্রথম পাঁচটি বিষয় যা হল ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ, এগুলোকে অপর পাঁচটি বিষয় ব্যতীত মানবজাতির জন্য একটি শাসনব্যবস্থা বা কর্মপদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। একইভাবে একজন ব্যক্তির পক্ষে কমপক্ষে এবং অন্তরের দিক দিয়ে মুসলিম হওয়া সম্ভব নয়, যখন সে মানবরচিত বিধানের দ্বারা শাসন করে এবং পৃথিবীতে ইসলামের কর্তৃত্ব থাকে না। আর আমরা যদি এই পাঁচটি বিষয়কে মনযোগ দিয়ে দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন গোত্রের প্রতি রসূল ﷺ-এর দা'ওয়াহ্-এর বাস্তবতার সাথে এই পাঁচটি বিষয় সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ এবং দৃঢ়সমর্থক।

আর আমরা যখন আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রসূলের ﷺ সুন্নাহর অনুসরণের চেষ্টা করি, তখন আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, একটি ইসলামিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং দ্বীনের সম্প্রসারণের পদ্ধতি হিসেবে এ পাঁচটি বিষয়ের কথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে।

সুতরাং, যারা হিজরাহ করার এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত ইসলামের জন্য কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে এরূপ মানুষেরা মুহাম্মাদের ﷺ মানহাজ উপলব্ধি করতে পারেনি। আর যদি তারা বুঝে থাকে, তবে তারা এর উপর 'আমল করেনি, বরং তারা অন্যান্য ধরনের আনুগত্য ও 'ইবাদাতের দ্বারা নিজেদেরকে

ব্যস্ত রাখছে। সুতরাং, এরূপ মানুষেরা এ সকল বড় 'ইবাদাতসমূহের ভারী ফলাফল থেকে পলায়ন করছে, কারণ নিশ্চয়ই জিহাদ একটি কষ্টকর 'আমল, যা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, এখন পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, জামা'আহ্ ও জিহাদের গুরুত্ব অত্যাধিক।" [মানহাজের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা, আস সাহাব মিডিয়া]

সুতরাং, কিছু সুনির্দিষ্ট গুনাবলী বা বৈশিষ্ট্য এ মানহাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। শায়খ উসামা বিন লাদিনের ভাষায় একজন ব্যক্তি তখন এ মানহাজের অনুসরণকারী হবে যখন সে মানহাজের আবশ্যক শর্তাবলীর উপর আমল করবে। অর্থাৎ সে জামা'আবদ্ধ হবে, শুনবে ও মানবে, হিজরাহ ও জিহাদ করবে। অর্থাৎ মানহাজের বিষয়টি আমলের সাথে সম্পর্কিত কোন একটি মনোভাব ধারন করার সাথে না, এবং এটাই স্বাভাবিক। এবং শায়খ উসামা বিন লাদিনের রাহিমাহুল্লাহর কথা থেকে স্পষ্ট যে এ মানহাজ সমর্থনের মানহাজ না, বরং এ মানহাজ হল জামা'আবদ্ধ হওয়া, শোনা ও মানা, হিজরাহ ও জিহাদের মানহাজ। এবং এখানে জামা'আবদ্ধ হবার উল্লেখ দেখে অস্বস্তি বোধ করার কিছু নেই, কারণ জিহাদ মূলত একটি জামা'আবদ্ধ ইবাদাত। [আমরা এক্ষেত্রে জামা'আবদ্ধ হওয়া বলতে একটি খাস মুক্বাতীল জামা'আকে বোঝাচ্ছি, এবং নিজেদের জামা'আর ব্যাপারে 'আম অর্থ প্রয়োগ করে নিজেদের জামা'আহকেই খাওয়ারিজদের মতো মুসলিমদের একমাত্র বৈধ জামা'আ মনে করি না]

তাহলে কিভাবে একজন ব্যক্তি যে এ কাজগুলো উপযুক্ত ওজর ছাড়া ছেড়ে দেয়, কিন্তু বলে সে এ মানহাজের সমর্থন করে তাকে "মানহাজের ভাই/মানহাজী" বলা যেতে পারে? শার'ঈ বিচারে, মানহাজের অর্থগত বিচারের এবং বর্তমান সময়ে যারা জিহাদের মানহাজকে আল্লাহর ইচ্ছায় পুনরুজ্জীবিত করেছেন তাদের বিবৃত মাপকাঠির আলোকে, কোন বিবেচনাতেই তো এরকম একজন ব্যক্তিকে - সে যতোই অন্তরঙ্গ বন্ধু বা শ্রদ্ধাভাজন দ্বীনি ভাই হোন না কেন – এই মানহাজের অনুসারী বলা যায় না। সমর্থনের কোন মানহাজ এ দ্বীনের মধ্যে নেই। এ দ্বীন তো ভাই মাদ্রিদ-বার্সেলোনার এল ক্লাসিকো না, বা ভারত-পাকিস্তান খেলা না, যে জার্সি পরে সমর্থন করলেই হয়ে গেল। এটাতো এমন হয়ে গেল যেন কেউ বলছে "আমি প্রাউড নন-প্র্যাক্টিসিং মুসলিম" আর তারপর আরেকজন এসে বললো "হ্যা উনি সাচ্চা মুসলিম"! দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এরকম কথার, এরকম অবস্থানের কোন ভিত্তি কি আদৌ আছে?

বরং শায়খ উসামা তো যথার্থই বলেছেন এ মানহাজ কিছু সুনির্দিষ্ট গুণাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমনি ভাবে প্রতিটি মানহাজের কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী রয়েছে। যার আদর্শ ও আমলে যে মানহাজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে তিনি সে মানহাজের। এতো নিছক মৌখিক দাবির বিষয় নয়। যদি প্রশ্ন করা হয় বাংলাদেশে ইসলামের জন্য, দ্বীনের সুরক্ষার জন্য, খেদমতের জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য উম্মাহর জন্য, হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদের দিকে তাকিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজটি করা উচিত, আপনি কোন কাজটি করবেন? জবাবে কেউ যদি বলেন বাংলাদেশে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ঈমান ও আমলের মেহনত তাহলে সেটা তার মানহাজ - যদি কেউ বলেন বাংলাদেশে কাজ আক্বিদা সহীহ করা, শিরক-বিদ'আ দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে দূর করা তবে সেটা তার মানহাজ - যদি কেউ বলেন ক্রিটিকাল থিংকিং করা, শরীয়াহ নিয়ে নতুন ভাবে চিন্তা করা, ইসলামের সংস্কার করা, তবে সেটাই তার মানহাজ - যদি কেউ বলে বাংলাদেশে কাজ ইসলামী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, সমাজ সেবা করা, তবে সেটাই তার মানহাজ - কারো উত্তর যদি হয় বাংলাদেশে কাজ হল 'ইলম চর্চা, তাজভীদ শেখা, আরবী শেখা ও শেখানো তবে সেটাই তার মানহাজ - যদি কেউ বলে বাংলাদেশে কাজ হল মিডিয়া সেল তৈরি করে মিডিয়া দাওয়াহ করা তবে সেটাই তার মানহাজ।

কিন্তু এর কোনটিও তাওহীদ ওয়াল হাদীদের, দাওয়াহ ওয়াল জিহাদের মানহাজ না। কারণ উপরোক্ত মানহাজের উপর আমলকারীরা এ কাজগুলো করেন কিন্তু তারা জিহাদ করেন না। শুধুমাত্র মুক্বাতীল জামা'আর সদস্যদের মধ্যেই ক্বিতালের এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, একারনে ক্বিতালের এ ফারযিয়্যাত একমাত্র মুক্বাতীল জামা'আর সদস্যরাই পালন করছেন অন্যান্য কাজগুলো করার পাশাপাশি। এবং এজন্য জরুরী নয় যে জামা'আর সকল সদস্যই ক্বিতাল করুক, বরং মুক্বাতীল জামা'আর সদস্য হিসেবে যে ভাই মিডিয়ার কাজ করছেন তিনি ক্বিতালের সহায়ক ও সম্পূরক হিসেবেই তাই করছেন। তিনি ক্বিতাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মিডিয়ার কাজ করছেন না। একই কথা সে দা'ঈ ভাইয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যিনি আল্লাহর ইবাদাত ও তাগুত বর্জনের প্রতি দাওয়াহ দিচ্ছেন, এবং ব্যাক্তি যাতে এ নীতির উপর আমল করতে পারে, যাতে করে ব্যাক্তি মিল্লাতে ইব্রাহীমের উপর চলতে পারে সে পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন, এ নীতির উপর ভিত্তি করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে এমন জামা'আর সাথে তিনি নিজে আবদ্ধ হয়েছেন এবং অন্যকে আহবান করছেন। অন্যদিকে উপরোক্ত মানহাজ সমূহের উপর আমলকারীরা নিজেরা জিহাদের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকেন, এবং অন্যদেরকেও নিষ্ক্রিয় হবার শিক্ষা দেন, আর তাদের সক্রিয়তা থাকে শুধু নিষ্ক্রিয় সমর্থনের ক্ষেত্রে। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা ক্বুআতা ইল্লাহ বিল্লাহ।

উহুদের দিন যারা যুদ্ধে যায় নি তারা জিহাদ সমর্থন করতো কি করতো না, তা নিয়ে কিন্তু সৃষ্টি জগতের কারো আগ্রহ নেই। খন্দকের দিনগুলোতে কে জিহাদ সমর্থন করে আর কে করে না এ হিসাব কিন্তু করা হয় নি। তাবুকের সময় যারা পেছনে বসে ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কি জিহাদ সমর্থন করতো কি না– সে বিষয় কুর'আনের কোন আয়াতই নাযিল হয় নি। পরিমাপ করা হয়েছে আমল। যারা মু'মিন তাদের বিশ্বাসের প্রমাণ তারা কাজের মাধ্যমেই দিয়েছে। আর যারা ওজরবিহীন ভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকেছে তাদের সমর্থন থাকা বা না থাকা গুরুত্ব পায় নি। গুরুত্ব পেয়েছে ফরয ইবাদাতের ব্যাপারে তাদের নিষ্ক্রিয়তা, যার ভিত্তিতে তাদের মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং কুর'আনে বিভিন্ন জায়গায় কড়া ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। কারণ, এ দ্বীন নিষ্ক্রিয়তার দ্বীন না। ঈমান থেকে শুরু করে জিহাদ, এ দ্বীনের কোন কিছুই মুখে বুলি আওড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না বরং প্রতিটি আমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে আমরা বাধ্য। অর্থাৎ আমল করতে আমরা আদিষ্ট। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন –

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" [আত তাওবাহ, ৯:১৬]

আমরা কি মনে করছি, আল্লাহর দ্বীনের বিধিবিধানগুলো এতটাই ঠুনকো! কিছু যখন চাইলাম মানলাম, যখন চাইলাম সমর্থনসাপেক্ষে ছেড়ে দিলাম? এমন বিভ্রান্তি থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। প্রকৃতপক্ষে এধরনের ব্যক্তির অবস্থান তাই, যে অবস্থা ফরয ত্যাগ কারীর হয়, আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

"...অন্তরগুলো আজ কেবলই দোদুল্যমান এবং যাদের উপর আল্লাহ দয়া করেছেন তারা ব্যতীত সকলেই আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার বদলে বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যুবকদের বুঝতে হবে যে, জিহাদের সাথে সম্পর্কহীন

নেতৃত্বে বড় আকারের ঘাটতি রয়েছে, আর আমাদের এরূপ মানুষদের কথাকে সেভাবেই উল্লেখ করতে হবে যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা উল্লেখ করেছেন। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত জিহাদ না করে বসে রয়েছে, তবে তার অবস্থার বর্ণনা কুরআনে খুবই পরিষ্কার এবং অবশ্যম্ভাবীঃ আর তা হল “ফিসক্”।

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

“আর যদি তারা বের হবার ইচ্ছা পোষণ করতো, তবে কিছু সরঞ্জাম তো প্রস্তুত করতো, কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করলেন, আর তাই তাদেরকে বলা হলঃ ‘বসে থাকো তোমরা, যারা বসে থাকে তদের সাথে।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৪৬]

[মানহাজের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা, আস সাহাব মিডিয়া]

প্রিয় ভাই! কোন মুসলিম ভাইয়ের মনে কষ্ট দেওয়া, কাউকে ছোট করা আমাদের উদ্দেশ্য না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ থেকে হেফাযত করুন। মুসলিম ভাই হিসেবে প্রতিটি ভাই আমাদের কাছে প্রিয়। আমরা তাওহীদের কালেমা পড়া যে কোনো মুসলিম ভাই-বোনের জন্য নিজের বুকের রক্ত ঢালতে সদাপ্রস্তুত, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হেদায়েত করুন তাদেরকে এবং আমাদেরকে, আল্লাহ আর রাহমানুর রাহীম একত্রিত করে দিন আমাদের জান্নাতে। মুসলিম ভাই পরিচয়টাই যথেষ্ট, এর বেশি আর কোন পরিচয় আমাদের জন্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যদি মানহাজের ভাই বলতেই হয় তবে হেলাফেলার সাথে কাউকে বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। রক্ত, রিমান্ড, জেল, যুলুম, বুলেট, ফাঁসির পথ, আর নিস্তরঙ্গ নিষ্ক্রিয় সমর্থনের পথ এক না। আমরা ভুলে যেতে পারি না তাগুতের কারণে ঘর ছাড়া আমাদের ভাইদের কথা, আমরা ভুলে যেতে পারি না আল্লাহর দ্বীনের জন্য দুনিয়াকে তালাক দিয়ে দেওয়া আমাদের ভাইদের কথা, আমরা ভুলে যেতে পারি না দিনের পর দিন রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে সুযোগের অপেক্ষায় আল্লাহর শত্রু ও আমাদের শত্রুদের শিকারী বাঘের মতো অনুসরণ করতে থাকা মুজাহিদিনের কথা, আমরা ভুলে যেতে পারি না তাগুতের কারাগারে বন্দী আমাদের ভাইদের কথা, আমরা ভুলে যেতে পারি না ঠিক এ কথাগুলো লেখার সময় মুরতাদীনের হাতে রিমান্ডে বন্দী আমাদের ভাইদের কথা, (ইয়া আল্লাহ আপনি আপনার এ বান্দাদের হেফাযতকারী হয়ে যান, আপনি তাদের কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন); আমরা ভুলে যেতে পারি না তাগুতের হাতে নিহত আমাদের ভাইদের কথা যাদের রক্তের বদলা নেওয়া আমাদের উপর আজ ওয়াজিব, রাহিমাহুমুল্লাহু ওয়া তা’আলা।

এ ভাইরা কোন নির্দিষ্ট ক, খ, গ, তানযীমের হওয়া আবশ্যক না, বরং আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করতে গিয়ে আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত এরকম যতো ভাই আছে, পৃথিবীর যে কোন কোণায়, তারা সকলেই আমাদের মানহাজের ভাই, এরাই আমাদের রক্তের ভাই। এদের রক্তই আমাদের রক্ত, এদের কষ্টই আমাদের কষ্ট, এদের অশ্রুই আমাদের অশ্রু – হে আল্লাহ আপনি আপনার দুর্বল বান্দাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি ছাড়া আমাদের আর কোন সহায় নেই। এসব কিছু ভুলে গিয়ে এসব ত্যাগ তিতীক্ষাকে ভুলে গিয়ে লাইক-কমেন্ট দিয়ে অ্যাক্টিভ থাকা, সাপ্তাহিক হালাকা আর নিষ্ক্রিয় সমর্থনকে আমরা এক করে ফেলতে পারি না। নিশ্চয় প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলটির মত নয়। নিশ্চয় যে সমুদ্রে ঝড় নেই সে সমুদ্র আমাদের নয়।

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই হিযবিয়্যাহ থেকে, স্বীয় স্বার্থের কারনে মুসলিমের অন্তরে আঘাত করা থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার হকের উপরে

তাঁর সৃষ্টির হককে প্রাধান্য দেওয়া থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই "পাছে লোকে কিছু বলে" এ চিন্তায় হক প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, মুজাহিদিনের হকের উপরে মুজাহিদিনের সাথে ওয়ালার উপরে, মুজাহিদিনের বক্তব্যকে তুলে ধরার উপরে, বসে থাকা ব্যক্তিত্বদের স্থান দিতে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, মুহাজির ওয়াল আনসারদের অধিকার বিস্মৃত হওয়া থেকে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তাগুতের কারাগারে বন্দী আমাদের শুয়ুখ ও ভাইদের কথা ভুলে যাওয়া থেকে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তাঁর দ্বীনের ফারযিয়্যাতের কথা নিছক কসমেটিক ঐক্যের অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়া থেকে। আর অতি কঠোরতার অভিযোগ উত্থাপনকারীদের প্রতি জবাব হিসেবে আল ইমাম আল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদিনের রাহিমাহুল্লাহ এ উক্তিটিই যথেষ্ট-

"যদি একজন ব্যক্তি জিহাদ না করে বসে থাকে এবং রাস্তা থেকে কাঁটা বা তার সদৃশ কোন বাঁধা সরানোর কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে, যেটি কিনা ঈমানেরই একটি প্রশাখা, যখন কিনা অপরদিকে জিহাদ ব্যক্তিগতভাবে ফরয কর্তব্যে পরিণত হয়েছে, তখন তার সেই কর্মের ব্যাপারে এরূপ বলা হবে না যেঃ "আল্লাহ যেন তাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন," বরং, আমাদের দ্বীনের মাঝে সে একটি ফাসিক্ব ব্যক্তি হিসেবেই বিবেচিত হবে, যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"-কে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দ্বীনকে সাহায্য করার ফরযে আইন/ (বাধ্যতামূলক) কর্তব্য থেকে পলায়ন করেছে। সুতরাং, এই প্রধান বিষয়টির ব্যাপারে সচেতন থাকা অতি জরুরী বিষয়, যেটির কিছু ব্যতিক্রম স্থান ব্যতীত প্রায় সমগ্র মুসলিম ভূখন্ডেই অনুপস্থিতি আজ সকলের চোখের সামনে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ।" [মানহাজের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা, আস সাহাব মিডিয়া]

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে বুঝবার এবং তদনুযায়ী আমল করবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

[সূত্র: 'দাওয়াহ ইলাল্লাহ' ফোরামের একটি পোস্ট "এ দ্বীন তাত্ত্বিকতার না, এ মানহাজ নিস্ক্রিয়তার মানহাজ না" অনুসারে। পোস্ট লিংক: https://bit.ly/dawah1000]

জিহাদের মেহনত-ই তুলনামূলকভাবে অধিক পরিপূর্ণ মেহনত

প্রিয় ভাই! পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামে যত রকমের মেহনত আছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চারটি প্রকার হচ্ছে-

০১. ইলমী মেহনত (তা'লীম ও তরবিয়ত),

০২. তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি),

০৩. দাওয়াত এবং

০৪. জিহাদ।

রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন,

وأمَّا ذُرْوَةُ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ الله

"সকল আমলের চূড়া হলো 'আল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা।"

(মুসতাদরাকে হাকেম ২৪০৮ হাদীসটি সহীহ, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী। মুসনাদে আহমদ ৫/২৩, ২২০৬৪, সুনানে বাইহাকী ১৮২৫৩, সুনানে তিরমিযী-২/৮৯, মুসতাদরাকে হাকেম-২/৩৯৪)

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :ذَرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، لَا يَنَالُهُ اِلَّا أَفْضَلُهُمْ

হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন- "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। এ আমল সর্বোত্তম ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্য কেউ সম্পাদন করতে পারবে না।" (মু'জামে কাবীর, তাবরানী-৮/২২৪; মাশারিউল আশওয়াক্ব ইলা মাসারিয়লি উশশাক ১৩৩/১৬৯)

এখন আমরা দেখব, 'জিহাদ ইসলামের চূড়া' এই কথা দ্বারা আমরা কী বুঝি-

১. ইসলামের সবচেয়ে দামী কাজ হল 'জিহাদ'।

২. ইসলামের সবচেয়ে 'উঁচা কাম' হল 'জিহাদ'।

৩. ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল 'জিহাদ'।

৪. ইসলামের সবচেয়ে 'শানদার' কাজ হল 'জিহাদ'।

৫. ইসলামের সবচেয়ে কঠিন কাজ হল 'জিহাদ'। (তবে আল্লাহ পাক যার জন্য সহজ করে দেন তার কথা ভিন্ন)।

৬. ইসলামের সবচেয়ে বড় নবীওয়ালা কাজ হল 'জিহাদ'।

৭. তুলনামূলক ইসলামের সবচেয়ে পরিপূর্ণ কাজ হল 'জিহাদ'।

৮. ইসলামের বাকী সকল কাজ 'জিহাদের' নিচে।

৯. ইসলামের বাকী সকল কাজ 'জিহাদের' পরে।

১০. যে চূড়ায় থাকে সে সকলের উপরে থাকে।

১১. যে সকলের উপরে থাকে, তার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি হয়।

১২. যে আল্লাহ্ পাকের কাছে অধিক মর্যাদাবান, সে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ পাকের মহব্বতের বান্দা।

১৩. আর যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ পাকের মহব্বতের বান্দা, সে-ই সবচেয়ে বড় অলী-আল্লাহ, সে-ই সবচেয়ে বড় আল্লাহ্ওয়ালা বা বুযুর্গ।

• 'জিহাদ' তুলনামূলকভাবে অধিক 'পরিপূর্ণ' মেহনত। কিভাবে?

জিহাদী মেহনতের মৌলিক কাজ মূলত তিনটি-

১. দাওয়াত,
২. প্রশিক্ষণ/প্রস্তুতি/ ই'দাদ (ব্যক্তি গঠনমূলক কার্যক্রম তথা-ইলম চর্চা, তাযকিয়া, শরীরচর্চা ও অস্ত্রপ্রশিক্ষণ ইত্যাদি) ও
৩. ক্বিতাল তথা যুদ্ধ- এটি জিহাদী মেহনতের সর্বশেষ স্তর।

প্রিয় ভাই! উপরের আলোচনা হতে এটিই কি প্রতীয়মান হয় না যে- জিহাদের সাথে দ্বীনী অন্যান্য মেহনতগুলো (ইলমী মেহনত, তাযকিয়ার মেহনত, দাওয়াত ইত্যাদি) ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ জিহাদ তুলনামূলক অধিক পরিপূর্ণ মেহনত। আলহামদুলিল্লাহ।

তাছাড়া জিহাদের মাধ্যমে যখন আল্লাহ্ পাক বিজয় দান করেন, তখন সমাজে পরিপূর্ণরূপে ইসলামী বিধি-বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। এভাবেই জিহাদের মধ্যে রয়েছে 'পূর্ণ দ্বীন'। আলহামদুলিল্লাহ।

তাই, আমাদেরকে পরিপূর্ণ মুসলিম তথা 'আল্লাহর হুকুমের সামনে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী' হতে হলে অবশ্যই জিহাদ করতে হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জানের বাজি লাগাতে হবে ইনশাআল্লাহ্। আর আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে আমাদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। তার হুকুম পালনের জন্য আমরা জীবনও দিতে পারি। তাহলেই তো আমরা 'রহমানের সত্যবাদী বান্দা' হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারবো, প্রকৃত সাদেকীনদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারবো, ইনশাআল্লাহ। (আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুন, আমীন।)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন-

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُۢ بِٱلْعِبَادِ

"আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণির লোক রয়েছে-যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ্ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।" (০২ বাকারা: ২০৭)

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

"তারাই তো মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই সত্যবাদী।" (সূরা হুজুরাত ৪৯:১৫)

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (০২ বাকারা: ২০৮)

প্রিয় ভাই! জিহাদ ব্যতীত দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ হতে পারে কি?? জিহাদ না করে কি আমরা বলতে পারি যে, আমার দ্বীন পরিপূর্ণ বা আমি পরিপূর্ণ দ্বীনের অনুসারী? যদি তা না পারি, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার বানী "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর"-এই হুকুমটি কি আমাদের মানতে হবে না ভাই?..........

عَنْ اِبْنِ عُمَر قَالَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْل، اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتىّٰ تَرْجِعُوْا اِلىٰ دِيْنِكُمْ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যখন তোমরা 'ঈনাহ' পদ্ধতিতে (এক ধরনের সুদ ভিত্তিক ব্যবসা) ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবসা বাণিজ্যে পুরাপুরি মশগুল হয়ে যাবে এবং গরুর লেজ ধরে খেত খামারে মগ্ন হয়ে যাবে আর জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দিবেন, যা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীনের (জিহাদের) দিকে ফিরে আসবে।" (আবু দাউদ ৩৪৬২, বায়হাকী ১০৪৮৪, জামেউল আহাদীস ১৬০৩, কানযুল উম্মাল ১০৫০৩, বুলুগুল মারাম ৮৪১)

সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহর রাসূল ﷺ উক্ত হাদীসটিতে জিহাদকে দ্বীনের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এ থেকেই জিহাদের গুরুত্ব বুঝে আসে। জিহাদ যে পরিপূর্ণ দ্বীনের সমার্থক তাও বুঝে আসে। বর্তমানে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে লাঞ্ছনা ও অশান্তির কারণ কী তাও বুঝে আসে। দ্বীনের অস্তিত্ব জিহাদের সাথে কিভাবে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, তাও এ হাদীস থেকে বুঝা যায়।

সুতরাং প্রিয় ভাই! আসুন, আমরাও মুজাহিদীনে ইসলামের মত (জিহাদ করার মাধ্যমে) পরিপূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হওয়ার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ্ এবং শয়তান ও তার অনুসারীদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা আর বিভ্রান্তিতে পড়ে জিহাদের মত মোবারক মেহনত পরিত্যাগ না করি বা পিছিয়ে না থাকি। আমাদের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান তো এটিই চায় যে, আমরা জিহাদ পরিত্যাগ করে ঘরে বসে থাকি আর আমাদের উপর তার বন্ধুদেরকে দিয়ে আক্রমণ করিয়ে আমাদের সমূলে ধ্বংস করে দিক।

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ.........وَخُذُوا حِذْرَكُمْ

"কাফেররা চায় যে, তোমরা কোনরূপে (অস্ত্র/জিহাদ থেকে) অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে।........আর তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর।" (০৪ সূরা নিসা: ১০২)

আর মুফাস্সিরীনে কেরামের মতে, এখানে সতর্কতা অবলম্বনের অর্থ হচ্ছে- "আর তোমরা আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা হিসেবে অস্ত্র ধারণ কর (তথা জিহাদ কর)।"

আল্লাহ্ পাক আমাদের জন্য সহজ করুন, কবুল করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

যুগে যুগে মুনাফিক

প্রিয় ভাই! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন কারীমে অনেক হুকুম আহকাম প্রদান করেছেন। আর হুকুমটি কিভাবে আদায় করতে হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় হাদীসের কিতাবসমূহে। যেমন: আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে আদেশ করেছেন-

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ

"আর তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।" (সূরা বাকারা ০২:৪৩)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা রাখাকে ফরয করা হল"। (সূরা বাকারা ০২:১৭৩)

কিন্তু নামায কিভাবে কায়েম করতে হবে, কয় ওয়াক্ত পড়তে হবে, কোন্ ওয়াক্তে কত রাকাত নামায পড়তে হবে, কোন্ রাকাত কিভাবে পড়তে হবে-এসবের বর্ণনা কুরআন কারীমে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। তেমনিভাবে যাকাতের বিস্তারিত মাসআলা-মাসাইলও কুরআন কারীমে আলোচনা করা হয়নি, যেমন: কতটুকু সম্পদ থাকলে যাকাত দিতে হবে, স্বর্ণের হিসাব, রূপার হিসাব ইত্যাদি এগুলো বর্ণনা করা হয়নি। অনুরূপভাবে, রোযা ও অন্যান্য ইবাদতগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা।

কিন্তু, কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ হুকুমের ক্ষেত্রে তা ব্যতীক্রম, যেগুলোকে আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে জিহাদ অন্যতম। আল্লাহ্ পাক যেহেতু আগে থেকেই জানেন, তাঁর বান্দারা জিহাদের ব্যাপারে গাফলতি করবে, জিহাদ থেকে পালানোর জন্য জিহাদের নানান অর্থ আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দাঁড় করাবে, একদল লোক অন্তরে কুফর ও বক্রতা লালন করা সত্ত্বেও মুসলমান বেশ ধারণ করে জিহাদের বিরোধিতা করবে, আল্লাহর দ্বীন ও মুসলমানদের দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কুফ্ফারদের এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করবে, তাই তিনি কেবল كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ "তোমাদের উপর যুদ্ধ (ক্বিতাল)-কে ফরয করা হল" (সূরা বাকারা ২:২১৬)- এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি; বরং জিহাদ এমন একটি আমল যার বিস্তারিত হুকুম-আহকাম, শর্ত-শরায়েত, ফাযায়েল-মাসায়েল, এমনকি 'সালাতুল খওফ' (যুদ্ধকালীন নামায) কিভাবে আদায় করতে হবে, কোন্ রাকাত কিভাবে আদায় করতে হবে, তাও বিস্তারিতভাবে খোলে খোলে বর্ণনা করেছেন। সুবহানাল্লাহ! (দেখুন- সালাতুল খওফ আদায় করার পদ্ধতি: সূরা নিসা ০৪: ১০২)

জিহাদ নিয়ে কুরআন কারীমের অদ্ভূত সুন্দর এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম একটি দিক হল- যুগে যুগে মুনাফিকদের জিহাদবিরোধী চিন্তা-চেতনা আর কার্যক্রম কেমন হবে তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা- যেন আমরা আমাদের সমাজে মুনাফিক চরিত্রের লোকগুলোকে সহজে চিহ্নিত করতে পারি (কেননা, যুগে যুগে এদের কথা ও জিহাদ ত্যাগের অজুহাতের ধরণ মোটামুটি একই রকমের), যেন এদের থেকে সতর্ক হতে পারি, সর্বোপরি, নিজেরাও এই ধরণের কপট লেবাসধারী ঈমানদার, ব্যধিগ্রস্ত লোকগুলোর অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে বাঁচতে পারি।

হায়! বর্তমানে আমরা জিহাদের মত ফরযে আইন ইবাদত না করেও নিজেদেরকে আল্লাহর ওলী, আল্লাহ ওয়ালা, দ্বীনদার, হক্কানী, বুযুর্গ, অনেক কিছু মনে করি, অনেক কিছু দাবী করি, কিংবা আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা

করি। অথচ আমরা "মুনাফিক" হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে একটুও ভয় করি না। সাহাবায়ে কেরামের যামানায় মুনাফেকরা সকল আমল-ই করত জিহাদ ছাড়া। মুনাফেক হয়ে যাওয়ার ভয়ে সাহাবায়ে কেরাম কখনো জিহাদ পরিত্যাগ করেননি।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

"নিশ্চয়ই মুনাফেকদের অবস্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তাদের জন্য তোমরা কোনো সাহায্যকারীও পাবেনা।" (০৪ সূরা নিসা: ১৪৫)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নিফাকের ব্যাধি হতে বাঁচান। আমীন।

- ## মুনাফিকদের মুখঃনিসৃত কিছু বানী(!):

(বি.দ্র: নিম্নোক্ত কথাগুলো কারো মুখে বলতে শুনা গেলেই আমরা তাকে মুনাফিক বলতে পারবো না। কেননা, বান্দার মনের প্রকৃত অবস্থা ও জাহেলিয়াতের পর্যায় একমাত্র আল্লাহ্ পাকই ভালো জানেন। আমরা শুধু বলতে চাই, এই ধরণের কথা ও আচরণ প্রকৃত মুনাফিকদের কথা ও আচরণের সাথে মিলে যায়। তাই, আমরা নিজেরা এই ধরণের চিন্তা-চেতনা থেকে বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ আর যারা এই ধরণের কথা বয়ান করেন তাদেরকে ও তাদের আদর্শকে অবশ্যই পরিত্যাগ করবো, তাদেরকে নিজের পরামর্শদাতা হিসেবে গ্রহণ করবো না, তাদের সোহবতে থাকবো না। নতুবা আমরাও গোমরাহ হয়ে যাব, আমাদের অন্তরও ব্যধিগ্রস্ত হয়ে যাবে, আর আমাদের মধ্যেও নিফাক চলে আসতে পারে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন।)

১. 'এই যুগে জিহাদ হল ফিতনা-ফাসাদ। জিহাদের নামে যা কিছু চলছে তা ফিতনা-ফাসাদ ছাড়া আর কিছু না। আল্লাহর রাসূলের যামানায় যে জিহাদ ছিল সে জিহাদ বর্তমানে নেই। এখন যতটুকু ইসলাম পালন করতে পারছি, সমাজে প্রচলিত যে 'জিহাদ' তার নাম নিলে ততটুকুও পালন করতে পারবো না। তাছাড়া ইসলাম মানে 'শান্তি'। ইসলামে মারামারি, কাটাকাটি আর বিশৃঙ্খলার কোনো সুযোগ নেই।'

তাই, এই ক্যাটাগরির লোকদেরকে যখন জিহাদের দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন বলে থাকেন, ভাই! দয়া করে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ ছড়াইও না আর আমাদেরকেও এসকল ফেতনায় জড়াইও না।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ۗ اَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ۗ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ

"আর তাদের কেউ কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং ফিতনায় ফেলবেন না। শোনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই ফিতনাগ্রস্ত এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে।" (০৯ আত্ তাওবাহ্: ৪৯)

২. যাদের অন্তরে ব্যধি আছে, তারা জিহাদ করার জন্য কেবল আল্লাহর রাসূলের ﷺ যামানা তালাশ করে। আর বলে, 'যদি সেই যামানায় আমার জন্ম হত তাহলে অবশ্যই আমি সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলিত হয়ে জিহাদ করতাম।' যেহেতু তার কাছে বর্তমান যামানায় জিহাদ করা মানে ফেতনা-ফাসাদ, তাই সে বর্তমান যামানায় নবীওয়ালা জিহাদ

বা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের যামানার জিহাদ তালাশ করে খুঁজে পান না। তাই, সেই যামানাও নেই, জিহাদও নেই। জিহাদে করতে গেলে যদি কোনো বিপদাপদ, মৃত্যু বা অন্য কোনো পরীক্ষা চলে আসে এই ভয়ে তারা জিহাদ না করার নানা অজুহাত পেশ করে থাকেন। তাদের ভাষায়, 'বর্তমানে জিহাদের ব্যাপারে মুসলমানদের নেতৃত্ব দেয়ার মতো যোগ্য নেতা নেই। তাই আমাদের তো কিছুই করার নেই। যদি এযুগে নবুওয়তের যামানার ক্বিতাল থাকত তাহলে আমরা হতাম অগ্রগামী। আমরা যদি জানতাম, বর্তমানে যেই জিহাদ চলছে তা নবীওয়ালা জিহাদ, তাহলে আমরাও জুড়ে যেতাম'।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْۖ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّٱتَّبَعْنَٰكُمْۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَٰنِۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ

"এবং (যুদ্ধের ময়দানে সাময়িক বিপর্যয়ের পরীক্ষা তোমাদের উপর এজন্য এসেছিল) তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হল- এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে, (যুদ্ধের মত) যুদ্ধ হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে বস্তুতঃ আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে।" (সূরা আলে ইমরান ০৩: ১৬৭)

যারা মনে করে যে, বর্তমান যামানায় কোথাও নবীওয়ালা জিহাদ নেই, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন-

لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة

"আমার উম্মতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল হকের উপর থেকে ক্বিতাল (যুদ্ধ) করতে থাকবে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪১২)

৩. যদি কোনো ভাই জিহাদের মেহনত করতে গিয়ে তাগুতের কাছে ধরা পড়েন, মামলা আর জেল-যুলুমের শিকার হন, কিংবা শহীদ হয়ে যান, আর এসকল কারণে যদি দুনিয়ার ক্যারিয়ার, চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়, আর পরিবার পরিজন কষ্টের মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে এই সমস্ত ব্যধিগ্রস্ত অন্তরের লোকেরা ভাইদের জন্য মায়াকান্না করতে থাকেন আর ভর্ৎসনা করে বলতে থাকেন- "যদি তারা আমাদের কথা মানত আর (জিহাদের নামে) এত 'লাফালাফি' না করতো, তাহলে তাদের এমন হালত হত না। এখন কেমন হল? মনে হয় দ্বীন তারাই বুঝে! আমরা আর কিছুই বুঝি না! এখন মজা বুঝ, চৌদ্দ শিকের ভাত খেতে কেমন লাগে! নিজের জীবন, মা-বাবা আর স্ত্রী-সন্তানের প্রতি একটুও দয়ামায়া নেই। থাকলে কি আর এমন কাজ (জিহাদ) কেউ করতে পারে? আগেই সতর্ক করেছিলাম- পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বা, রোযা রাখবা, হজ্জ করবা, যাকাত দিবা, তিলাওয়াত, যিকির, তসবীহ-তাহলীল করবা- এরচেয়ে বেশি করার দরকার কী? এত বেশি বুঝা মোটেও ভালো নয়।"

এই সব লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَٰنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْۗ وَٱللَّهُ يُحْيِۦ وَيُمِيتُۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা কাফের হয়েছে এবং নিজেদের ভাই-বন্ধুরা যখন কোনো অভিযানে বের হয় কিংবা জিহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, যদি তারা আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে মরতোও না, আহতও হতো না। যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আল্লাহ্ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমাদের সমস্ত কাজই, তোমরা যা কিছুই কর না কেন, আল্লাহ্ সব কিছুই দেখেন।" (সূরা আলে ইমরান ০৩:১৫৬)

ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَٰنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْۗ قُلْ فَٱدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

"ওরা হল সে সব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্পর্কে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না। তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" (সূরা আলে ইমরান ০৩:১৬৮)

৪. মুনাফিক শ্রেণির লোকগুলো জিহাদকে অদূরদর্শিতা এবং অপরিনামদর্শিতা বলে দাবী করে থাকে। তারা তাদের ভীরুতার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু নিজেদের ভীরুতা স্বীকারও করতে চায় না। তাই জিহাদ না করাকে ওরা দূরদর্শিতা হিসেবে প্রমাণ করতে চায়। উহুদ যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার পর মুনাফিকরা মাঝপথ হতে এ কথা বলে ফিরে এসেছিল,

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالا لاتَّبَعْنَاكُم

'আমরা যদি দেখতাম (যুদ্ধের মতো) যুদ্ধ হবে, তবে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম।' (সূরা আলে ইমরান ৩: ১৬৭)

আল্লামা তাকী উসমানী দা. বা. বলেন, 'তারা বলতে চাচ্ছিল যে, এটা সমানে-সমানে যুদ্ধ হলে আমরা অবশ্যই এতে শরীক হতাম, কিন্তু এটাতো অসম যুদ্ধ। শত্রুসংখ্যা তিন গুনেরও বেশি। কাজেই এটা যুদ্ধ নয়, আত্মহত্যা। এতে আমরা শরীক হতে পারি না।' (তাওযীহুল কুরআন: ১/২১৯)

যেহেতু মুনাফিকরা জিহাদকে অদূরদর্শিতা এবং অপরিনামদর্শিতা হিসেবে প্রমাণ করতে চায়, তাই মুজাহিদরা পরাজিত হলেই তারা খুশি হয় এবং একে নিজেদের দূরদর্শিতার প্রমাণস্বরূপ পেশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ

"তোমাদের কোনো কল্যাণ লাভ হলে তাদের দুঃখ হয় আর যদি তোমাদের কোনো মুসিবত দেখা দেয়, তবে বলে, আমরা তো আগেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম, আর (একথা বলে) তারা বড় খুশি মনে সটকে পড়ে।" (সূরা তাওবা ৯:৫০)

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"যারা পিছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। আর আল্লাহ্ মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহে। বস্তুতঃ তারা জানতেও পারেনি।" (সূরা তাওবাহ ০৯:৯৩)

৫. মুনাফিক শ্রেণির লোকগুলোর আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এরা নানাভাবে জিহাদের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যেমন, কখনো কখনো আবহাওয়ার দোহাই দিয়ে, কিংবা মুসলমানদের দুর্বলতার দিকগুলোকে সামনে তুলে ধরে, অথবা সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে কাফেরদের শক্তিমত্তার ব্যাপারে ভয় সৃষ্টি করে দেয়, যেন কোনো মুসলমান ভয়ে জিহাদের নামও মুখে না নেয়। যেমন তারা বলে, (কুরআনের ভাষায়)-

وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ

"আর তারা (মুনাফিকরা) বলল, তোমরা গরমের মধ্যে (জিহাদের জন্য) বের হয়ো না।" (সূরা তাওবা ০৯: ৮১)

কিংবা তারা বলে, "বর্তমান যামানায় আমাদের জিহাদ করার মতো কোনো শক্তিই নেই। কাফেরদের অনেক শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র আছে। তাদের টেকনোলজি (প্রযুক্তি) অনেক উন্নত। তাদের গোয়েন্দা ব্যবস্থাও অনেক শক্তিশালী। তাদের গোয়েন্দাদের কান আমাদের বেডরুম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। যেমন: আমেরিকার গোয়েন্দারা আমেরিকা বসেও শুনতে পায় আমরা আমাদের দেশে কী কী আলোচনা করছি। তাই বর্তমানে জিহাদ করাটা আত্মহত্যার শামিল। তাই জিহাদ করা যাবে না। এখন জিহাদ হবে ভোটের জিহাদ। মিটিং মিছিলের জিহাদ। নফসের জিহাদ। ইত্যাদি।"

এই ক্যাটাগরির লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جَمَعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ ١٧٣

"যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ কথা তাদের বিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।" (সূরা আলে ইমরান ০৩: ১৭৩)

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوۡلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمۡ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

"সে তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং ভয় কর আমাকেই, যদি তোমরা মুমিন হও।" (সূরা আলে ইমরান ০৩: ১৭৫)

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا

"আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা (জিহাদের কাজে) বাধাদানকারী এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, 'আমাদের কাছে আস'; তারা খুব কমই যুদ্ধ করে।" (সূরা আল আহযাব ৩৩: ১৮)

জিহাদ ছাড়া দ্বীনের অন্যান্য মেহনত কি তাহলে বেকার?

এতক্ষণের আলোচনায় অনেক ভাই হয়তো এমন মন্তব্য করতে পারেন, 'এই যে ভাই! আপনি তো দ্বীনের অন্যান্য সকল মেহনতকে বেকার সাব্যস্ত করে দিলেন। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, জিহাদ ছাড়া ইসলামে বুঝি আর কোন কাজই নেই।'

উত্তর: দুঃখিত, ভাই! ভুল বুঝবেন না। দ্বীনের প্রতিটি মেহনতই স্ব-স্ব স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ছোট থেকে ছোট প্রতিটি ইবাদতই অত্যন্ত মূল্যবান। কেননা বলা তো যায় না, কোন্ আমল আল্লাহ পাকের কাছে কবুল হবে, আর কোন্ আমলের উসীলায় নাজাত মিলবে। তবে একটি বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ইসলামী শরীয়ত প্রতিটি আমলের জন্য পৃথকভাবে কম-বেশি বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্ব সাব্যস্ত করেছে। প্রতিটি আমলকে তার প্রাপ্য পরিমাপ অনুযায়ী গুরুত্ব দেয়াই আমাদের মহান শরীয়তের কাম্য; এটিই হিদায়াত ও 'সীরাতল মুস্তাকীম' এর মূলকথা।

প্রিয় ভাই! তাছাড়া বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর বাঁচা-মরা কিংবা অস্তিত্বে টিকে থাকা, না থাকার প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের উপর চূড়ান্ত আঘাত আসছে। দুনিয়াব্যাপী মুসলমানদের জন্য এক মহা সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। বিজাতিগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে জোটবদ্ধ হয়েছে। হত্যা-গুম থেকে শুরু করে যুলুম নির্যাতনেরে এহেন কোনো পন্থা নেই যা তারা মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করছে না। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শানে বেয়াদবী করা হচ্ছে, কুরআনকে পুড়িয়ে, পদদলিত করে অবমাননা করা হচ্ছে। মুসলিমদের ভূমিগুলো দখল করে, তাদেরকে উৎখাত করা হচ্ছে। মা বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে কারারুদ্ধ করে নির্যাতন করা হচ্ছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে সক্ষম সকল তবকার মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে।

প্রিয় ভাই! আমরা কি শুনতে পারছি না, আমাদের মহান দ্বীনের আহ্বান, যুগের ভাষায় যেন এই দ্বীন আমাদেরকে আহ্বান করে যাচ্ছে, যেই আহ্বান প্রতিটি মুমিনের প্রতি, বিশেষতঃ প্রতিটি দ্বীনদার ভাইয়ের প্রতি?-

مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ

"আল্লাহর পথে কে হবে আমার সাহায্যকারী ?"

এ দ্বীন যেন আরো বলছে- আমার অনুসারী কেউ আছো কি, যে জাহিলিয়্যাতের চিৎকার ও ঔদ্ধত্যতার গলা চেপে ধরবে আর ইসলামের মহান আওয়াজকে বুলন্দ করবে?

আছো কি কেউ দ্বীনের প্রকৃত অবস্থা ও মৌলিক পয়গামের ঝান্ডাকে উর্ধ্বে তুলে ধরবে?

আছো কি কেউ, যে তুফানের ন্যায় ধেয়ে আসা এই ধর্মহীনতার প্রবল স্রোতের বিপরীতে দ্বীনের প্রতিরক্ষা বিধানের নিমিত্তে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে যাবে?

আমার প্রিয় ভাই! এই মহান দ্বীন তো আমাদের ও আপনাদের সকলকেই সম্বোধন করে বলছে, কে আছো, যে এই দ্বীনের দুশমন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দুশমন, মানুষরূপী শয়তানগুলোকে ভয় না পেয়ে এদেরকে 'মাছি-পিপীলিকা' মনে করবে? তাদের আস্ফালনের উপর চরমভাবে মার দিবে? তাদের স্বার্থগুলোর উপর মারাত্মকভাবে আঘাত হানবে? তাদের গর্বকে খর্ব করে দিবে? তাদের চোখে চোখ রাখবে? তাদেরকে চরম অসম্মান ও লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করাবে? আর বিপরীতে, ইসলামের সম্মান ও শরীয়তের মর্যাদা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করবে? আছো কি কেউ???

প্রিয় ভাই আমার!

আল্লাহর কসম করে বলছি: আজ যেভাবে দ্বীনের দাওয়াত ও তার আসল রুহ এবং চাহিদাসমূহ স্বয়ং আমাদের দ্বীনের ধারক-বাহকদের কাছে অপরিচিত হয়ে গিয়েছে, এমনটি মনে হয় ইতঃপূর্বে আর কখনো হয়নি! জিহাদওয়ালা দ্বীন কি আমাদের কাছে আজ অপরিচিত নয়?? আমরা কি এটি অস্বীকার করতে পারবো?........

দ্বীনের ধারক-বাহক আমাদের সেই ভাইয়েরা আজ কোথায় - যারা প্রলয়ঙ্করী ধর্মহীনতা ও অপকর্মের নোংরামির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে?

একত্ববাদী সেই প্রজন্ম আজ কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, যারা পশ্চিমা ও উদারপন্থীদের তুফানসম গোস্তাখীর বিরুদ্ধে লড়াই করবে?

মহান আল্লাহ তা'আলার সেই সব প্রিয় বান্দাদেরকে আমরা আজ কোথায় তালাশ করবো - যারা এই দাবী করবে যে, এই জমিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের জমিন; তাই এখানে উদারতাবাদ, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র নয়; বরং এখানে চলবে শুধুমাত্র ইসলাম ও ইসলামী মতবাদ?

যুগের সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আর তারিক বিন যিয়াদকে আমরা কোন মাদরাসায় খুজঁব, যে দিশেহারা মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এগিয়ে আসবে?

উম্মাহর কল্যাণকামী সেই সকল ভাইদেরকে আমরা আজ কোন খানকাহগুলোতে খুঁজে ফিরব, যারা মজলুম মুসলিমদের পাশে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াবে?

উম্মাহর মা বোনের ইজ্জতের হেফাযতকারী মরদে মুমিন ভাইয়েরা আজ কোন মারকাজে অবস্থান করছেন, যারা মা-বোনের গগণবিদারী আর্তনাদ শুনে ছটফট করে বিনিদ্র রজনী পার করে দিবে?

সেই সকল দ্বীনদার ভাইদেরকে আমরা আজ কোথায় খুঁজে পাব, যারা দ্বীনকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে? যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে চোখের পলকেই জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়?.......

প্রিয় ভাইয়েরা আমার!

আপনারাই বলুন, ইসলামের কেল্লাগুলোতে আজ কেন এত নিস্তব্ধতা? বাতিলের ক্রমবর্ধমান এই অগ্রসরতার মোকাবেলায় কেন আমাদের এত পশ্চাদ্পদতা?

দ্বীনের প্রতিরক্ষার জন্য নিখাদ প্রাচীর রচনার ক্ষেত্রে আজ কেন এত শূন্যতা?

দ্বীনকে বিজয়ী করার ক্ষেত্রগুলোতে কেন আজ সুনসান নীরবতা? কেন ভাই, কেন?.......

আজ সময় এসেছে, আমরা যার যার অবস্থান থেকে একটু চিন্তা করি এবং হিসাব কষি-

আমার দ্বীনি তৎপরতার দ্বারা সমাজে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার মেহনত কতটুকু আগে বেড়েছে? ....

রাষ্ট্রে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার মানযিলের দিকে আমি কতটুকু অগ্রসরমান হয়েছি? ....

আমার দ্বীনি মেহনতের দ্বারা দ্বীনের দুশমনরা কতটুকু পরাজিত হচ্ছে? ....

ধর্মহীনতা ও বেহায়াপনার রাজত্ব কতটুকু নিশ্চিহ্ন হচ্ছে? ....

সমাজে অসৎকাজ কতটুকু নিঃশেষ হচ্ছে? ....

জাতির দ্বীন-ধর্ম আর অস্তিত্ব বাঁচানোর ক্ষেত্রে আমার দ্বীনী কার্যক্রম কতটুকু সফলতার মুখ দেখছে? ....

ইসলামকে বিজয়ীকরনের যুদ্ধে আমি কতটুকু সফল হয়েছি? ....

আমি কি বাতিলের প্রতিদ্বন্দিতা করছি? ....

বাতিলের প্রতি কঠোর হতে পেরেছি? ....
নাকি আমি বাতিলের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রকাশের অবস্থান বেছে নিয়েছি? ....
আমি কি ধর্মহীনদের বিজয় আর ইসলামের পরাজয় মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছি? ....
বাতিলের শক্তির মোকাবেলায় আমি কি শান্তি ও সন্ধির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছি? ....
নাকি বাতিলের ক্রমাগত আক্রমণের মুখে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছি?..................

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আমাদের কি এখনো সময় আসেনি আমাদের মহান দ্বীনের ডাকে সাড়া দিয়ে "লাব্বাইক" বলার; আর দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দেয়ার-

نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ

"আমরাই হব আল্লাহর পথে সাহায্যকারী।"

সুতরাং ভাই, এখন সময়ের দাবী, অন্যসব মেহনতের পাশাপাশি আমরা সকল মুসলমান এক হয়ে জিহাদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবো, জিহাদের কথা বলবো, জিহাদের জন্য মাথা ঘামাবো, জিহাদের জন্য দাওয়াত দিবো, জিহাদের জন্য কলম ধরবো, জিহাদের জন্য মাইক কাঁপাবো, জিহাদের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি নিবো, ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বো এবং যুদ্ধ করতে থাকবো যতদিন না উম্মতের উপর থেকে অস্তিত্বের ঝুঁকি কিংবা আশঙ্কা পুরোপুরি দূর হয়ে যাবে, বিশেষতঃ যতক্ষণ না উম্মতের উপর তরবারি উত্তোলনকারী সম্প্রদায়গুলো তাদের তরবারি না নামাবে।
হ্যাঁ, ভাই!
ততদিন জিহাদ "ফরযে আইন" থাকবে, যতদিন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দুশমনরা এই উম্মাহর উপর তরবারি উত্তোলন করে রাখবে........
ততদিন জিহাদ "ফরযে আইন" থাকবে, যতদিন এক ইঞ্চি ভূমিও (যাতে কোনো না কোনো সময় এক সেকেন্ডের জন্য হলেও আল্লাহর আইন কায়েম ছিল তা) পুনরুদ্ধার না হবে এবং তাতে পুনরায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা না করা হবে............
ততদিন জিহাদ "ফরযে আইন" থাকবে, যতদিন দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম বন্দীদেরকে কুফ্ফারদের হাত থেকে মুক্ত করা হবে............
ততদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের বুকের রক্ত ঝরাতে থাকব, যতদিন না এই দুনিয়ার বুক থেকে শেষ ফেতনাটি (সমস্ত কুফর ও শিরক) নির্মূল হয়ে, সর্বক্ষেত্রে ইসলাম বিজয়ী হয়ে যায়...........
সেদিন পর্যন্ত জিহাদ ফরয থাকবে, যেদিন দুনিয়ার বুক থেকে সকল বাতিল ধর্ম ও তন্ত্র-মন্ত্র বিদায় নিয়ে কেবল ইসলাম বাকী থাকবে।...................
ততদিন জিহাদ চলবেই চলবে, যতদিন না সারা দুনিয়ার প্রতিটি ইঞ্চি মাটিতে আবারো 'নবুওয়তের আদলে ইসলামী খিলাফত' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে.......................

সুতরাং ভাই! জিহাদ থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকার সুযোগ আছে কি?
কিভাবে আমরা বিশ্রাম নিতে পারি? কিভাবে আমরা সংগ্রাম ছেড়ে দিতে পারি?.................
'জিহাদ ফরযে আইন' অবস্থায় বর্তমানে একথা বলার আর সুযোগ নেই, আমি তো একটি মেহনত করছি,
বাকীগুলো করবো না, বাকীগুলোকে কেবল সমর্থন করে যাবো।

মুহতারাম ভাই!

আমরা একটি মেহনত করছি, আলহামদুলিল্লাহ! কিন্তু অন্য একটি মেহনত ফরযে আইন হয়ে গেলেও কি আমরা তা করবো না? যদি তা না করা হয়, ভয় হয়, সেটি দ্বীন হবে না, সেটি হবে মেহনতের নামে আমাদের নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা পুরা করা।

আমি আল্লাহর জন্য আমল করছি, নাকি দ্বীনের ব্যাপারেও প্রবৃত্তির চাহিদা পুরা করছি তা বুঝার কি কোনো উপায় আছে?

জ্বী ভাই, আছে। ....

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা যে আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্যে অপর একটি আমল করছি (যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করছি) বলে মনে করি, সেই আল্লাহ্ই আমাদের উপর জিহাদ ফরযে আইন করেছেন। আমল করাটা যদি খাহেশাত হয়, তাহলে যেটা আমাদের কাছে ভালো/সহজ লাগে, আমরা সেটাই করতে থাকবো। আল্লাহর অন্য হুকুমের দিকে তাকাবো না। আর যদি আল্লাহর হুকুম পালন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের আমল বা মেহনতের মাকসাদ (উদ্দেশ্য) হয়, তাহলে তো আমরা সবসময় খুঁজতে থাকব, এখন আমার উপর আল্লাহর হুকুম কী? এখন কী ফরয? এখন কোন্ কাজ বা আমল করলে আল্লাহ্ জাল্লা শা-নুহু আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন? আর সেদিকেই আমরা ঝাঁপ দিবো, যদিও নিজের জীবন বাজি লাগাতে হয়! অথবা আমরা সবসময় এই ভয়ে থাকব, কোন্ কাজটা বা আমলটা আমার থেকে ছুটে যায়, আর আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান!

প্রিয় ভাই! এটিই আল্লাহর সাথে, আল্লাহর হুকুমের সাথে সত্যবাদিতা, এটিই দ্বীন, এটিই আসল ও সরল পথ! এটিই সীরাত্বল মুস্তাকীম!!

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আমি বক্ষ্যমাণ কিতাবটিতে আপনাদেরকে বারবার শুধু আমলের গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করেছি। বিভিন্নভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেছি, বর্তমানে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছে আর এই অবস্থায় আমাদের করণীয় কী। তাছাড়া, গুনাহের খারাপী ও ঘৃণ্যতা বুঝাবার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেকটা আমলকে ততটুকুই গুরুত্ব দেয়া উচিত যতটুকু গুরুত্ব আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ দিয়েছেন। প্রত্যেকটি গুনাহকে ততটুকুই ঘৃণা করা উচিত, যতটুকু সেটি পাবার উপযুক্ত।

প্রিয় ভাই! আমরা মনে করি, দাওয়াত ও সশস্ত্র জিহাদ কখনোই একটি অপরটির বিরোধী নয়। তা'লীম ও তাআ'ল্লুম তথা জ্ঞান বিতরন ও জ্ঞানার্জন বা তাযকিয়ায়ে নফস তথা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা সশস্ত্র জিহাদের পথে কখনো বাঁধা নয়, বরং একটি অপরটির মুখাপেক্ষী, বরং একটি অপরটির জন্য আবশ্যক, একটি অপরটিকে গতিশীল ও শক্তিশালী করে।

তবে হ্যাঁ, যদি কারো সশস্ত্র জিহাদ করার সামর্থ্য না থাকে অথবা সশস্ত্র জিহাদের ময়দানে যাওয়ার সুযোগ ও প্রেক্ষাপট তৈরী না থাকে, তাহলে সে দাওয়াতের সাথে সাথে সশস্ত্র জিহাদের প্রস্তুতি (ই'দাদ) নেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করবে...কেননা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই দ্বীন উপস্থিত/বিদ্যমান শক্তিকে কাজে লাগানো ও অতিরিক্ত শক্তি অর্জনের রাস্তা দেখায়, কিন্তু দুর্বল মানুষকে বাতিলের বড়ত্ব মেনে নেওয়ার ও তার গুণগান গাওয়ার এবং তার থেকে সব ধরনের ফায়েদা (সুবিধা) ভোগ করার অনুমতি কখনোই প্রদান করে না। এখানেও সে জিহাদের ইচ্ছা পোষণ করবে। আর যদি জিহাদ করার মত সক্ষমতা না থাকে, তাহলেও হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকবে না, বরং জিহাদের প্রস্তুতি নিতে থাকবে।

তাছাড়া হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব বিশ্বব্যাপী চলছে। বর্তমানে কুফরী বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমগ্র দুনিয়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং কোথাও যদি অস্ত্র ধারণ করার মত পরিস্থিতি না থাকে, তাহলে অন্য কোথাও জিহাদে অংশগ্রহন করা যেতে পারে। অন্য স্থানে এই ফরয আদায় করা যায়।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন-

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً

"আর যদি তারা (জিহাদে) বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো।" (সূরা আত-তাওবা: ৪৬)

ফুকাহায়ে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ) বলেছেন: যদি জিহাদ ফরযে আইন হয় এবং তার সক্ষমতা না থাকে, তাহলে তার জিম্মায় জিহাদের প্রস্তুতি নেওয়া ফরয, যাতে করে সে কাঙ্ক্ষিত শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

তাই, জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় আমাদেরকে অবশ্যই জিহাদ করতে হবে; তা করার সক্ষমতা কিংবা পরিবেশ তৈরি না হলে জিহাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি গ্রহণ করে যেতে হবে। ইসলামী শরীয়ত আমাদেরকে হাত গুটিয়ে বসে থাকার সুযোগ দেয়নি। যার যা মেহনত তার পাশাপাশি আমাদেরকে জিহাদ ও ই'দাদের মেহনত চালিয়ে যেতেই হবে ইনশাআল্লাহ।

তবে, আমাদেরকে কখনোই ভুলে গেলে চলবে না, যদি কোনো হুকুম 'ফরযে আইন' হয়ে যায়, তখন অন্যান্য ফরযে কিফায়া, ওয়াজিব, সুন্নত, মোস্তাহাব, মুবাহ কাজগুলো আদায় করার পূর্বে অবশ্যই ফরযে আইন হুকুমটিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

মনে করুন, আসরের ওয়াক্ত শেষ হতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকী আছে। আমি এখনো আসরের নামায আদায় করিনি। এই মুহূর্তে একটি জানাযা এসে উপস্থিত। আমাকে আপনি কোনটি আগে আদায় করতে বলবেন ভাই? আসর নাকি জানাযা?........

প্রিয় ভাই! তাবুক যুদ্ধের ঘটনাটা আমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই.........

তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে, মদীনা থেকে দূরে কাফেররা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার জন্য জড়ো হওয়ার সংবাদ মদীনায় পৌঁছা মাত্রই জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গিয়েছিল। রাসূল ﷺ ও সাহাবাগণ এমন অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন যে সামর্থ্যবান সকল বালেগ পুরুষদেরকে নিয়ে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে যান। চাই ধনী-গরীব, যুবক-বয়স্ক, বড় আলেম-আবেদ, সম্ভ্রান্ত-সাধারণ যেই হোক না কেন। একমাত্র শারীরিকভাবে অক্ষম, নারী-শিশু এবং কিছু মুনাফিক ছাড়া অন্য কেউ পিছনে পড়েনি। শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত যারা পিছনে পড়েছিল তাদেরকে সমাজ থেকে বয়কট করা হয়। রাসূল ﷺ তাদের সাথে সকলের কথা বলা বন্ধ করে দেন। এই অবারিত, প্রশস্ত পৃথিবী তাদের জন্য সঙ্কীর্ণ করে দেয়া হয়েছিল।

হ্যাঁ ভাই! এটি সে সময়ের কথা, যখন মুসলিমদের জান-মাল তখনও নিরাপদ ছিল, যখন মুসলমানদের জন্য 'মদীনা' নামক একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও নিরাপদ রাষ্ট্র ছিল, যখন এই উম্মাহর মাঝে তাদের অভিভাবক, তাদের নেতা দুই জাহানের বাদশাহ্, রাসূলে আরাবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তখনও উপস্থিত ছিলেন।

তাহলে আজ পরিস্থিতি যখন এই পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, চতুর্পার্শ্বে শত্রুরা আগ্রাসন চালাচ্ছে, মুসলিম ভূমিগুলো কুফ্ফাররা দখল করে রেখেছে, দীর্ঘকাল যাবত ইসলামী শাসন বিলুপ্ত হয়ে আছে, মুসলিমদের উপর সীমাহীন হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর উপর ইতিহাসের সবচেয়ে নাজুকতম সময় অতিবাহিত হচ্ছে;

শতশত মুসলিম নারী-পুরুষ, উলামায়ে কেরামকে বন্দি করে রাখা হয়েছে ও হচ্ছে; আল্লাহ ﷻ, তাঁর রাসূল ﷺ, ইসলাম ও কুরআনকে অবমাননা করা হচ্ছে। তাহলে এই অবস্থায় বর্তমানে আমাদের উপর কি জিহাদ ফরজে আইন হবে না?...........

প্রিয় ভাই! একটু চিন্তা করুন তো- রাসূল ﷺ বর্তমান যামানায় থাকলে সবাইকে কি জিহাদের জন্য বের হতে বলতেন না? বর্তমান হালতে আমরা তাঁর উপস্থিতিতে জিহাদ না করে ঘরে বসে থাকতে পারতাম কি? রাসূল ﷺ বেঁচে থাকলে বর্তমানে আমাদের কেউ জিহাদের জন্য বের না হলে তাকে কি সমাজ থেকে বয়কট করতেন না? জিহাদ পরিত্যাগ করে নিজের অবস্থানের পক্ষে কোনো সদুত্তর দেওয়ার দুঃসাহস কি আমরা তাঁর সামনে দেখাতে পারতাম?...........

তাহলে ভাই! বর্তমানে 'ফরযে আইন' হওয়া সত্ত্বেও আমরা যারা জিহাদ করছি না, জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি না কিংবা জিহাদ নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনাও করছি না, উল্টো কেউ কেউ জিহাদ ও হকপন্থী মুজাহিদদের বিরোধিতা করছি, আমরা হাশরের ময়দানে আল্লাহর রাসূলের ﷺ সামনে মুখ দেখাব কিভাবে?? সেদিন কি আল্লাহ্ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ আমাদেরকে বয়কট করবেন না??............

কী হল ভাই আমাদের?..............

এরপরো কি আমরা একটুও চিন্তা করবো না???..............

وَمَا عَلَيۡنَآ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ

"সুস্পষ্টরূপে (সত্যকে) পৌছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব।"

(সূরা ইয়াসীন 36:17)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ- إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡـٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ

"৩৮. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি আঁকড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।
৩৯. তোমরা যদি (তাঁর পথে জিহাদের জন্য) বের না হও, তাহলে (এ জন্যে) তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের অন্য এক জাতি দ্বারা বদল করে দিবেন, তোমরা তার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল।" (০৯ সূরা তাওবা: ৩৮,৩৯)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, (তার জানা উচিত) অচিরেই আল্লাহ পাক এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তাঁরা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ- তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।" (০৫ সূরা মায়েদাহ: ৫৪)

দিলের মধ্যে জিহাদের মহব্বত তৈরির উপায় চারটি:

১. জিহাদ ও শাহাদাতের ফাযায়েল ও গুরুত্ব জানা
২. দুনিয়ার মহব্বত দিল থেকে বের করা
৩. মৃত্যুর ভয় দিল থেকে দূর করা
৪. জিহাদ ফরযে আইন অবস্থায় জিহাদ না করলে আল্লাহর সামনে দাঁড়াব কিভাবে এই কথা চিন্তা করা

****

মুহতারাম মুস‘আব ইলদিরিম ভাইয়ের লিখিত অন্যান্য কিতাবের লিংক:

“কিতাবুত তাহরীদ” (পূর্ববর্তী পর্বগুলো) পড়ুন নিচের লিংকে (অবশ্যই Tor Browser ব্যবহার করুন)

পর্ব-১: আগ্নেয়গিরি হতে অগ্নুৎপাত:

‘দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্’ ফোরাম পোস্ট লিংক-https://bit.ly/tahrid1

পিডিএফ লিংক: https://archive.org/details/kitabuttahrid1

....

পর্ব 02: তাওহীদ ও জিহাদ

‘দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্’ ফোরাম পোস্ট লিংক- https://bit.ly/tahrid2

পিডিএফ লিংক: https://archive.org/details/kitabuttahrid2

....

পর্ব ০৩: ভালোবাসি তোমায় হে জিহাদ!

‘দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্’ ফোরাম পোস্ট লিংক- https://bit.ly/tahrid3

পিডিএফ লিংক: https://archive.org/details/tahrid3

....

পর্ব ০৪: “তোমাকেই শুধু চাই, হে শাহাদাত!

‘দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্’ ফোরাম পোস্ট লিংক- https://bit.ly/tahrid4

পিডিএফ লিংক: https://archive.org/details/tahrid4_20230125

****

****

ইসলামের সোনালি অতীত, উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যত বিজয়গাঁথা নিয়ে **মুস‘আব ইলদিরিম** ভাইয়ের লিখিত একটি অনবদ্য কিতাব-

“কালজয়ী ইসলাম”

দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্ পোস্ট লিংক: https://bit.ly/kaljoyi-islam

পিডিএফ লিংক: https://bit.ly/kaljoie-islam

****

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

কিতাবুত্ তাহরীদ ‘আলাল ক্বিতাল

পর্ব ০৫:

আর কতকাল আমরা নিজেদেরকে এমনিভাবে ধোঁকা দিব?

মুস‘আব ইলদিরিম